রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয়

[ESSENTIALS OF POLITICAL SCIENCE]

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য]

সম্পাদক :

অসীম চৌধুরী এম. এ.

চারুচন্দ্র কলেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের (দিবা) প্রধান অধ্যাপক

বিক্রয় কেন্দ্র

বৈকুণ্ঠ বুক হাউস

১৮৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট. কলিকাতা-৬। ফোন: ৫৫-৪০২৮

এ. সাহা
অরুণ প্রকাশনী
৩৩/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা—৬

বর্দ্ধন প্রেস
৮।৪৫, কাশী ঘোষ লেন
ও
লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১০এ, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মতন ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ পঠন-পাঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের সংগে তাল রাখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের পৃথকীকরণে কলিকাতা এবং উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলা ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রচেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের বিপুলায়তন গ্রন্থ ভারাক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের মনে ভীতি উৎপাদন করে। তাই এই গ্রন্থে এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে যাহা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় সাহায্য করিবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানেও ব্যাঘাত ঘটাইবে না। আকার এবং গঠনে ইহাকে সহায়িকা বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে মূলগ্রন্থের ভাবটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব এবং মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আলোচনাকে সরস করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনায় অনেক সুধীজনের সুপরামর্শ লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক নির্মল বসু, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন সাহা ও শ্রীমান কানাই মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্য প্রথম সংস্করণে হয়তো কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য দুঃখিত। দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিব।

কলিকাতা
২০শে নভেম্বর ১৯৬৩ } অসীম চৌধুরী

সূচীপত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র

[NATURE AND SCOPE OF POLITICAL SCIENCE]

Q. 1. Define 'Political Scienc' '45, Cal.1960.
Cal., '**63**) Degree Part I. 63.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল শাস্ত্র। ইহার বিষয়বস্তু দিন দিন পরিবর্তিত হইতেছে। প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, মৌলিক অবস্থা, লক্ষ্য, ইহার সংগঠন ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সব কিছুরই গবেষণা এবং আলোচনা ইহাতে করা হয়। রাষ্ট্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। যে-সব বিষয় মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

পল জানের ভাষায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং ইহা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও সরকারের বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করে। **ব্লুণ্টস্লি** বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃতি এবং ইহার বিভিন্ন রূপ ও বিবর্তনের কথা আলোচনা করে। **গার্নারের** মতে, রাষ্ট্রকে লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত ও উপসংহার। সুতরাং দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রায় সকল লেখকই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক রবসন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের সময়ে সংজ্ঞা নির্দেশের পক্ষপাতী নহেন। সংজ্ঞার পরিধি ছোট হইলে যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়, তেমনি অনর্থক ব্যাপক হইলে অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। ব্লুটস্লি প্রদত্ত সংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সংকীর্ণ করে, কারণ তাঁহার সংজ্ঞায় শাসন পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, জনসাধারণের প্রভাব ইত্যাদির কথা বলা হয় নাই। অপর পক্ষে ক্যাটলিন যখন বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা আলোচনা করে, তখন সংজ্ঞাটি বেশ ব্যাপক হইয়া পড়ে। কারণ সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তার সবখানিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না।

সাম্প্রতিককালে অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত

হইয়াছে। আধুনিক লেখকদের মতে, যেখানেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার ব্যবহার আছে সেখানেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত। বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংস্থায় কিভাবে ক্ষমতার ব্যবহারের দ্বারা কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয় এবং মানুষ কিভাবে কর্তৃত্বের সহিত নিজের জীবনকে মানাইয়া লয়, তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচনা হয়।

Q. 2. Distinguish 'Political Science' from 'Politics' and 'Political Philosophy' (Punj. 1937, '45)

অ্যারিষ্টটল তাঁহার বিখ্যাত 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics) গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতি কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রনীতি বলিতে তখন নগর-রাষ্ট্র এবং তাহার নাগরিক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বুঝাইত। এই দিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি কথা দুইটি সমার্থবোধক। কিন্তু সিজ্‌উইক, জেলিনেক, পোলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনাকে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক —এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ব্লুণ্টস্লি, ব্রাইস, সিলি, বার্জেস, উইলোবি প্রভৃতি লেখকগণের মতে রাষ্ট্রনীতি কলা (Art) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান (Science) পর্যায়ভুক্ত। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রভৃতি মূল বিষয়ে আলোচনা হয় এবং যে শাস্ত্রে এই সব আলোচনা হয় অধিকাংশ লেখক তাহাকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বা Political Science আখ্যা দিয়াছেন। আর ব্যবহারিক অর্থে, শাসন-ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন, কূটনীতি প্রভৃতির আলোচনা হইয়া থাকে, এবং ইহাকে বলা হয় 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics)। কোন সরকারের শাসন সংক্রান্ত প্রচলিত সমস্যা ও তাহা সমাধানের নানা কৌশল রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নহে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের (Political Philosophy) মধ্যেও পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, নাগরিকের দায়িত্ব, অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ আলোচনার পর কতকগুলি মূলসূত্র, আদর্শ, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মূল্যায়ন ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। ইহাই হইল রাষ্ট্রদর্শন। রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার অবশিষ্ট অংশ—রাষ্ট্রবিজ্ঞান। অবশ্য অনেকের মতে রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি অংশ মাত্র।

ইউনেস্কোর (UNESCO) বর্ণনানুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহার আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বাদিও অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন—এইভাবে রাষ্ট্র-সম্পর্কিত

আলোচনাকে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র-আলোচনার সব কিছুতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়।

Q. 3. Discuss the scope of Political Science. (Cal. 1959)

ভূমিকা—রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহার যে বৃহত্তর জীবন সংগঠন করিয়াছে, তাহার সর্বতোমুখী আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের এবং অন্যান্য ক্ষমতাসন্ধানী গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্র যতদূর, ইহার আলোচনাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাষ্ট্র কিভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে, এই ঐতিহাসিক আলোচনা, বর্তমানে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সমাজ কি রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এবং রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে নীতিগত আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র অতীতের বিশ্লেষণ ও বর্তমানের মূল্যায়নেই শেষ নহে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের পথ সন্ধানও ইহা দিবার চেষ্টা করে। এইদিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক।

বিবৃতি—প্রথমত, ইহা রাষ্ট্রের মূল প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও পরিণতিও ইহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, বিভিন্নপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা, শাসন পরিচালনার নীতি, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। চতুর্থত, ইহাতে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার সহিত নাগরিকদের সম্পর্কবিচার করা হইয়া থাকে। পঞ্চমত, বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা কিভাবে কার্যে পরিণত হয় তাহার আলোচনা এখানে হয়। ষষ্ঠত, আন্তর্জাতিক জীবনও ইহার আলোচনাভুক্ত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক, বিশ্বসংঘসমূহ ও আন্তর্জাতিক আইনের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে। সপ্তমত, রাষ্ট্র ও সরকারের ঐতিহাসিক ক্রমবির্তনের ধারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

আজকাল কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিতেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হইল কেবলমাত্র বিশ্লেষণ করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সামাজিক প্রত্যেক প্রকারের সংগঠনের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হইতেছে তাহা আলোচনা করিবে, কিন্তু তাহার ভালমন্দ বিচার করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নহে। মূল্য নিরূপণ ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উহার স্থান নাই। ইঁহাদের মতে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাস্তব বিশ্লেষণ-মূলক শাস্ত্র।

মূল্য নিরূপণের কাজবিজ্ঞানসম্মত না হইলেও কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহার মাপকাঠি না থাকিলে লোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িবে কেন? সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্য মানুষের নৈতিক সমস্যাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়। রবসন বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু কি আছে তাহা লইয়াই আলোচনা করে না, কি হওয়া উচিত তাহাও বিচার করে।" সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলকও বাস্তব বিশ্লেষণমূলক উভয়ই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক (normative) ও বাস্তব বিশ্লেষণমূলক (empirical), উভয়ই। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ, যেমন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, উদারনীতিবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতির আলোচনা করে, আর বিশ্লেষণমূলক কার্যের দিক হইতে রাষ্ট্রের বর্তমান ও অতীত শাসন কার্য ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করে।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে (UNESCO) একটি সম্মেলনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিম্নরূপ আলোচনাক্ষেত্র নির্দেশ করা হয়:

(১) রাষ্ট্রতত্ত্ব: (ক) রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বসমূহ ; (খ) তত্ত্বসমূহের ইতিহাস ;

(২) রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান: (ক) সংবিধান ; (খ) জাতীয় সরকার ; (গ) প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ; (ঘ) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনা ;

(৩) রাজনৈতিক দলে, গোষ্ঠী ও জনমত: (ক) রাজনৈতিক দল ; (খ) গোষ্ঠী ও সংঘ ; (গ) সরকার পরিচালনা ও শাসনকার্যে নাগরিকের অংশ গ্রহণ ; (ঘ) জনমত ;

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ; (খ) আন্তর্জাতিক সংঘ ও শাসন ; (গ) আন্তর্জাতিক আইন।

Q. 4. Do you agree with the view that there is a Science of Politics. (Punj. 1937, Pat. '45, Cal.' '63.)

ভূমিকা—রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্য কি না, এই আলোচনার পূর্বে বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানা দরকার। সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল, কোন বিষয় সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা

নির্ণয় করা হয় এবং ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র ও নিয়ম অনুমান করা সম্ভব হয়। এই নির্ধারিত সূত্রসমূহ প্রয়োগের দ্বারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

বিবৃতি—বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা মানিয়া লইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই বিজ্ঞান। অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগঠনব্যবস্থা নির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ সূত্রসমূহ সহজেই নির্ধারিত হইয়া থাকে।

তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা বিচারসাপেক্ষ। অ্যারিষ্টটল, বোদা, হব্‌স্‌, মন্তেস্ক্যু, সিজউইক, ব্রাইস, জেলিনেক, ব্লুণ্টস্লি, পোলক প্রভৃতি লেখকের মতে ইহা বিজ্ঞান। আবার কোঁত, মেট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি ইহাকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নন। মেট্‌ল্যাণ্ড বিদ্রুপ করিয়া বলিয়াছেন, "যদি আমি পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি, যাহার শিরোনামায় লেখা আছে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science), তখন আমার শিরোনামার জন্য দুঃখ হয়, প্রশ্নগুলির জন্য নয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান রূপে স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি হইল : প্রথমত, যে-কোন বিজ্ঞানের ন্যায় পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভক্তিকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত, এই নির্দিষ্ট জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করিয়া একই রূপ অবস্থায় পুনরায় তাহার প্রয়োগ করা যায়।

অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে মানিয়া না লইবার কারণ হইল—প্রথমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ অনিশ্চিত, জটিল ও অসংখ্য বলিয়া ইহাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ণবিদ্যার ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ কোন গবেষণাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় বলিয়া প্রায়শঃই ইহা অনুমান-সিদ্ধ। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়, নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইহার গবেষকদের মধ্যে কোনরূপ মতৈক্য নাই।

উপসংহার—উপসংহারে এইরূপ বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই বিজ্ঞান-শ্রেণীভুক্ত। কারণ, বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিশেষত্ব—যেমন, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদির দ্বারা শৃংখলিত জ্ঞান এবং ইহা হইতে নির্নীত সাধারণ সূত্রের প্রযোজ্যতা ইহাতে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতিও (experi-

ment) প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আইনসভায় গৃহীত আইনের কথা বলা যায়। অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসন বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা চলে, কারণ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভক্তিকরণ সম্ভব এবং এই বিশ্লেষিত ও শ্রেণীবিভক্ত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র নির্ধারণও সম্ভব। তবে পদার্থ,রসায়নশাস্ত্র বা গণিতবিদ্যা বিজ্ঞানের ন্যায় সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। পদার্থ বা রসায়নের সূত্রগুলি হইতে যেমন পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রাধীন মানুষ; মানুষ নিত্যপরিবর্তনশীল, আর উপকরণের পরিবর্তনের সহিত সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হইতে বাধ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রায় ক্ষেত্রেই মিলিয়া যায়, তবে সব ক্ষেত্রেই যে মিলিবে ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। তাই, যে কোন সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয় এবং ইহার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বিশুদ্ধ প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অর্থনীতিবিদ্ মার্শাল অর্থনীতির সিদ্ধান্তকে জোয়ার ভাঁটার বিজ্ঞানের সংগে তুলনা করিয়াছেন। আমরাও সেইরূপ লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহাওয়া বিজ্ঞানের (Meteorology) ন্যায় একটি অপরিণত বিজ্ঞান বলিতে পারি। মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কখন সত্য হয় কখন হয় না, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও সকল সময় সত্য হয় না। তাহার প্রধান কারক এই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে জটিল ও চেতনশীল সামাজিক মানুষ। তাই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক স্যার বার্কার তাঁহার সর্বপ্রথম বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়কে অনেকেই নীহারিকাতুল্য এবং সম্ভবতঃ সন্দেহজনক বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে যখন বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হইতেছে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতে হইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইদিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান।

Q. 5. Discuss the relation of Political Science to History.
(Cal. Degree Part. '63)

Or, "Political Science without History has no root" (Seeley) Examine the Statement. **(Cal. 1957)**

Or, How far do you agree with the view that History is the root of Political Science? (Cal. 1959)

ভূমিকা—রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধ্যাপক স্যার জন সিলি (Seeley) তাঁহার "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা" গ্রন্থে এই বিষয়ে নিম্নরূপ উক্তি করিয়াছেন—"History without Political Science has no fruit, Political Science without History has no root." অর্থাৎ, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাদ দিয়া ইতিহাস পাঠের কোন ফল নাই, এবং ইতিহাস বাদ দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন ভিত্তি থাকে না।"

বিবৃতি—ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রাষ্ট্রের উদ্ভব, ইহার পরিণতি ও বর্তমান রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ইতিহাস পাঠ করেন। রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রশাসন কিরূপ ছিল, এবং প্রাচীন কালে নানা দেশে রাজা ও অন্যান্য শাসকগণ কিভাবে শাসন সংক্রান্ত নীতিসমূহ স্থির করিয়াছেন ও তাহা পরিচালনা করিয়াছেন সে সম্পর্কে আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিরও বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাই নহে, ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ঘটনাবলীও ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে এই সবই মূল্যবান তথ্য (data)। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

অপরদিকে ইতিহাসের আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া হইতে পারে না। ঐতিহাসিকের কাজ কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ দান নহে। অতীত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া উহার কারণ নির্ণয় ও ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ ঐতিহাসিকের কাজ। রাষ্ট্রের নীতি ও বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব।

উপসংহার—ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হইলেও "ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়, বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস নয়। ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে ব্যাপকতর। ললিতকলা, ভাষা, আচার, ধর্ম প্রভৃতি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ও সংগঠনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

একাংশ কল্পনাপ্রসূত ও দার্শনিক তত্ত্বসম্বলিত। ইহার সহিত ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। উদাহরণ স্বরূপ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদের (Idealist Theory) উল্লেখ করা যায়। এই কারণেই বলা হয় ইতিহাসের অর্থ প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়, আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানও বর্তমান ইতিহাস নয়।"

ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হইলেও, ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল (root) বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, আমরা কেবল ইতিহাস হইতেই মালমশলা সংগ্রহ করি না। অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যাবিদ্যা (statistics) প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেও আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য বা মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া থাকি। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিবার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যেমন ইতিহাস পাঠ করেন, সেইরূপ তিনি বিপ্লবমুখীন মানুষের মানসিক অবস্থা জানিবার জন্য মনোবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করেন, অর্থ-নৈতিক তত্ত্বসমূহ আলোচনা করেন এবং নানা পরিসংখ্যান বিচার করেন। সুতরাং ইতিহাসকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম উৎস বলিতে পারি। কিন্তু ইহা একমাত্র উৎস বা মূল নয়। এইদিক হইতে সিলির মন্তব্য আংশিক সত্য মাত্র।

Q. 6. What is the relation of Political Science to Economics? (Cal. 1957, '58, 60).

Or, Discuss to what extent economic conditions influence the organisation of the State. (Cal. 1954).

অ্যারিষ্টটল ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকগণ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না—তাহারা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি অংশ বলিয়া মনে করিতেন। রাষ্ট্র-শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের আলোচনা হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া তাহা রাষ্ট্রনীতি আলোচনার বিষয়ভুক্ত। বর্তমানে অবশ্য এই ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি এখন দুইটি স্বতন্ত্র ও পৃথক বিষয় রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

অপ্রচুর দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা কিভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার সীমাহীন অভাব মিটাইবার চেষ্টা করে, তাহাই বিস্তৃতভাবে অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ইহার সহিত যুক্ত। অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই, উনবিংশ শতাব্দীতে কেহ কেহ এমন কথা বলিবার চেষ্টা করিলেও ইহা ঠিক নহে। অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা Laissez faire নীতির সমর্থকেরাও এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অনেকখানি। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকিলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। চোর-ডাকাতের উপদ্রব বেশী থাকিলে কিংবা অন্তর্বিপ্লব বা যুদ্ধের অবস্থা দেখা দিলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রাস্ফীতি ,দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অপরদিকে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক সাম্য ভিন্ন গণতন্ত্র অর্থহীন বলিয়া মনে করা হয়। মার্কসীয় ধারণা অনুসারে, শোষক শ্রেণী তাহাদের মুনাফা রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজ হইল মুনাফার খবরদারি করা। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা যেমন, করনীতি, শুল্কনীতি, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে অর্থনীতি। জনকল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য রূপে স্বীকৃত হইবার ফলে রাষ্ট্রের হাতে অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক দায়িত্ব আসিতেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-ব্যাণিজ্য সব কিছুই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন। বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও রেলপথ, ডাক অধীন। প্রায়ই দেখা যায় দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রভৃতি ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের কোন দেশে বাড়িয়া গেলে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক শাসন অচল হইয়া পড়ে। হয় সেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতন্ত্রবাদ, স্বাচ্ছন্দ্যনীতি, সমভোগবাদ প্রভৃতি মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি উভয়েরই অন্তর্গত। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রাদর্শ অর্থনৈতিক আলোচনা ভিন্ন অসম্পূর্ণ।

Q. 7. Discuss the relation of Political Science to Ethics.
(Cal. 1951, '58).

মানুষের নীতিবোধ, ভাল ও মন্দের ধারণা নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। এই নীতিশাস্ত্রের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। অ্যারিষ্টটল স্বতন্ত্র ভাবে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করিলেও তিনি রাষ্ট্রনীতি হইতে ইহাকে পৃথক করেন নাই, রাষ্ট্রনৈতিক কার্যের নৈতিক ভিত্তির উপর তিনি জোর দিয়াছেন। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির সময় হইতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনীতি ও নীতিশাস্ত্র দুইটি

পৃথক শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ম্যাকিয়াভেলি বলেন, রাষ্ট্রশাসনের কার্যে নীতিবোধের কোন প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রপরিচালকদের এমন অনেক কাজ করিতে হয় যাহা নীতিসম্মত নহে।

বর্তমানে এই দুইটিকে পৃথক শাস্ত্র বলিয়া মনে করা হয়। নানাদিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আচরণ উভয়ই নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপ আলোচনা করে। নীতিশাস্ত্র সামাজিক সমর্থনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে।

কিন্তু এইরূপ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। নৈতিক ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নির্দ্ধারণ এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। জনকল্যাণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের চিন্তাও অনেকাংশে নৈতিক ধারণাপ্রসূত।

নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্নভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে নীতিবোধ গড়িয়া ওঠে তাহাই শেষ পর্যন্ত আইনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। যে আইন মানুষের নীতিবোধের দ্বারা সমর্থিত নহে তাহা টিকিতে পারে না। অপরদিকে রাষ্ট্রও মানুষের নীতিবোধের পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের দেশে সতীদাহ নিবারণ কিংবা বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য।

Q. 8. What is the relation of Political Science to (a) Sociology, (b) Jurisprudence, and (c) International Law?
(Cal. 1951, '56, '60 **'63**). Cal. Dgree, Part 1 '63.

সমাজবিজ্ঞানের সংগে সম্পর্ক : রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সুতরাং এইদিক হইতে সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তথাপি ইহাদের ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু ভিন্ন। সামগ্রিকভাবে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনাই সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য। সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও নানারূপ সামাজিক সমস্যা ইহার আলোচ্য বিষয়। সমাজতত্ত্ব সমাজের সমগ্র বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করে, আর বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক পৃথকভাবে বিস্তৃত আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যতম সমাজবিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানও সমাজের এক অংশ, অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করে। আদিম সমাজের উৎপত্তি, পরিবার-প্রথা, বিবাহ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের একটি অংশ মাত্র। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ব্যাপক।

তবে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি ধারণা না থাকিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্যক আলোচনা সম্ভব নহে। সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত বা background স্বরূপ। অধ্যাপক গিডিংসের (Giddings) ভাষায়, যাঁহারা সমাজতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি জানেন না, তাঁহাদের রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া নিউটনের গতি সম্বন্ধে সূত্রের জ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্য শিক্ষা দেওয়ারই মত অসম্ভব।

(খ) আইনশাস্ত্রের সংগে সম্পর্ক ঃ আইন বিষয়ক আলোচনা-বিজ্ঞানের নাম আইনশাস্ত্র। রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি করে এবং ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। আবার আইন না থাকিলেও রাষ্ট্র-শাসন অসম্ভব। সুতরাং আইনশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ। কিন্তু আইনশাস্ত্র যেরূপভাবে আইনের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহা করে না। কিন্তু সকল প্রকার আইনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই।

(গ) আন্তর্জাতিক আইনের সংগে সম্পর্ক ঃ আন্তর্জাতিক ব্যবহার-বিধি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয় আন্তর্জাতিক আইনের কাজ। এইদিক হইতে ইহা রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইহার আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শক্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক সংঘ বিষয়ে আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বাদ দেওয়া যায় না। তবে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র।

Q. 9. Discuss the different methods of study in Political Science. Which of them do you consider to be the most desirable and why? ((Cal. 1962) Degree Part 1 '62.)

বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হইলেও এখানেও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ

করা হয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য কোন একটি বাঁধাধরা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। বিভিন্ন প্রকার সমস্যার বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য বিভিন্ন লেখক যে সব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method)—এই পদ্ধতি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয়। কোনও একটি বিষয়কে লইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার উপর যথেচ্ছ পরীক্ষা চালানো, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা পদার্থ কিংবা রসায়ণ-বিজ্ঞানে যেভাবে সম্ভব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঠিক সেইভাবে সম্ভব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রতিনিয়তই রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে। প্রত্যেকটি নূতন আইনের প্রবর্তন, প্রত্যেক নূতন সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রত্যেক নূতন নীতির অবলম্বনই পরীক্ষামূলক ; কারণ ইহাদের কার্যকারিতা প্রমাণের দ্বারা স্থায়িত্বের যোগ্যতা লাভ না করা পর্যন্ত এইগুলিকে অস্থায়ী বা পর্যবেক্ষণমূলক বলিয়া মনে করা হয়।

পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method)—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের স্থান সীমাবদ্ধ। সকল সময় ইহার সাহায্য গ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্র কি সকল নাগরিকের নাগরিকত্ব লোপ করিয়া দেখিতে পারে, ইহার ফল কি হইবে? সুতরাং কোন বিশ্লেষণ করিতে গেলে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিভিন্ন দেশে শাসন ব্যবস্থা কিরূপ, কিভাবে তাহা পরিচালিত হইতেছে, সরকারের অনুসৃত নীতিসমূহের ফলাফল কি হইতেছে, তাহা দেখিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করা হয়। তবে এখানেও সমস্যা, পর্যবেক্ষণ ঠিক হইল কিনা তাহা সব সময় বুঝা যায় না। যাহারা সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করিয়া সেখানকার শাসন ব্যবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কি সব জিনিস দেখিয়াছেন?

তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Methods)— বিভিন্ন রাষ্ট্র, তাহাদের সংগঠন, নীতি ও কার্যাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। এইরূপ তুলনার দ্বারা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা করিয়া দেখিবার চেষ্টা হয় কোন শাসন ব্যবস্থা ভাল। এই পদ্ধতির ত্রুটি হইল,

তুলনা করিবার সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ, জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতির পার্থক্যের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দিলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশংকা থাকে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) আসলে তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যাপকতর একটি রূপ। এই পদ্ধতির দ্বারা ইতিহাসের বিভিন্ন সময় ও দেশের ঘটনা হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তাহার কর্মধারার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বনকালে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস হইতে কেবল তথ্য সংগ্রহ করিলেই চলিবে না, এইগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভক্তিকরণের পর বিশ্লেষণ প্রভৃতির দ্বারা যুক্তিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method) অনুসারে অস্পষ্ট ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রজীবনের বাস্তব ঘটনাবলী বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়। কোন একটি পূর্ব সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া ইহা হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা হয়। এই পদ্ধতির বিপদ হইল এই যে, বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কহীন সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বের সৃষ্টি এই পদ্ধতিতে হইতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological method)—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন ধারা অনুসারে মানব মনের গভীরতম উৎস সন্ধান না করিলে সমাজে রাজনৈতিক ব্যবহারের মূলসূত্রগুলিকে উদ্ধার করা যায় না। জনমতের গঠন, রাজনৈতিক দলের কার্য, বিপ্লব, আইন-অমান্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে সমস্যার বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহাম ওয়ালাস ও পরবর্তী অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন।

সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Statistcal Method)—আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক লেখক ব্যাপকভাবে পরিসংখ্যানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। জনমত নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর সফলতা নির্ধারণ ইত্যাদি প্রসংগে এই পদ্ধতি সুফলের সন্ধান দিয়া থাকে।

আইনগত পদ্ধতি (Juridical Method)—এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানের দিক হইতে সব কিছুকে বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়। রাষ্ট্রকে একটি আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রূপে কল্পনা করিয়া তাহার কার্যাবলী—

কর্মক্ষেত্র, অধিকার কর্তব্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রের ধারণা সম্পূর্ণত আইনগত এবং আইন প্রণয়ন ও আইনকে কার্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আইনের গণ্ডীর বাহিরে যে-সব বিষয় রহিয়াছে তাহা এই পদ্ধতিতে স্বীকার করা হয় না। এইরূপ পদ্ধতি সংকীর্ণ হইতে বাধ্য।

সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Sociological Method) অনুসারে রাষ্ট্রের ঘটনাসমূহকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। তত্ত্বে কি আছে, বা আইনে কি বলা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর না করিয়া বৃহত্তর সমাজ-জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা কি ভাবে ঘটিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার—এখন প্রশ্ন হইল, এই সব পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযোজ্য ? ইহার উত্তরে কোন একটি মাত্র পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা যায় না। বিভিন্ন সমস্যা আলোচনায় বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন। অনেক সময় কোন একটি ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য অনেকগুলি পদ্ধতি একত্র অনুসরণের প্রয়োজন হয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন রূপ বিপ্লবের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সামরিক বিপ্লব ইত্যাদি) তুলনা করিতে হইবে, ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন যুগের বিপ্লবের (ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব প্রভৃতি) ঘটনা জানিতে হইবে। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে ইহার ফলাফল দেখিতে হইবে, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে বিপ্লবকালীন জনসাধারণের মানসিক অবস্থা বিচার করিতে হইবে, সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন পরিসংখ্যান (কত লোক বেকার ছিল, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কত জন বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, ইত্যাদি) সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক পটভূমিকা ও সমাজ-সম্পর্ক বুঝিতে হইবে। সুতরাং বিভিন্ন পদ্ধতির গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনমত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইবে। তথাপি ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর বর্তমানে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাষ্ট্র

[STATE]

Q. 10. How do you define a State? Do the following come under your definition of a State—(a) Hyderabad (Deccan), (b) New York (c) League of Nations? Give reasons for your answer. (Cal. 1963, Agr. '62, '63)

ভুমিকা—রাষ্ট্র সম্পর্কে নানা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। জার্মান লেখক স্থলজে বলিয়াছেন, প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং যে-কোন দুইটি সংজ্ঞার পরস্পরের মধ্যে সংগতি নাই। উপরন্তু, রাষ্ট্র শব্দটি বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রচলিত ভাষায় সরকারের স্থলে রাষ্ট্রের ব্যবহার করা হয় এমন কি যে ভূখণ্ড রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হইতে পারে না তাহাকেও রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাই পরিষ্কার ধারণার প্রয়োজন।

বিবৃতি—রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। অনেকে ইহাকে সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সুশৃংখল সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উদ্ভব।

অ্যারিষ্টটলের মতে "রাষ্ট্র হইল কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যাহার উদ্দেশ্য হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন।" হেনরী মেইন (Maine) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃতি।" হলের (Hall) সংজ্ঞানুসারে "রাষ্ট্র হইল রাষ্ট্র-নৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশত্রুর শাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।" রাষ্ট্রপতি উইলসনের (Wilson) মতানুসারে "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমাজ।" বার্জেসের মতে "যদি মানব জাতির কোন অংশকে সংঘবদ্ধভাবে দেখা যায় তবে তাহাই রাষ্ট্র।" ব্লুণ্টস্লি বলেন "রাষ্ট্র হইল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ।" এই সকল সংজ্ঞার প্রত্যেকটি আংশিক ও অস্পষ্ট। এই সকল সংজ্ঞার সমন্বয়ে গার্ণার যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি সর্বাংগসুন্দর ও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

গার্ণার বলিয়াছেন "রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি

জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অথবা প্রায় সেইরূপ এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে, যে শাসনব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করে।" (The state, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience)। উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়—(১) জনসমাজ, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা ও (৪) সার্বভৌমিকতা।

রাষ্ট্র একটি **জনসমষ্টি** লইয়া গঠিত। কম হউক, বেশি হউক একদল লোক অবশ্যই চাই। কিন্তু কেবলমাত্র জনসমাজ হইলেই রাষ্ট্র হয় না। এই জনসমাজের একটি **নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে** বসবাসের প্রয়োজন। যাযাবরের মত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ভূখণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। বড় অথবা ছোট, দুই-ই হইতে পারে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একদল লোক বাস করিলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। তাহাদের শাসন পরিচালনার উপযোগী একটি সংগঠন থাকা চাই। ইহাই **শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার**। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল **সার্বভৌমিকতা**। ইহার অর্থ হইল চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের অধীন সকল লোকের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে। রাষ্ট্রের ভিতরে বা বাহিরে কোন কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে পারিবে না। সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়াছে। রাষ্ট্রের এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন একটির অভাবে ইহা রাষ্ট্র নামের অযোগ্য হইবে।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে, ভারতের প্রাক্তন 'খ' শ্রেণীর রাজ্য **হায়দ্রাবাদ** রাষ্ট্র নয়। জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শাসন ব্যবস্থা থাকিলেও ইহার সার্বভৌমিকতা ছিল না। ভারতের অংগরাজ্যরূপে ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আচরণ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই একই যুক্তিতে পশ্চিম বঙ্গ, কিংবা কাশ্মীর প্রভৃতি রাষ্ট্র নয়। **নিউ ইয়র্ক**

রাষ্ট্র নয়। কারণ প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ইহার সার্বভৌমিকতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংগ-রাজ্যরূপে ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রাক্তন **লীগ অফ নেশনস্**-এর কোন জনসমাজ বা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না, এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারও ইহার ছিল না। কার্য পরিচালনার জন্য এক ধরণের শাসনতন্ত্র ইহার ছিল, কিন্তু কেবল এই একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহাকে রাষ্ট্র বলা চলে না। একই ভাবে বলা যায়, বর্তমান **"সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ"** (United Nations) রাষ্ট্র নয়। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা পুলিশী ব্যবস্থা (যেমন, কংগোর ব্যাপারে কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল) গ্রহণ করিলেও, ইহা সার্বভৌমিকতার সহিত তুলনীয় নহে।

Q. 11. Discuss the relation between State and Society.

সমাজের উৎপত্তি মানুষের উদ্ভবেরও পূর্বে, কেননা মৌমাছি ও পিপীলিকার মধ্যেও সমাজবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। মানুষ জৈব প্রেরণায় পতি-পত্নীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতি লইয়া পরিবার গঠন করিয়াছে; ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শীতগ্রীষ্ম হইতে বাঁচিবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে; সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক সংঘ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সমাজের পরে হইয়াছে। সমাজের ন্যায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কেন্দ্রমুখী নহে। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হইল আইন দ্বারা বাহিরের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা। রাষ্ট্র সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন না করিলে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব্যর্থ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্র এক নহে।

কিছু সংখ্যক লোক এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইলে তখন তাহাকে সমাজ বলে। রাষ্ট্র সমাজের এক প্রধান অংগ। কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যেই সমাজের সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়া উঠে না। রাষ্ট্র বাহিরের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং তাহার নিকট আইনের চুলচেরা বিচার আছে, কোন আন্তরিক অনুভূতি নাই। সমাজ-স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা-সহানুভূতির উপর বেশী নির্ভর করে, রাষ্ট্র কাজ করায় ক্ষমতার বলে।

রাষ্ট্র বিশেষ কোন ভূখণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন বা জাতিপুঞ্জের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় সীমানায় নিবদ্ধ নহে—সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাহাদের কর্মক্ষেত্র। রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার থাকা

আবশ্যক, কিন্তু সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন শাসনযন্ত্র নাই। এস্কিমো জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, কিন্তু তাহাদের সরকারও নাই, রাষ্ট্রও নাই। ইহা অবশ্য সত্য যে, কোন সুসভ্য সমাজে রাষ্ট্র থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের কাজ হইল সমাজের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। সুতরাং, কোন প্রতিষ্ঠান এই শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোন কাজ না করিলে রাষ্ট্র তাহাকে কিছু বলিতে পারে না। রাষ্ট্র কোন রীতিনীতি সৃষ্টি করিতে পারে না বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রথা বা রীতি কেহ ভংগ করিলে তাহাকে শাস্তি দিবার ভার রাষ্ট্রের উপর।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়াছে। গ্রীক চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র ও সমাজকে আলাদাভাবে দেখিতেন না। Polis শব্দটি নগর, রাষ্ট্র ও সমাজ সব কিছুই বুঝাইত। আরিষ্টটল রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ও সর্বপ্রধান সংগঠন বলিয়াছেন। প্লেটো রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিবারকে বিনষ্ট করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইতালি ও জার্মানিতে রাষ্ট্র সর্বাত্মক ও সর্বপ্রধান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

আধুনিক লেখকগণ কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন ভাবিলে রাষ্ট্র ও সমাজ কাহারও সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, "পরিবার, উপাসনালয়, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বহু সামাজিক সংগঠন আছে যাহাদের উদ্ভব বা সূচনা রাষ্ট্র হইতে নহে ; এবং প্রথা বা প্রতিযোগিতার ন্যায় সামাজিক শক্তিগুলিকে রাষ্ট্র সংরক্ষিত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেও সেগুলিকে সৃষ্টি করিতে পারে না ; আবার বন্ধুত্ব ও ঈর্ষার ন্যায় সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি এত বেশী ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধপূর্ণ যে বিরাট রাষ্ট্র-যন্ত্র দ্বারা ইহাদের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।" রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য তাঁহার অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য রক্ষা এবং বিচার কার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু

আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো মারিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই।"

Q. 12. Distinguish between State and Government.

অনেক সময় রাষ্ট্র ও সরকার শব্দ দুইটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্র ও সরকারকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন। চতুর্দশ লুই এমনও বলিয়াছেন—"আমিই রাষ্ট্র।" বর্তমানেও সরকার পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পরূপে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ :

১) জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমিকতা—এই চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। সুতরাং, সরকার এই চারিটির একটি উপাদান বা রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হইতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অন্যতম অংশ সমগ্র, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমান হইতে পারে না। সরকার বলিতে আমরা সেই সংগঠনটিকে বুঝি যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা কার্যকর করা হয়।

(২) রাষ্ট্র সকল নাগরিককে লইয়া গঠিত। কিন্তু আইনসভার সদস্য মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী এবং বিচারক প্রভৃতির ন্যায় স্বল্পসংখ্যক লোক লইয়া সরকার গঠিত হয়।

(৩) রাষ্ট্রের সহিত ভূখণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; সরকার বলিলে কিছু সংখ্যক লোক বুঝায়, ভূখণ্ড বুঝায় না।

(৪) সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সরকারের এই ক্ষমতা নাই। সরকার যে ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা নিজস্ব ক্ষমতা নহে, ইহা রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

(৫) রাষ্ট্র একরূপ স্থায়ী, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচনে যদি কনজারভেটিভ্ পার্টি লেবার পার্টির নিকট পরাজিত হয়, তবে সরকারের পরিবর্তন হয় কিন্তু রাষ্ট্রের মূল রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঠিকই থাকে।

(৬) পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রের রূপ একই প্রকার। সরকার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে: যুক্তরাষ্ট্রীয় কিংবা এককেন্দ্রিক, রাষ্ট্রপতি শাসিত অথবা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত।

(৭) রাষ্ট্র একটি ভাবগত ধারণা, সরকার একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে সরকারের কার্যাবলীই রাষ্ট্রের কার্য বলিয়া অনুভূত হয়। তাই ল্যাস্কি (Harold Laski) বলিয়াছেন, তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে সকল পার্থক্য রহিয়াছে ব্যবহারিক জীবনে সেগুলি অর্থহীন।

Q. 13. How do you distinguish State from other kinds of associations? (Cal. 1955, Agr. '42.)

মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল লোক যখন কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যথারীতি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখন তাহাকে **প্রতিষ্ঠান** বলে। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞান-চর্চার প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় উপাসনার প্রতিষ্ঠান 'চার্চ', কিংবা শ্রমিক-সংহতির প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান; জনসাধারণ এখানে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এইভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে রাষ্ট্রের মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) রাষ্ট্রের সভ্যপদ বাধ্যতামূলক ও আবশ্যিক, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ বাধ্যতামূলক নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্মগতভাবে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর। এমন ব্যক্তিও আছে, যে কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়—কিন্তু তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সদস্য (নাগরিক) হইতেই হইবে। আবার, ইচ্ছা করিলে একটি প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ যে কোন সময় ত্যাগ করা চলে, কিন্তু একটি রাষ্ট্রের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া তত সহজসাধ্য নয়। এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়, তবে তাহা সর্তসাপেক্ষ।

(২) কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে একই সংগে যত খুসি প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে, কিন্তু একই সময়ে সে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না।

(৩) রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নির্দিষ্ট, অর্থাৎ একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে রাষ্ট্র আবদ্ধ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এইরূপ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই। রেড ক্রশ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া আছে। তাহা ছাড়া এই সব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূখণ্ড (territory) বলিয়াও কিছু নাই।

কোন প্রতিষ্ঠানের হয়তো ভূসম্পত্তি বা গৃহ (property) আছে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভরশীল।

(৪) রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় মানুষের ইচ্ছানুসারে।

(৫) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ দুই-একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, এবং এই দিক হইতে ইহা ব্যাপকতর।

(৬) রাষ্ট্র মোটামুটি চিরস্থায়ী। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠানকেই অস্তিত্ব বিলোপ করিতে দেখা যায়। যেমন, চীনের ভারত আক্রমণের পর পশ্চিম বঙ্গে 'চীন ভারত মৈত্রী সমিতি' তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য অনেক সময় এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিংবা কয়েকটি রাষ্ট্র মিলিয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করে। এই ক্ষেত্রে ঠিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না—রাষ্ট্ররূপের রূপান্তর ঘটে মাত্র।

(৭) রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পার্থক্য হইল—রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই। রাষ্ট্র তাহার সদস্যদের এমন কি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও রাষ্ট্রের আইন মানিতে বাধ্য করিতে পারে এবং যে কোন শাস্তি দিতে পারে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একই পর্যায়ভুক্ত নহে, রাষ্ট্রের স্থান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে।

Q. 14. Discuss the significance and meaning of 'territory' as a constituent element of the state. What are the exceptions to the principle of exclusive jurisdiction of a state over its own territory? (Cal. 1960)

রাষ্ট্র যে চারিটি প্রধান উপাদান লইয়া গঠিত, ভূখণ্ড তাহার মধ্যে একটি। জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, এই দুইটি রাষ্ট্রের বস্তুগত উপাদান (physical elements)। নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। প্রাচীনকালে অনেক উপজাতি দলবদ্ধভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত। এখনও যাযাবর শ্রেণীর অনেকে এইভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে নিয়ম-কানুন ও কর্তৃত্বের ধারণাও রহিয়াছে। তথাপি স্থায়ীভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে না বলিয়া ইহাদের রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্র বলিতেই আমাদের চোখের সম্মুখে একটি স্পষ্ট ভূখণ্ড ভাসিয়া উঠে।

রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সার্বভৌমিকতার (territorial sovereignty) ধারণা ভূখণ্ড হইতেই আসিয়াছে। অধ্যাপক গেটেল বলিয়াছেন, "আঞ্চলিক সার্বভৌমিকতা ও কর্তৃত্বের ধারণা বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।" ("...the idea of territorial sovereignty and jurisdiction is firmly embedded in present political thought.")

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিতে কেবলমাত্র জমির উপরিভাগ ও নদী, বনভূমি, পর্বতমালা প্রভৃতি বুঝায় না। জমির নীচে যে খনিজ ও অন্যান্য দ্রব্য সম্বলিত ভূভাগ (sub-soil) রহিয়াছে, জমির উপরে যে আকাশসীমা (air space) রহিয়াছে, তাহার কিছুটা এবং উপকূল হইতে তিন মাইল (বর্তমানে ইহা বারো মাইল করিবার চেষ্টা হইতেছে) পর্যন্ত প্রান্তিক সমুদ্রভাগ (marginal sea), এই সবকিছুই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। সমুদ্রে অবস্থানরত জাহাজে যে রাষ্ট্রের পতাকা থাকে, কোন কোন কার্যের জন্য জাহাজকে সেই রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অংশ বলিয়া মনে করা হয়। যেমন, এই জাহাজে কাহারও জন্ম হইলে সে এই রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে জন্মিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা হয়।

রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তন কতটা হইবে, এই বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ন্যায় বিরাট আয়তনের রাষ্ট্র যেমন আছে, সেইরূপ সান মারিনোর ন্যায় মাত্র ১৮ বর্গমাইলের রাষ্ট্রও রহিয়াছে। পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে রাষ্ট্রের আকার ছোট হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে এবং বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতিক সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের সীমা মোটামুটি নির্ধারিত হওয়া উচিত বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। ইহা আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (internal sovereignty)। অবশ্য বহুত্ববাদী সমালোচকরা (Pluralists) এই কথা সম্পূর্ণ মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে, রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ধর্মসংঘ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমিতির উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব নাই—ইহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কিন্তু এই মত সত্য নহে। রাষ্ট্রের

চতুঃসীমার মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহার সব কিছুর উপরে রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে কেহ কাহাকেও মানিবে না এবং অরাজকতার সৃষ্টি হইবে।

তবে নিজ ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের যে অবাধ সার্বভৌমিকতা কল্পনা করা হয়, তাহার কয়েকটি ব্যতিক্রম রহিয়াছে। ব্যতিক্রমগুলি নিম্নরূপ :

(১) **কনডোমিনিয়াম বা যুক্ত-শাসন এলাকা (Condominium অথবা Co-imperium)**—অনেক সময় একই ভূখণ্ডের উপর দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে। কিছুদিন পূর্বে সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্ত কর্তৃত্ব ছিল। অর্থাৎ, সুদানের ভূখণ্ডের উপর পরাধীন সুদানের তো নয়ই, এমন কি ইংল্যাণ্ড বা মিশর কাহারও এককভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকার ছিল না। উহাকে একত্র শাসন পরিচালনা করিতে হইত। সম্প্রতি কোন কোন মহল হইতে কাশ্মীরের উপর ভারত ও পাকিস্তানের এইরূপ যুক্ত-কর্তৃত্বের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) **যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ কর্তৃত্বের ব্যতিক্রম**—অধ্যাপক গার্ণার অন্যতম ব্যতিক্রমরূপে যুক্তরাষ্ট্রের (federal union) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে একই ভূ-খণ্ডের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। (অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলি ঠিক রাষ্ট্র নহে ; সুতরাং এই ব্যতিক্রমটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়।)

(৩) **কূটনৈতিক দূতাবাস ও বৈদেশিক প্রতিনিধি**—রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের যে সকল দূতাবাস রহিয়াছে, তাহার উপর রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। দূতাবাস সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভূমির উপর সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নাই বলিয়া মনে করা হয়। রাষ্ট্রের পুলিশ দূতাবাসের বিনা অনুমতিতে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, রাষ্ট্রশক্তির শাস্তি এড়াইবার জন্য বিরাগভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তি দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ (asylum) করেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নে এইরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তিদের ব্যাপারেও সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রের নিজস্ব আইনকানুন অনুযায়ী নিজের আদালতে বিচার করা যায় না।

(৪) **সামরিক অবরোধ**—যুদ্ধের সময় অনেক ক্ষেত্রে অপর রাষ্ট্রের

সৈন্যদল রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অংশবিশেষ দখল করিয়া থাকে। আইনসঙ্গতভাবে এই ভূখণ্ডের উপর যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা রহিয়াছে, সামরিক অবরোধের দরুণ তখন তাহার সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াও এইরূপ অবরোধ ঘটিতে পারে। কিছুদিন পূর্বে ভারতের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পাথারিয়া অঞ্চল পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলে ছিল। ভারত-চীন সীমান্তে কোন কোন অংশ এখনও চীনের দখলে রহিয়াছে। এই সব স্থান ভারতের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, এবং আইনতঃ এখানে ভারত রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে। কিন্তু অবরোধের সময় ভারতের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। অবাধ কর্তৃত্বের ইহা একটি ব্যতিক্রম।

(৫) **ছিটমহল** (Enclave)—রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কখনও কখনও অন্য রাষ্ট্রের জমি থাকিতে পারে। ইহাকে 'ছিটমহল' বলে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরস্পরের এইরূপ অনেকগুলি ছিটমহল রহিয়াছে। দেশ বিভাগের সময় ভারতের কিছু জমি পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়িয়াছে এবং অনুরূপভাবে পাকিস্তানেরও কিছু জমি ভারতের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ

[THEORIES OF THE ORIGIN OF THE STATE]

Q. 15. Critically discuss the theory of the Divine Origin of the State. (Alla. 1930, '33)

ভূমিকা—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে 'রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ' বা ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

বিবৃতি— এই মতবাদে বলা হয়, ভগবান স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজা রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করেন। রাজার মাধ্যমে ভগবানের ইচ্ছা মানব সমাজের নিকট প্রচারিত হয়। সুতরাং রাজার ইচ্ছাকে অমান্য করার অর্থ ভগবানের ইচ্ছাকে অমান্য করা—রাজদ্রোহিতা অর্থ ধর্মদ্রোহিতা।

ভারত, চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গ্রন্থে ও বাইবেলে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রবার্ট ফিল্মার ১৬৮১ সালে "প্যাট্রিয়ার্কা" গ্রন্থে এই মত সমর্থন করেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসও এই মতবাদের সমর্থনে একটি পুস্তক লেখেন। ১৮১৫ সালে প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার শাসকগণ তাঁহাদের "হোলি এ্যালায়েন্সের" ঘোষণাতে বলেন যে, ভগবানের নির্দেশে তাঁহারা একত্রিত হইয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা অবশ্য এই মতবাদ গ্রহণ করে নাই। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পর হইতেই ইহার প্রসার হইয়াছিল এবং মধ্যযুগে ইউরোপে রাজতন্ত্রের সহিত গীর্জার বিবাদের সময় ইহা সর্বাপেক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে। পোপ দাবী করেন তিনিই ভগবানের প্রতিনিধি, সুতরাং রাজশক্তিকে তাঁহার নিকট মাথা নত করিতে হইবে। কিন্তু রোমের সম্রাট (এবং অন্যান্য রাজা ও সম্রাট) বলেন, ভগবান রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রাধান্য মানিতে হইবে। বহুদিন এই বিবাদ চলে। শেষ পর্যন্ত যুক্তির দ্বারা না হইলেও সৈন্যবলের সাহায্যে রাজশক্তির প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়।

সমালোচনা—আধুনিক লেখকগণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন নাই। (১) রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট একটি বিবর্তিত প্রতিষ্ঠান। ইহা

ভগবান-সৃষ্ট নহে। (২) এই মতবাদ রাজতন্ত্র ভিন্ন প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে না। অতি প্রাচীন কালেও প্রজাতন্ত্র ছিল। এইরূপ শাসন কে সৃষ্টি করিল? এখানে ভগবানের প্রতিনিধিই বা কে? সুতরাং ভগবান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। (৩ নিজেদের খেয়ালখুসি মত শাসন করিবার কোনও দৈব অধিকার রাজার বা অন্য কোন শাসকের নাই। (৪) এই মতবাদ কেবল ভুল নয়, ইহার পরিণতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কার্যতঃ দেখা গিয়াছে এই মতবাদের সাহায্য লইয়া বহু রাজা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ঈশ্বরসৃষ্ট রাষ্ট্র শাসন করিতেছেন, ইহা মানিয়া লইলে স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারের প্রতিবাদ করা চলে না। (৫) রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলেও এই মতবাদের সত্যতা স্বীকৃত হয় না। সর্বমংগলময় ভগবান কি কখনও অত্যাচারী রাজার সৃষ্টি করিতে পারেন?

উপসংহার—সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিকাশের ফলে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মতবাদ রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম দিকে মানুষকে আনুগত্য ও সহযোগিতার শিক্ষা দিয়াছিল। প্রাচীনকালে মানুষের তৈরী আইন-কানুন অপেক্ষা ধর্মের বিধানই ছিল বড়। ধর্মের নামে তাই মানুষকে সহজে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল।

Q. 16. "Government rests on force." "Government rests on opinion." Discuss these statements carefully.

(Cal. 1942, '44, '48, Punj. 1936, '40, All. 1930).

Or, "Will, not force is the basis of the State." Explain.

(Punj. 1939, Cal. 1956)

Or, Critically examine the Force theory of the origin of the State. (Punj. 1940, '41, All. 1943, Cal. 1963)

ভূমিকা—বলপ্রয়োগের মতবাদ অনুসারে, বলবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক বলপ্রয়োগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পদানত করিয়া প্রভুত্ব স্থাপনের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্যও বলপ্রয়োগ করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ভিত্তির মূল হইল বলপ্রয়োগ।

বিবৃতি—**লীকক**, ওপেনহাইমার, হিউম, ট্রিট্স্কে, বোসাঙ্কে প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তাহার প্রকৃতির মূল শক্তি রূপে এই বলপ্রয়োগের মতবাদের সমর্থক। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ এই মতবাদ প্রচার করিয়াই রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে, নেহাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা যে রাষ্ট্রের উদ্ভব, তাহা সমর্থন দাবি করিতে পারে না। রাষ্ট্রক্ষমতা প্রসারের বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরাও মনে করিতেন, রাষ্ট্র নিছক বলপ্রয়োগের ফল। অপর-দিকে সমাজতন্ত্রীরাও বলেন, দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার জন্য বলপ্রয়োগের দ্বারা শোষকশ্রেণী রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে এবং নিজেদের মুনাফার স্বার্থেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইহাকে টিকাইয়া রাখিয়াছে।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বারে বারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হইয়াছে। মানুষে-মানুষে কলহ, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ লাগিয়াই আছে। এই শতাব্দীতেও দুই-দুইটি মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও আমরা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতেছি। জগতে যাহার জোর যত বেশী তত তাহার ক্ষমতা, ততই তাহার মর্যাদা—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' !

সমালোচনা—রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে এখন আর কেহ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। (১) বলপ্রয়োগ রাষ্ট্র-বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিলেও, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইহাই একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। রাষ্ট্রগঠনে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্ম, নীতিবোধ প্রভৃতিরও অবদান রহিয়াছে। (২) কেবল মাত্র বলপ্রয়োগের ভয়েই মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে না। বলপ্রয়োগের ভয় আছে বলিয়া মানুষ রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলে, ইহা কতকাংশে সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নহে। বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইলেও জনসাধারণের সমর্থন ভিন্ন দীর্ঘকাল কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের সাহায্যে ইহাকে রক্ষা করা যায় না। ম্যাকাইভার বলিয়াছেন, "একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা জনসাধারণকে বেশিদিন সংগঠিত রাখা যায় না ; কারণ জনসাধারণের সম্মতি না থাকিলে বলপ্রয়োগ বিভেদেরই সৃষ্টি করে।" গ্রীণ বলিয়াছেন,—"বলপ্রয়োগ নয়, জনসাধারণের সম্মতিই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি।" জনসাধারণ রাষ্ট্রকে তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে বলিয়াই ইহাকে স্বীকার করিয়া লয় এবং নিয়ম-কানুন মানিয়া চলে (৩) নীতির দিক হইতেও বলপ্রয়োগ মতবাদ স্বৈরাচার সমর্থন করে। দুর্বলের উপর সবলের

প্রভুত্ব বা "জোর যার মুলুক তার" নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। (৪) ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির প্রতিবন্ধক। এই নীতিকে স্বীকার করিয়া লইলে শক্তিশালী রাষ্ট্র সর্বদাই দুর্বল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে না, এবং নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিবে। (৫) এই মতবাদ মানব চরিত্রের শুধু ক্ষুদ্রতা, নীচতা, ঘৃণা প্রভৃতির প্রতিই আলোকপাত করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণও আছে।

উপসংহার—উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্র-বিবর্তনে বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। লোককে গায়ের জোরে রাষ্ট্রশক্তির বশে আনা হইয়াছে। তবে ইহাই রাষ্ট্র-গঠনের একমাত্র উপাদান নহে। রক্তের সম্পর্ক, ধর্মীয় প্রভাব, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতির মত ইহাও একটি অন্যতম উপাদান—একমাত্র উপাদান নহে। সার্বভৌমত্বের মূলে কিছুটা বলপ্রয়োগ না থাকিলে ইহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিতে অস্বীকার করিলে রাষ্ট্রকে অনেক সময় বলপ্রয়োগ দ্বারা আইন মান্য করাইতে হয়। বলপ্রয়োগের কোন মূল্য না থাকিলে বিভিন্ন রাষ্ট্র সৈন্যদল ও পুলিশবাহিনী রাখিয়াছে কেন? তবে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ কখনও রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে না—ইহার পশ্চাতে জনসমর্থন অবশ্যই চাই। সুতরাং কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ অথবা বলপ্রয়োগ-রহিত আদর্শবাদ, একক ভাবে কোনটিই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। জনমতের দ্বারা সমর্থিত বলপ্রয়োগের সার্থক ব্যবহার প্রয়োজন।

Q. 17. Critically examine the Patriarchal and Matriarchal theories of the origin of the State.

(Punj. 1935, '43, Mad. 1937)

পিতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব (Patriarchal Theory): এই মত অনুসারে রাষ্ট্রকে পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বলিয়া মনে করা হয়। স্যার হেনরী মেইনের মতে, আদিম মানব পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত ছিল। সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা পিতৃশ্রেষ্ঠ (Patriarch) ছিল পরিবারের কর্তা ও অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী। হিন্দু ও রোমানদের মধ্যে এইরূপ পরিবারের অস্তিত্ব আছে। সম্প্রসারণের ফলে কয়েকটি পরিবারকে লইয়া গোষ্ঠী, কয়েকটি গোষ্ঠী

লইয়া জাতি এবং অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরিবারের পিতৃশ্রেষ্ঠই ক্রমে রাষ্ট্রনায়ক হইয়াছে। অ্যারিষ্টটল ও রবার্ট ফিল্‌মারও এই মতবাদের সমর্থক।

ম্যাকলীনান, মর্গান, জেংকস প্রভৃতি এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আদিম সমাজের সর্বজনীন রূপ নয়। বহুস্থানে মাতার দিক দিয়া বংশক্রম নির্ধারিত হইত। আবার অনেকে পরিবারের পরিবর্তে শিথিল সম্বন্ধযুক্ত দলে বাস করিত।

মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব (Matriarchal Theory)ঃ প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকের বহুপতিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বংশ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি মাতার দিক হইতে নির্ধারণ করা হইত। পরিবার প্রথার শুরুতেও মাতাই ছিল পরিবারের কর্ত্রী। সুতরাং কর্তৃত্ব ছিল মাতৃতান্ত্রিক—পিতৃতান্ত্রিক নয়। জেংকস এই মতবাদের সমর্থনে অষ্ট্রেলিয়া ও মালয়ের আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৌর্য সাম্রাজ্য এই মাতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। মালাবার অঞ্চলে এখনও মাতৃশ্রেষ্ঠার (Matriarch) কর্তৃত্বাধীন পরিবার দেখা যায়।

এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সর্বজনীন ছিল না, বিভিন্ন দেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্বই ইহার প্রমাণ। আবার, দৈহিক গঠনের দিক হইতে পুরুষ নারী অপেক্ষা শক্তিশালী, সুতরাং নারী চিরকাল পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছে, এই যুক্তি যথার্থ নয়।

রাষ্ট্র-উৎপত্তির ব্যাখ্যা রূপে পিতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব ও মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব এই উভয় মতবাদই ভ্রান্তি। আসলে উভয় মতবাদেরই ভিত্তি প্রায় এক, অর্থাৎ পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু গার্ণারের মতানুসারে, রাষ্ট্র ও পরিবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। একের সম্প্রসারণ বা বিভক্তিকরণে অপরের উদ্ভব হয় নাই। উপরন্তু জেংকস্ বলিয়াছেন, পরিবার হইতে জাতির ক্রম-পরিণতি হয় নাই, পরিণতি হইয়াছে বিপরীত দিক হইতে। অর্থাৎ, জাতি হইতে উপজাতি, উপজাতি হইতে গোষ্ঠী, এবং সর্বশেষে গোষ্ঠী হইতে পরিবার হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিকাশে একই রক্তের সম্পর্কযুক্ত মানুষের ঐক্য কিছুটা সহায়তা করিয়াছে সত্য, তথাপি রাষ্ট্র ও পরিবার-ব্যবস্থা দুইটি ভিন্ন জিনিষ —ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত নয়।

Q. 18. Critically examine the Social Contract theory of the origin of the State. Cal. 1941, '42, '45, '49, Punj. 1940, '43, Nag. 1943).

ভূমিকা—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বিবৃতি—এই মতবাদ অনুসারে বলা হয়, আদিম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক একটি চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ এমন একটি অবস্থায় বাস করিত যেখানে রাষ্ট্র বা সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না। এই অবস্থাকে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বা 'প্রকৃতির রাজ্য' (State of Nature) বলা হয়। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত। মানুষের তৈরী কোন আইনকানুন ছিল না। প্রাকৃতিক আইনই ছিল মানুষের যথেচ্ছাচারিতার পথে একমাত্র বাধা। কিন্তু ক্রমে মানুষ এই প্রকৃতির রাজ্যে নানা অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে বা কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে যে সব প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করিত তাহা সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও সংরক্ষিত অধিকার লাভ করে। কেবল রাষ্ট্রের উৎপত্তি নয়, এই মতবাদের দ্বারা রাষ্ট্রে শাসন ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। চুক্তিবাদের সমর্থকেরা বলেন, মানুষ নিজেরা চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই তাহারা রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলে।

এই মতবাদ অতি প্রাচীন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে ইহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টরা ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রোমান পণ্ডিত পলিবিয়াস ও আলপিয়ান এবং মধ্যযুগের আলথুসিয়াস ও ম্যানিগোল্ড এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তবে যে তিনজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম এই মতবাদ প্রসংগে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাঁহারা হইলেন ইংরেজ লেখক হব্‌স্ ও লক্ এবং ফরাসী লেখক রুশো। রুশোর পরেও কাণ্ট এই মতবাদের সমর্থনে আলোচনা করিয়াছেন।

হব্‌স্—১৬৫১ সালে 'লেভিয়াথান' গ্রন্থ রচনা করিয়া হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন। হব্‌সের মতে মানুষ যে-প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত তাহা ছিল "নিঃসংগ, দীন, কদর্য, পাশব ও স্বল্পায়ু।" (**"solitary, poor,**

nasty, brutish and short.") এই বিভীষিকাময় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া কোন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে তাহাদের প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সমর্থন করে। এইভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল, তিনি বা তাঁহারা চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহারা চুক্তিকারী হইলেন না। ইহার ফলে চুক্তি পালনের ব্যাপারে শাসনব্যবস্থার কোনরূপ দায়িত্ব রহিল না, অথচ, জনসাধারণকে সব সময়েই এই ক্ষমতার কাছে অনুগত থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় জেম্‌সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থনের জন্য হব্‌স্ এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। হব্‌স্ জনসাধারণের মধ্যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, রাজতন্ত্রের চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সকলের কল্যাণ হইবে।

লক্—১৬৮৯ সালে "ট্রিটিজ্ অফ সিভিল গভর্ণমেণ্ট" গ্রন্থে লক্ তাঁহার মত প্রকাশ করেন। লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সাম্য ছিল —শান্তি ও রাজনীতি এখানে বিরাজ করিত। তথাপি মানুষে মানুষে কোন দ্বন্দ্ব বা বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহার নিষ্পত্তির জন্য কোন সর্বজনস্বীকৃত কর্তৃত্ব ছিল না। এই কারণেই মানুষ চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। লক্ দুইটি চুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় চুক্তির ফলে শাসন-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এখানে রাজা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ও তাঁহার ক্ষমতা চুক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ। লক্ স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং ১৬৮৮ সালে ইংরেজ রাজার সিংহাসনচ্যুতি তথা "গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের" সমর্থনে তাঁহার মতবাদকে ব্যবহার করিয়াছেন। লকের মতবাদ ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়াছে।

রুশো—রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ "সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট" ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয়। রুশোর বর্ণনায়, প্রকৃতির রাজ্য স্বর্গরাজ্যের ন্যায় সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের দরুণ এই রাজ্যেও নানারূপ জটিলতা দেখা দেয়, এবং এই সব অসুবিধা দূর করার জন্যই মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করে। তবে এখানে মানুষ সকল ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট দেয় নাই, সমগ্র সমাজের হাতে অর্পণ

করিয়াছে। রুশো ইহার নাম দিয়াছেন "সাধারণের ইচ্ছা" (General Will)। চুক্তির ফলে স্থির হইল, পূর্বে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিত, তাহা পৃথক স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া প্রয়োগ না করিয়া সমষ্টিগত 'সাধারণের ইচ্ছার' নির্দেশে প্রয়োগ করিবে। রুশো হব্‌স্‌ ও লকের মত-বাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লকের ন্যায় তিনি জন-সাধারণকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করেন, আবার হব্‌সের মত তিনি এই সার্বভৌমিকতাকে অসীম ক্ষমতার আধার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রুশোর মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাভাষ স্বরূপ। গণতন্ত্রের প্রসারে ইহার অবদান অসামান্য।

সমালোচনা—আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সামাজিক চুক্তির মতবাদকে অনৈতিহাসিক, যুক্তিবিরুদ্ধ ও বিপজ্জনক বলিয়া বর্জন করিয়াছেন। (১) চুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। ১৬২০ সালে সম্পাদিত "মে ফ্লাওয়ার" চুক্তির উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, ১০১ জন দেশত্যাগী ইংরেজ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। ইহারা 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজে করিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে একটি জনহীন আমেরিকার ভূখণ্ডে গিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র স্থাপন করে। কিন্তু ইহারা সকলেই চুক্তির পূর্বে অন্য একটি রাষ্ট্র, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের নাগরিক ছিল। সুতরাং রাষ্ট্র-হীন অবস্থা হইতে রাষ্ট্রে গমনের দৃষ্টান্ত ইহা হইতে পারে না। (২) প্রকৃতির রাজ্যের অস্তিত্ব ইতিহাসসম্মত নয়। কোথাও ইহার অবস্থান ছিল, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানুষ সর্বদাই রাষ্ট্রে বাস করিয়াছে। (৩) প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীন ছিল, এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন না থাকিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়। কেবল বলবান ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিবে, দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। সুতরাং রাষ্ট্র-পূর্ব প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করিত, সামাজিক চুক্তি মতবাদের এই ধারণাটি ভুল। (৪) কল্পিত প্রকৃতির রাজ্যে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় বাস করিলে মানুষ রাষ্ট্রের চিন্তা কোথা হইতে পাইবে, আর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগিতাই বা কিভাবে উপলব্ধি করিবে? (৫) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ভিত্তি হিসাবে চুক্তিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্র ও ইহার আইন না থাকিলে চুক্তির ধারণা কোথা হইতে আসিবে? (৬) চুক্তির দ্বারা যদি রাষ্ট্রের

উদ্ভব হইয়া থাকে তবে যাহারা চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল কেবল তাহারাই অর্থাৎ, আমাদের আদি পিতৃপুরুষেরা ইহা মানিতে বাধ্য। উত্তরপুরুষদের ইহা মানিবার কোন কারণ নাই। (৭) চুক্তির দ্বারাই যদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা না করা, এবং ইচ্ছামত চুক্তিকে বাতিল করা চুক্তিকারী মানুষের স্বেচ্ছাধীন। ইহা অরাজকতার নামান্তর মাত্র। যে-কেহ যে-কোন সময় বলিতে পারে, আমি রাষ্ট্রকে মানিব না—ইহার আইন-কানুন মানিব না। এই কারণেই ব্লুণ্টস্লি এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রকে "মানুষের খেয়ালের ফলে সৃষ্ট" এবং বার্ক ইহাকে "অরাজকতার সংক্ষিপ্তসার" আখ্যা দিয়াছেন।

উপসংহার—সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যারূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও, গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে ইহার বিপুল প্রভাবের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংল্যাণ্ডে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে লকের মতবাদ। রুশোর লেখনী ফরাসী বিপ্লব ও তৎ-পরবর্তীকালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতার ধারণার বিকাশের মূলে হব্‌সের মতের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সামাজিক চুক্তি মতবাদ 'রাষ্ট্র বিধাতার' সৃষ্টি, এই মতবাদ ও বলপ্রয়োগের মতবাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং সকল কর্তৃত্ব ও শাসনব্যবস্থার মূলকেন্দ্র যে জনসাধারণ, গণতন্ত্রের এই মূলনীতি গ্রহণে সহায়তা করিয়াছে।

Q. 19. State the points of agreement and difference between Hobbes, Locke and Rousseau as expounders of the Social Contract theory. (Cal. 1950, '52)

Or, Discuss the points of agreement and difference between Hobbes and Rousseau as expounders of the Social Contract theory. (Cal. 1959)

সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিশ্লেষণে হবস্‌, লক্‌ ও রুশোর অবদান প্রচুর। তাঁহাদের মতবাদে যেমন বহুস্থানে সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনি অনেকস্থলে বৈসাদৃশ্যও রহিয়াছে।

সাদৃশ্য—(১) তিনজনেই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(২) প্রত্যেকেই রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থারূপে প্রকৃতির রাজ্যের অস্তিত্বের কল্পনা করিয়াছেন এবং এই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ অধিকার ভোগ করিত এইরূপ বলিয়াছেন।

(৩) প্রকৃতির রাজ্যের অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে, এই বিষয়ে তিনজনেই একমত।

বৈসাদৃশ্য—(১) প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা হবস্, লক্ ও রুশো তিনজন তিন প্রকার দিয়াছেন। হব্সের মতে, ইহা ভয়াবহ ও বিভীষিকার রাজত্ব। মানুষ এখানে স্বার্থপর ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির। লকের বর্ণনা অনুসারে এখানে শান্তি ও ন্যায়নীতি বিরাজ করিত। রুশো প্রকৃতির রাজ্যকে মর্তের স্বর্গরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ এখানে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর মধ্যে বাস করিত।

(২) হব্সের মতে, প্রকৃতির রাজ্যের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। লকের মতে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিবার ব্যবস্থাও অনুরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রুশোর মতে, সভ্যতার বিকাশের ফলে, বিশেষতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, মানুষের জীবনে যে-সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহার সমাধানের জন্যই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

(৩) হব্সের মতে, একটিমাত্র চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ বলেন, প্রথমে একটি চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, এবং পরে অপর একটি চুক্তির ফলে শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। রুশোর মতে, একটি চুক্তির দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পরে "সাধারণের ইচ্ছা" কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে, আইন প্রণয়ন দ্বারা শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) হব্স্ রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। কিন্তু লক্ ও রুশো এই দুইটিকে পৃথক করিয়াছেন।

(৫) হব্সের মতে, রাজা চুক্তির কোন পক্ষ নহেন। লকের মতে, রাজা চুক্তির একটি পক্ষ। রুশো বলেন, মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে। ইহাতে রাজার কোন স্থান নাই।

(৬) হব্সের মতে, জনসাধারণ সকল ক্ষমতা বিনাসর্তে রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। অবশ্য যদি কখনও সার্বভৌম কর্তৃত্ব রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা বজায় না রাখিতে পারেন তাহা হইলে বিদ্রোহ করা চলিবে। লকের মতে, জনসাধারণ আংশিক ক্ষমতা 'রাজাকে দিয়াছে এবং এই ক্ষমতাদান সর্তসাপেক্ষ। প্রয়োজনবোধে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা

তাহাদের নিশ্চয়ই আছে। রুশোর মতে, জনসাধারণ সকল ক্ষমতা নিজেদের নিকট, অর্থাৎ 'সাধারণের ইচ্ছার' নিকট সমর্পণ করিয়াছে। জনসাধারণ নিজেরাই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে, তবে প্রত্যেকে পৃথকভাবে নয়—সকলে সামগ্রিকভাবে। সাধারণের সমগ্র ইচ্ছার নিকট ব্যক্তি নিজস্ব ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়াছে।

(৭) হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছেন। তবে হব্‌স্ অত্যাচারের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা বলা ঠিক নয়। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য চরমক্ষমতাসম্পন্ন অবাধ রাজতন্ত্র প্রয়োজন। লক্ ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থনের মধ্য দিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের তথা 'বৃটিশ' গণতন্ত্রের সমর্থন করেন। রুশো তাঁহার মতবাদের দ্বারা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান; তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগত পুরোধা। রুশোর বক্তব্য হয়তো সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়, কোথাও কোথাও পরস্পর-বিরোধিতাও আছে, তথাপি রুশোর মতবাদ আধুনিক কালে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।

Q. 20. State the points of agreement and difference between Hobbes and Locke as expounders of the Social Contract theory.

ভূমিকা—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুধুমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানটুকু যাঁর সম্বল একথা তিনিও জানেন যে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সহিত হব্‌স্, লক্ এবং রুশোর নাম ওতপ্রোত জড়িত। এইজন্যই এই তিনজনকে এক কথায় চুক্তিবাদী বলা হয়। কিন্তু এই তিনজন একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের লেখনী চালনা করেন নাই। সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে তাঁহাদের মধ্যে অনেক অমিল থাকিবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে কোন বিষয়েই তাঁহাদের মধ্যে মিল থাকিবে না। আলোচ্য অংশে আমাদের বিচার্য বিষয় হইতেছে হব্‌স এবং লকের মধ্যে কতটুকুই বা মিল এবং কতটাই বা অমিল।

বিবৃতি—হব্‌স ও লক দুজনেই একমত যে মানুষ সর্বপ্রথম এক প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিত; অর্থাৎ সুসংবদ্ধ এবং সুশৃংখল জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নামক কোনরূপ কোন সংগঠনের অস্তিত্ব তখন ছিল না। মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি দেবীর প্রভাবই ছিল সর্বাধিক।

দুইজনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় মিল পাই চুক্তি করিবার প্রয়োজনের ব্যাপারে। যে কোন কারণেই হউক প্রাকৃতিক অবস্থায় নানা অসুবিধা দেখা দিল এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করা মানুষের পক্ষে আর যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। তাই তাহারা একটি চুক্তি করিবার মনস্থ করিল, যাহাতে এই অসুবিধা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

অতঃপর মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল কারণ তাঁহারা মনে করিল যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অসুবিধাগুলি দূর হইবে। সুতরাং এ বিষয়টিতেও দুইজনের মতের মিল আমরা দেখিতে পাই।

অপর একটি বিষয়েও আমরা দুইজনের মধ্যে মিল দেখিতে পাই। হব্‌স এবং লক উভয়েই সামাজিক চুক্তি মতবাদের সম্প্রচারে লেখনী ধারণ করেন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে। হব্‌সের উদ্দেশ্য ছিল ষ্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের সমর্থন এবং লকের উদ্দেশ্য ছিল ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থন।

কিন্তু এই কয়েকটি বিষয়ে মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অমিলের সংখ্যাও প্রচুর।

তাঁহাদের মধ্যে প্রথম অমিল আমরা দেখি তাঁহাদের কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে। নৈরাশ্যবাদী ধারণার দ্বারা জড়িত হইয়া হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা প্রসংগে আমাদের সম্মুখে এক বিষাদময় ছবি উপস্থাপিত করেন। তাঁহাদের মতে সেই অবস্থায় সমাজেরও উৎপত্তি হয় নাই। স্বভাবতঃই ইহা ছিল এক ভয়াবহ অবস্থা। এই অবস্থায় লোকে সর্বদা মারামারি কাটাকাটি করিত। নিয়ম কানুনের বালাই ছিল না। যে যাহা পারিত লুটিয়া পুটিয়া খাইত। 'যাহাকে পার তাহাকেই মার; যাহাই পার গায়ের জোরে দখল কর'—এই ছিল সেখানে নিয়ম। ফলে প্রত্যেকেই জীবন দুর্বিসহ মনে করিত। লক কিন্তু হবসের ন্যায় প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখেন নাই, এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় তিনি যে স্বাধীনতার কথা কল্পনা করিয়াছেন তাহার ভিত্তি পাশবিক বলও নয়। লকের প্রাকৃতিক অবস্থায় এক ধরণের সমাজ জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে মানুষ এক ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলিত। তবে লক একথা স্বীকার করিয়াছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা অসুবিধা এবং অসন্তোষসূচক ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের যে চিত্র তাঁহারা আঁকিয়াছেন

তাহাতেও যথেষ্ট অমিল দেখা যায়। হব্‌সের মতে মানুষ স্বভাবতঃই খারাপ। সমাজ সৃষ্টির পূর্বে তাহার জীবন ছিল সঙ্গীহীন, কদর্য, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং সংক্ষিপ্ত। প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক মানুষ শত্রুরূপে দেখিত। নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে একজন মানুষ পাশবিক বলের সাহায্যে অপর মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। এই অবস্থা মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এবং এই ভীতি জন্ম দেয় সদা সর্বদা এক যুদ্ধমান অবস্থার। কিন্তু লক্ বলেন যে মানুষ স্বভাবতঃ শান্ত ও আইনের অনুগত। রাষ্ট্রের আইন তৈয়ারী হইবার পূর্বে সে প্রাকৃতিক আইন মানিয়া চলিত। সুতরাং লক যে মানুষের ছবি আঁকিয়াছেন তাহা হব্‌সের চিত্রিত ছবির মত এত খারাপ নয়। হব্‌সের লেখা পড়িয়া যখন আমাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় লক তখন আমাদের কিছুটা সান্ত্বনার বাণী শুনান।

তৃতীয়তঃ, হবসের মত অনুসারে একটি মাত্র চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র (রাষ্ট্র এবং সরকার তাঁহার মতে সমার্থক) গঠিত হয়। লক বলেন চুক্তি হইয়াছিল দুইটি—একটি সামাজিক চুক্তি অপরটি রাজনৈতিক চুক্তি। হব্‌স বলেন যে লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাহাদের সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একটি সংসদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদই হইলেন সার্বভৌম। সার্বভৌম শুধু চূড়ান্ত ক্ষমতারই অধিকারী নহেন, তিনি বা তাঁহারা চুক্তির উর্ধ্বে, কারণ তিনি বা তাঁহারা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন নাই—চুক্তির ফলেই উদ্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের কোন অভিযোগ আনয়ন করা যায় না, এবং অত্যাচারী হইলেও প্রজাদের উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই। প্রজারা যদি ইহা ভংগ করে তবে নিজেরাই দায়ী হইবে এবং ফলস্বরূপ সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং হব্‌স চরম রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার আর বিনাশ নাই। লক বলেন যে লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া প্রথমে রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। পরে রাজার সহিত চুক্তি করিয়া কিছু শক্তি তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করে। রাজা যদি ন্যস্ত ক্ষমতার চেয়ে বেশী ক্ষমতা ব্যবহার করেন অথবা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষায় অক্ষম হন তাহা হইলে প্রজা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। সুতরাং লক নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়া গণতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করিলেন। হব্‌সও অবশ্য বলিয়াছেন

যে কোন রাজা যদি প্রজাদের রক্ষা করিতে না পারেন তবে প্রজারা নিশ্চয়ই সে রাজার বিরোধিতা করিয়া অন্যের অধীনতা স্বীকার করিতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে থাকিতে পারে না। এইরূপে হব্‌স তাঁহার চরম রাজতন্ত্রের আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, হব্‌স যে সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলিয়াছেন তাহা নিরংকুশ, অবিভাজ্য এবং অসীম। তাঁহার মতে এই সার্বভৌম ক্ষমতাই সমাজের জন্ম দেয়। সুতরাং পৃথিবীতে ইহাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া উচিত; এবং হব্‌স ইহাই চাহিতেন যে এই ক্ষমতা কোন এক ব্যক্তি অর্থাৎ রাজার হাতেই ন্যস্ত হউক। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে হব্‌স রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার অস্তিত্বকে একদম স্বীকার করিলেন না। কিন্তু লক বলিলেন যে সার্বভৌম ক্ষমতা নিরংকুশও নয়, এমন কি অবিভাজ্যও নয়। একদিকে জনগণ অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ইহা বিভক্ত। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে জনগণই এই শক্তির আধার; কিন্তু ইহা ব্যবহার করে সরকার। জনগণ ইহা ব্যবহার করে শুধুমাত্র বিপ্লবের সময়। সুতরাং দেখা গেল যে, লক আবার আইনগত সার্বভৌমিকতাকে কতকটা যেন উপেক্ষা করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, লক রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন; হব্‌স কিন্তু তাহা করেন নাই। রাষ্ট্রের ধ্বংস ছাড়াও যে সরকারের পরিবর্তন হইতে পারে একথা হবস বুঝিতে পারেন নাই।

ষষ্ঠতঃ, হব্‌সের মতে চুক্তির পর প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির আর কোন স্বাধীনতা থাকে না, শুধুমাত্র যেটুকু আইন কর্তৃক স্বীকৃত সেইটুকু ছাড়া। সুতরাং আইনের অস্তিত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করিবে। অতএব, আইন এবং স্বাধীনতা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। লকের মতে রাজা ব্যক্তির ধন, প্রাণ ও স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ক্ষমতা চুক্তির সর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সবশেষে এই কথা বলা যায় যে সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে গোটা ধারণাটাকে হব্‌স একটি নিছক কল্পনাপ্রসূত ঐতিহাসিক কাহিনী বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে এক দার্শনিক সত্য। সত্যটা হইতেছে এই যে সরকার শুধুমাত্র পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ইহা জনসাধারণের সম্মতির উপরেও কিছুটা নির্ভরশীল—এইরূপ একটি লোক-

দেখানো ধারণার সৃষ্টি করা। অপর পক্ষে, লক চুক্তিকে এক প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এমন একদিন ছিল যখন জনসাধারণ একজোট হইয়া পরামর্শ করিয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

Q. 21. Explain how Rousseau in his Theory of Social Contract seeks to combine the theories of Hobbes and Locke.
(Cal. 1951, '61)

হব্স্, লক্ ও রুশো তিনজনেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তিনজনের বক্তব্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, আবার কোথাও কোথাও পার্থক্য আছে।

রুশোর মতবাদের মধ্যে আমরা হবস্ ও লকের মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। হব্সের মত রুশো মনে করেন, চুক্তি একটি হইয়াছিল এবং এই একটি চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সরকারের সঙ্গে চুক্তির কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু লকের মতে চুক্তি হইয়াছিল দুইটি—প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র, এবং পরবর্তী অপর একটি চুক্তির দ্বারা সরকার স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে আসল পার্থক্য হইল সার্বভৌমত্ব ও তাহার অধিকারীর প্রশ্নে। হব্সের ন্যায় রুশো রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছেন। হবস্ বলিয়াছেন, রাজশক্তির আদেশ সকলকে নির্বিবাদে মানিয়া লইতে হইবে এবং বিদ্রোহের অধিকার জনসাধারণের নাই। রুশোর মতেও সার্বভৌম শক্তি অর্থাৎ 'সাধারণের ইচ্ছা' (General will) সকল ক্ষমতার অধিকারী। ইহার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ইহা চরম শক্তি। উভয়েই বলিয়াছেন, সার্বভৌমের আদেশ নির্বিবাদে মানিলেই জনসাধারণের কল্যাণ। কিন্তু রুশো হব্সের মত একজন মাত্র রাজা বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেন নাই, এইখানে তিনি লককে অনুসরণ করিয়াছেন। লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদে জনসাধারণকে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রুশো জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দিয়াছেন—তাঁহার মতবাদে রাজার কোন স্থান নাই। রুশো আবার লকের সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণমূলক চরিত্র স্বীকার করেন নাই। লকের সার্বভৌমত্বের ধারণা ক্রটিপূর্ণ। রাজাকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। রাজশক্তির কর্মক্ষেত্র এখানে স্পষ্ট নয়।

রুশো হব্‌সের নিকট হইতে চরম সার্বভৌমত্বের ধারণা ও লকের নিকট হইতে জনসাধারণের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'গণ-সার্বভৌমত্বের' (Popular Sovereignty) মতবাদ দাঁড় করাইয়াছেন। রাজার পরিবর্তে জনসাধারণের কর্তৃত্ব মানিয়া লইলে, রুশোর সার্বভৌমত্বের সহিত হব্‌সের খুব বেশী মিল দেখা যায়। তাই বলা হয়, "হব্‌সের 'লেভিয়াথানে'র মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলে আমরা রুশোর সামাজিক চুক্তি পাইব।" ("Rousseua's 'Social contract' is Hobbe's 'Leviathan' with its head chopped off.")

তবে এই তুলনামূলক আলোচনার সূত্র বেশী দূর টানা উচিত নয়। কারণ, সার্বভৌমত্বের চরম ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন এই বিষয়ে রুশো ও হব্‌স একমত হইলেও একজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আর সকল ব্যক্তির হাতে একসঙ্গে সামগ্রিক ক্ষমতা, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। ফলে উভয়ের সার্বভৌমত্বের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াছে। আবার, লকের ন্যায় রুশো জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিলেও তাহার ব্যবহার একরূপ নহে। রুশোর মতে, জনসাধারণ সর্বদাই ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে, অনেকটা 'স্থায়ী গণ-ভোটের' (Permanent Referendum) ন্যায়। কিন্তু লকের মতবাদে জনসাধারণকে সর্বদা আমরা এই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে দেখি না। কেবলমাত্র রাজা অন্যায় করিলে জনসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

Q. 22. Discuss the Evolutionary theory of the State.
(Cal. 1963)

Or, "The accepted theory of the Origin of the State is the Historical or Evolutionary theory".—Discuss. (Cal. 1952)

ভূমিকা—রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, ইহা বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলেও ইহা জন্মলাভ করে নাই, আবার মানুষের পারস্পরিক চুক্তিতেও ইহার উদ্ভব হয় নাই।

তবে রাষ্ট্রের জন্ম হইল কিভাবে? বিবর্তনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। তাই রাষ্ট্র উৎপত্তির মতবাদকে আমরা বিবর্তনের মতবাদ (Evolutionary theory) বা ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical theory) বলিয়া থাকি।

বিবৃতি—বার্জেসের ভাষায়, "রাষ্ট্র মানব সমাজের প্রগতির ফল।"

অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃই রাষ্ট্রনৈতিক জীব। তাহার স্বভাব তাহাকে প্রথম হইতেই রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। প্রথমে খুব সাধারণভাবে সুরু হইয়া বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং নূতনতর রূপ পরিগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদই হইল বর্তমানে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদ।

রাষ্ট্র-বিবর্তনের পথে রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, বলপ্রয়োগ, অর্থনৈতিক কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

আত্মীয়তাবন্ধন বা রক্তের সম্বন্ধ মানুষকে একত্র বাস করিতে ও সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে শিক্ষা দিয়াছে। বিবাহপ্রথা বহু পরিবারকে একত্রিত করিয়াছে। পরিবারের মধ্যে আদেশ দানের ও আদেশ পালনের রীতির মধ্যেই রহিয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি। পরিবারের কর্তা হইতে গোষ্ঠীর কর্তা এবং গোষ্ঠীর কর্তা হইতে রাষ্ট্রের কর্তা, এইভাবে কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। মানুষ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ মানিতে শেখে।

ধর্ম: গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে রক্তের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে ধর্ম তাহার স্থানে নূতন বন্ধন যোগাইল। আদিম যুগের মানুষ ঈশ্বরভয়ে বিশেষ ভীত ছিল। যাহারা নানারূপ নৈসর্গিক কার্যের ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়া ঈশ্বর ও ধর্মের নামে অনুশাসন প্রচার করিত, সেই পুরোহিত ও রাজারা সকলের আনুগত্য লাভ করিত। এইভাবে ধর্মপ্রভাব রাষ্ট্রবন্ধনে সাহায্য করিয়াছে।

বলপ্রয়োগের সাহায্যে এক গোষ্ঠী বা উপজাতি অপর গোষ্ঠী বা উপ-জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং তাহাদের নিজ শাসনে থাকিতে বাধ্য করে। যুদ্ধে বিজয়ী গোষ্ঠী বা উপজাতি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া সকলকে শাসন করে। বহু রাষ্ট্র এইভাবে সংগঠিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক কারণ রাষ্ট্রের গঠনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, শ্রেণীবিভেদ, শ্রমবিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতির ফলে আইন-প্রণয়ন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। সংগঠিত রাষ্ট্রেই মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা মিটান সম্ভব।

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—একদল লোক রক্তের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হইয়া এক

ধর্মমতে বিশ্বাসী হইয়া একটি ভূখণ্ড করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যে লিপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বিকাশলাভ করিতে থাকে। এই চেতনাই রাষ্ট্রের রূপ নির্ধারণ করে।

জাতীয়তাবাদ ও **আন্তর্জাতিকতার** ধারণাও রাষ্ট্রের বর্তমান রূপ নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রাচীন ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের স্থানে ধীরে ধীরে জাতি-রাষ্ট্র (nation-state) গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক চিন্তার প্রসারের ফলে সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, মহাকাশ অভিযান ও অন্যান্য গ্রহে গমনের চেষ্টার ফলেও রাষ্ট্রের বর্তমান রূপের যথেষ্ট পরিবর্তন হইবে।

এইভাবে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রের বিবর্তন থামে নাই, থামিতে পারে না। এখনও এই বিবর্তনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত নব নব রূপান্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে।

উপসংহার—অনেক সমালোচকের মতে অবশ্য ইহা রাষ্ট্রের বিবর্তনের মতবাদ, উৎপত্তির মতবাদ নহে। প্রথম কবে ও কিভাবে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিল তাহার যথাযথ উত্তর এই মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসংগে এই মতবাদের অন্যতম গুণ হইল কোনও একটি কারণকে প্রধান স্থান দানে অস্বীকৃতি। ঐতিহাসিক গবেষণায় যাহা আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয় নাই, দার্শনিকের কল্পনায় তাহা ধরা পড়ে না, ইহাই বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্যতম বক্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

Q. 23. Critically examine the Organic theory of the State. (Cal. 1935, '40, '62)

Or, What is meant by the organic theory of the State? How far is this theory a satisfactory explanation of nature of the State? (Cal. 1941)

ভূমিকা—রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া জৈব মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি জীবদেহের অনুরূপ। এই মতবাদে জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিবৃতি—এই মতানুসারে রাষ্ট্রকে একটি প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা কোষ বলিয়া মনে করা হয়। জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন জীবদেহের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাদের পৃথক কোন সত্তা নাই, রাষ্ট্রের ব্যক্তিদেরও সেইরূপ পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই। লীকক বলিয়াছেন, গাছের পাতার সঙ্গে গাছের যেমন সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গেও রাষ্ট্রের (সমাজের) তেমনি সম্পর্ক। গাছপালা ও প্রাণীর ন্যায় রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশ জীবদেহের অংগবিশেষের মত নির্দিষ্ট কার্য করে। পৃথক পৃথকভাবে নাগরিকদের কোন সত্তা নাই। রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদানের সমষ্টি মাত্র অপেক্ষা কিছু বেশী। ব্লুণ্টস্লির ভাষায়, একটি প্রস্তর মূর্তি যেমন মার্বেল পাথরের সমষ্টি মাত্র নয়, একটি তৈলচিত্র যেমন তৈলবিন্দুর সমষ্টি মাত্র নয়, তেমনি রাষ্ট্র কেবল ব্যক্তির সমষ্টি নয়। রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট সত্তা আছে। অনেকে এই কথাও বলেন, রাষ্ট্র একটি জীবন্ত প্রাণী—জীবের ন্যায় ইহারও জন্ম-মৃত্যু, কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রের লিঙ্গ নির্ধারণের চেষ্টাও হইয়াছে। ব্লুণ্টস্লি বলিয়াছেন, রাষ্ট্র পুরুষ ও চার্চ স্ত্রী।

প্লেটোর রচনায় জৈব মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মতবাদের প্রচার করেন। ব্লুণ্টস্লি, হার্বার্ট স্পেন্সার ও কোঁত প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

সমালোচনা—রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়কে একইরূপ বলিয়া মনে করা ভুল। (১) জীবদেহের কোষগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জীবন নাই, কিন্তু রাষ্ট্রের মানুষের স্বতন্ত্র জীবন ও ইচ্ছা আছে। (২) রাষ্ট্রের বিবর্তন অনেকাংশে মানুষের বিভিন্ন কার্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু জীবদেহের বিকাশ স্বাভাবিক গতিতে হয়। (৩) জীবদেহের ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের লয় বা মৃত্যু নাই। (৪) এই মতবাদ হইতে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। (৫) ইহা বিপজ্জনক মতবাদ। ইহার সাহায্যে রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তিকে বিসর্জন দিবার চেষ্টা হইয়াছে। (৬) এই মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দেখা গিয়াছে। ব্লুণ্টস্লি এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ব্যক্তির পৃথক সত্তাকে অস্বীকার করিয়াছেন, আবার হার্বার্ট স্পেন্সার ইহার সাহায্যেই তাঁহার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং, জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্য নির্ধারণের চেষ্টা একান্তই কল্পনাপ্রসূত ও অবাস্তব।

উপসংহার—তবে এই মতবাদ জীবদেহের অংগ-প্রত্যংগের সহিত সাদৃশ্য প্রমাণের চেষ্টার দ্বারা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের যে একটা দায়িত্ব আছে, এই মতবাদ তাহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। একদিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নৈরাশ্যবাদ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এবং অপরদিকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ন্যায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপারের অসারতা প্রমাণের জন্য জৈব-মতবাদের প্রসার ঘটে।

Q. 24. Discuss the Idealistic theory of the State.

(Cal. Part I 1962)

ভূমিকা—রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও যথার্থ রূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আদর্শবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা হইতে আদর্শবাদের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত এবং ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ কল্পনা করা হয়। আদর্শবাদীরা মনে করেন, যাহা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই সত্য —যাহা বাহ্যিতঃ দেখা যায় সবসময় তাহা সত্য না হইতেও পারে।

বিবৃতি—এই মতবাদ অনুসারে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান। ইহা সর্বব্যাপক ও সর্বকল্যাণময় এবং মানুষের পক্ষে অপরিহার্য, স্বাভাবিক ও চূড়ান্ত সংগঠন। ইহা দেবত্বসমৃদ্ধ বলিয়া কোনরূপ অন্যায় করিতে পারে না। একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির চরম বিকাশ সম্ভব। রাষ্ট্রবিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র প্রকৃত ইচ্ছার (real will) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল কাজ জনগণের ইচ্ছানুসারেই সাধিত হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাই নাগরিকদের কোন কিছু বলিবার বা করিবার অধিকার নাই।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই যে নাগরিকরা নির্বিচারে রাষ্ট্রকে মানিয়া চলিবে তাহা নহে, অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান। আদর্শবাদ যুদ্ধকে সমর্থন করে। যুদ্ধের দ্বারা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে বড় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল এই মতের সূত্রগুলির সমর্থক ছিলেন। জার্মান দার্শনিক হেগেলই প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রদর্শনরূপে দাঁড় করান। হেগেল অবশ্য কাণ্টের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নীট্সে, ট্রিট্স্কে প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকগণও এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ইংলণ্ডে গ্রীণ, বোসাংকে, ব্রাড্লে প্রভৃতি ইহাকে সমর্থন করেন, তবে নাগরিকের পৃথক অস্তিত্ব ও অধিকারকে তাঁহারা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। বিশেষ করিয়া কাণ্ট ও গ্রীণ মানবিক স্বাধীনতার অন্যতম সমর্থক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

সমালোচনা—রাষ্ট্রের যথার্থ প্রকৃতি আদর্শবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। (১) বাস্তব অবস্থার দিক হইতে রাষ্ট্রের রূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা না করিয়া কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া তাহা করা হইয়াছে। ইহার ফলে এই মতবাদ অস্পষ্ট, কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব হইয়াছে। (২) প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় রূপে রাষ্ট্রকে চিন্তা করা অবাস্তব কল্পনাবিলাস মাত্র। ইহা বাস্তবে সম্ভব নয়। (৩) নৈতিক দিক হইতে নাগরিকদের শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন আদর্শরাষ্ট্রের কল্পনাও বাস্তবে দেখা যায় না। (৪) রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র নাগরিকদের কোন জীবন নাই, ইহা সত্য নয়। ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের পরিপন্থী। (৫) আদর্শবাদে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। (৬) রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের জন্ম একান্ত-আবশ্যক সংগঠন, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা সর্বশক্তিমান বা সকল সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। রাষ্ট্র মানুষের জন্য, রাষ্ট্রের জন্ম মানুষ নহে—ইহা ভুলিলে চলিবে না। রাষ্ট্র মানবকল্যাণের উপায় বা মাধ্যম (means), উপেয় (end) নহে। (৭) মানুষের সৎপ্রবৃত্তি ও আত্মচেতনা প্রভৃতির উপর এই মতবাদে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ মানুষ অনেক সময় নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাগিদে কাজ করে। (৮) এই মতবাদে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রকৃত ইচ্ছাকে এক করিয়া দেখা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলের ব্যক্তিগত ইচ্ছা একইরূপ নহে।

(৯) আন্তর্জাতিক দিক হইতে এই মতবাদ বিপজ্জনক। ইহা যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেয়। বাস্তবে দেখা গিয়াছে, হেগেল নীট্‌সে, ট্রিট্‌স্‌কে প্রভৃতির মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই জার্মানীতে নাৎসীবাদ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল।

উপসংহার—এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও আদর্শবাদের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র সংগঠনের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা ও ইহার কার্যাদির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই মতবাদ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। মানুষ যে রাষ্ট্র-বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়—রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, তাহার দায়িত্ব আছে, এই ধারণা বিস্তারে এই মতবাদের অবদান অনেকখানি। আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা ও আদর্শ নাগরিক হইবার প্রেরণাও এই মতবাদ হইতে পাওয়া যায়।

Q. 25. Discuss the Marxian concept of the State.

ভূমিকা—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল মার্কস তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Das Capital', বন্ধু এঙ্গেলের সহিত একত্রে লিখিত 'Communist Manifesto' প্রকাশ করিয়া চিন্তা ও কর্মের জগতে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস ও এঙ্গেলস্ এবং পরে লেনিন যে আলোচনা করেন, তাহাই রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা বলিয়া পরিচিত।

বিবৃতি—হেগেল রাষ্ট্রের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করিয়া ইহাকে সর্বকল্যাণময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর মার্কস রাষ্ট্রকে শোষণের যন্ত্র রূপে বর্ণনা

করিয়াছেন। সমগ্র বিষয়টি মার্কস্ অর্থনৈতিক দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে যখন মানুষ একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত তখন রাষ্ট্র ছিল না। পরে পরিবার ও সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে শ্রেণীর উদ্ভব হইলে এবং শ্রেণীশোষণ অব্যাহত রাখিবার জন্য শোষক শ্রেণী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রের পুলিশ, সৈন্য, কর্মচারী, আইন ও বিচারালয় প্রভৃতির কাজ এই শোষণকে বজায় রাখা এবং শোষিতের সংগ্রামকে দমন করা। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতার ফলে বিপ্লবের মাধ্যমে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী একদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবে এবং অন্য শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে। তখন উৎপাদন ও বণ্টনের সকল উপাদান ব্যক্তি ও শ্রেণীর পরিবর্তে সমাজের হাতে আসিবে, সুতরাং রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকিবে না। রাষ্ট্রের বিলোপ হইবে। সংক্ষেপে ইহাই হইল রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কস্‌বাদী তত্ত্ব।

মার্কস্ তাঁহার মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেন। তাহার মধ্যে প্রধান হইল :

(১) **ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** (Economic interpretation of history)—ইতিহাসের সকল ঘটনা ও ইহার গতি-পরিবর্তনকে মার্কস অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানুষ-মানুষে সম্পর্ক, বিভিন্ন প্রকার রীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ, সমাজব্যবস্থা, আইন-কানুন সব কিছু মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে। কোন কিছু বিচার করিতে গেলে মানুষ অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে তাহা বিবেচনা করে- ধর্ম, সৌন্দর্যবোধ, যৌনসম্পর্ক, জাতিবোধ সব কিছু অর্থনৈতিক প্রভাবের পরে আসে এবং সব কিছু অর্থনৈতিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আদিম সাম্যবাদের পর হইতে আজ পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন রূপান্তরের মূলে অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রিয়াশীল।

(২) **দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ** (Dialectical Materialism) — হেগেল বলিয়াছেন মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির বলেই জাগতিক সকল কিছুর পরিবর্তন হয়। কিন্তু মার্কস বলিয়াছেন, বস্তুজগতের প্রভাবেই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। এমন কি মানুষের চিন্তা পর্যন্ত বাস্তব অবস্থার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। হেগেলের ভাববাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে মার্কস বস্তুবাদী দর্শনের কথা বলিলেও, সমাজের পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে মার্কস হেগেলের পদ্ধতিকে

স্বীকার করেন। কোন একটি অবস্থার মধ্যে তাহার বিরোধের বীজ লুকায়িত থাকে। এই বিরোধ যখন প্রবল হয়, তখন সংঘাতের মধ্য হইতে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমান অবস্থাকে বলা হয় সংগতি (Thesis), বিরোধ (Anti-thesis), এবং উভয়ের সংঘাতে যাহার আবির্ভাব হয়, তাহা সমন্বয় (Synthesis)। সামন্তযুগে (সংগতি), ইহার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (অসংগতি), তাহার ফলে নূতন সমাজ ব্যবস্থা পুঁজিবাদ (সমন্বয়) দেখা দিয়াছে। সমন্বয় আবার সংগতির রূপ ধারণ করে, এবং পুনরায় সংগতি-অসংগতি-সমন্বয়ের চক্র আবর্তিত হইতে থাকে। তবে এই পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে বস্তুজগৎ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত। ইহাই মার্কসের দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ বা জড়বাদ।

(৩) **উদ্‌বৃত্ত মূল্যের মতবাদ** (Theory of Surplus Value)—মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে পুঁজি রহিয়াছে, এবং অধিকাংশ লোক সহায়-সম্বলহীন। দরিদ্র সর্বহারা পুঁজিবাদীর অধীনে কাজ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহার শ্রমের বিনিময়ে যে পণ্য উৎপাদন হয় তাহার পূর্ণ মূল্য শ্রমিক পায় না। বাজারে যে দামে পণ্য বিক্রয় হয়, শ্রমিককে তাহার অপেক্ষা কম মজুরী দেওয়া হয়। উদ্‌বৃত্ত অর্থ মালিক আত্মসাৎ করে। এইভাবে মালিক ক্রমেই ধনী হইতেছে, এবং অপরদিকে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হইতেছে। ইহাই উদ্‌বৃত্ত মূল্যের মতবাদ।

(৪) **শ্রেণীসংগ্রাম** (Class Struggle)—আদিম সাম্যবাদের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস হইল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। সম্পত্তি এবং উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিবার ফলে এক দল শোষণ করে এবং অপর দল শোষিত হয়—ইতিহাসে সকল অবস্থাতেই এইরূপ দেখা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা শোষিত হয় তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য অন্যায় বন্ধ করিবার জন্য তাহারা সংগ্রাম করে। অব্যাহতগতিতে চলে এই শ্রেণী সংগ্রাম।

(৫) **সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব** (Dictatorship of the Proletariat)—শ্রমিক শ্রেণী সমাজের অন্যান্য শোষিত অংশের সহযোগে সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থা দখল করিবে। সাময়িক ভাবে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হইবে। এই একনায়কত্বে ব্যক্তি ও শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাইয়া

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে—উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সমাজের সামগ্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হইলে একনায়কত্বের অবসান ঘটিবে, তখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বিলোপ হইবে—শোষণহীন, শ্রেণী-হীন, রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসরণ করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে: (১) রাষ্ট্র চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। আদিম সাম্যবাদে রাষ্ট্র ছিল না, ভবিষ্যতেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলে রাষ্ট্র থাকিবে না। (২) রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে শোষক শ্রেণীর শোষণের স্বার্থে। (৩) রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র ও একটি যন্ত্রণাদায়ক প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা জোর করিয়া নিজের কর্তৃত্বকে বজায় রাখিয়াছে। (৪) রাষ্ট্রের আইন-কানুন, বিচারালয়, নাগরিক-রাষ্ট্র সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক সব কিছুই অর্থনৈতিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। (৫) ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিলেও বিপ্লব-পরবর্তী 'সর্বহারার একনায়কত্বের' আমলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাইবে।

সমালোচনা—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা হইয়াছে: (১) অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর মার্কস যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা ভুল। কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়—ধর্ম, মানসিকতা প্রভৃতির প্রভাবও রাষ্ট্রনৈতিক কার্যের ক্ষেত্রে কম নয়। (২) রাষ্ট্র প্রাচীনকালে ছিল না, ইহা ইতিহাসের ঘটনা হইতে প্রমাণ হয় না। (৩) রাষ্ট্র কেবলমাত্র শ্রেণীশোষণ রক্ষা করে, ইহা ঠিক নহে। রাষ্ট্রের কার্যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্র কাজ করিতেছে। (৪) মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস এবং সর্বদাই শ্রেণীসংঘর্ষ চলিতেছে, ইহাও ঠিক নয়—বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা এবং একত্র রাষ্ট্র পরিচালনা অনেক স্থানেই দেখা যায়। (৫) রাষ্ট্রের বিলোপসাধনের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। বরং সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্র ক্রমেই অধিক শক্তিশালী ও সর্বব্যাপক হইতেছে।

উপসংহার—রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা কিন্তু মার্কসের মূল বক্তব্য অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনীতির প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। অন্যান্য বিষয় থাকিলেও, রাষ্ট্রের সকল কার্যের মূলে যে অর্থনৈতিক স্বার্থ রহিয়াছে, এবং ইহাকে যে অগ্রাহ্য করা যায় না—মার্কসবাদের এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

জাতি ও জাতীয়তা

NATION AND NATIONALITY

Q. 26. Define Nation. Is India a nation ? (Cal. 1937, '46)

ভূমিকা—এক জনসমষ্টি যখন অন্য জনসমষ্টি হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া মনে করে এবং ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে একত্রিত বোধ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়, তখন তাহাকে জাতি বলে।

বিবৃতি—রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার একটি নির্দিষ্ট স্তরে জাতির বিকাশ ঘটে। একদল মানুষ একই ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া নিজেদের এক বলিয়া ভাবিতে শুরু করিলে তাহা জনসমষ্টি বা **জনসমাজ** (People) হয়। এই জনসমাজের মধ্যে বংশ, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্য থাকিলে এই ঐক্যবোধের চেতনা হইতে **জাতীয়তার** (Nationality) সৃষ্টি হয়। আর এই জাতীয়তাব চেতনা যখন সম্পূর্ণ হয় এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা গঠনেব প্রয়াস পায়, তখন তাহা **জাতিতে** (Nation) পরিণত হয।

জাতিগঠনের উপাদান হিসাবে বংশ, ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রভৃতি ঐক্যের উল্লেখ করা হইযাছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা কবিলে দেখা যায় কোন জাতির মধ্যেই এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ ঘটে নাই। বিভিন্ন বংশের মানুষ এমনভাবে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের পৃথকীকরণ প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এক জাতির অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্মের লোক লইযা এক জাতি গঠিত। বহুক্ষেত্রে একাধিক ভাষার মানুষ লইয়া এক জাতি গঠিত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে তিন ভাষা ও কানাডায় দুই ভাষা এক জাতি গঠনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। এইরূপে আচার-ব্যবহারের সমতাও সর্বত্র এক জাতিভুক্ত লোকের মধ্যে দেখা যায় না। বস্তানরূপ ভৌগোলিক সান্নিধ্য ছাড়াই, অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকা সত্বেও, ইহুদীরা এক জাতি গঠন করিতে পারিয়াছে।

সুতরাং, জাতিগঠনের জন্য এই সবগুলি উপাদানের একত্র সমাবেশ অবশ্য-প্রয়োজনীয়, ইহা বলা চলে না। এইগুলি জাতিবিকাশে প্রভূতরূপে সহায়তা করে সত্য, কিন্তু কোনটিই একান্ত অপরিহার্য নয়। যদি একদল মানুষ একই ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিন বসবাস করে, একইরূপভাবে কোন আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে, একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে পৌছিবার চেষ্টা করে, এবং সর্বোপরি নিজেদের এক জাতি বলিয়া মনে করে, তবেই তাহারা জাতিতে পরিণত হয়।

ভারত কি একটি জাতি? এই প্রশ্নে অতীতে বিদেশী লেখকরা বিশেষ করিয়া ইংরাজেরা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, ভারতবাসীর (বিশেষত অবিভক্ত ভারতের অধিবাসীর) মধ্যে বংশ, ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কোন ঐক্য নাই, সুতরাং ভারতবাসী এক জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এই যুক্তিতেই অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের পৃথক জাতি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল, এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টি করা হইয়াছিল। প্রায় একই যুক্তিতে বর্তমানে বলিবার চেষ্টা হইতেছে, বংশগত পার্থক্যের জন্য দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গণ ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে—তাহারা পৃথক জাতি।

ভারত এক জাতি নয়, এবং হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি, কিংবা দ্রাবিড়রা ভারতীয় জাতি হইতে পৃথক—এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। (১) **বংশগত** বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি জাতি-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। একাধিক **ধর্মের** লোক থাকা সত্ত্বেও চীন, বার্মা প্রভৃতি জাতি। **ভাষার** দিক হইতে ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি বহুভাষী হওয়া সত্ত্বেও জাতিরূপে স্বীকৃত। **আচার-ব্যবহারে** প্রায় সব দেশেই বিভিন্নতা রহিয়াছে। ভারতের অধিবাসীরা আর্য, দ্রাবিড়, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বংশোদ্ভূত; হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী; কিংবা হিন্দী, উর্দু, বাংলা, গুজরাতী, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষী—এই যুক্তিতে ভারতের জাতিসত্তা অস্বীকার করিলে পৃথিবীর প্রায় কোন দেশই জাতিনামের অধিকারী হইতে পারে না। মোট কথা, এইসব বিভিন্নতা জাতিবিকাশের অন্তরায় নয়। (২) এক লক্ষ্যের ঐতিহ্য এবং একই রূপ সংগ্রামে অংশগ্রহণ জাতিগঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। ভারতীয়রা দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়াছে, দীর্ঘদিন ইংরাজ শাসনের অধীনে

থাকিয়া বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য একসংগে সংগ্রাম করিয়াছে। (৩) এক লক্ষ্য হিসাবে সকল ভারতীয়ই স্বাধীনতা দাবী করিয়াছে। (৪) অধিকাংশ দেশবাসী নিজেদের এক জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছে এবং সেইরূপ ঘোষণা করিয়াছে। জনসাধারণের সকল অংশের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত গণপরিষদ ভারতের যে সংবিধান রচনা করিয়াছে তাহাতেও ভারতীয় জনগণের ঐক্য ঘোষণা করা হইয়াছে। (৫) কিছু সংখ্যক মুসলমান যে নিজেদের পৃথক জাতি বলিয়া দাবী করিয়াছে তাহা প্রধানতঃ বিদেশী শাসকের বিভেদনীতি ও চক্রান্তের ফল। হিন্দু-মুসলমান দ্বি-জাতি তত্ত্বের যুক্তি মানিয়া লইলে বলিতে হয়, বর্তমান ভারতের সকল মুসলমান পাকিস্তানী এবং পাকিস্তানের সকল হিন্দু ভারতীয়। ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতবাসী নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক জাতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে ভাষা, ধর্ম প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বিভেদ দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু ইহা কৃত্রিম ও বাহ্য। ঐক্যের শক্তি যে সর্বব্যাপক ও যথেষ্ট প্রবল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর সকল ভারতীয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে ভারতবাসী সকল বিভেদ ভুলিয়া সংঘবদ্ধভাবে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় আগাইয়া আসিয়াছে। ভারতবাসীর এক-জাতীয়তা প্রমাণের জন্য ইহার অপেক্ষা বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

Q. 27. Distinguish between State and Nation. (Cal. 1925)

ভূমিকা—রাষ্ট্র ও জাতি কথা দুইটি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" আসলে রাষ্ট্রপুঞ্জ। আবার গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্র বলিতে বৃটিশ জাতি বলা হয়। কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

বিবৃতি—রাষ্ট্র বলিতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন-ব্যবস্থাধীন স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমাজকে বুঝায়। আর **জাতি** অর্থে বংশ, ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিলনহেতু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ এক জনসমাজকে বুঝা যায়।

(১) রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই-ই। কিন্তু এক জাতি বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়াইয়া থাকিতে পারে। জার্মান জাতি পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া আছে। (২) রাষ্ট্রের

পক্ষে সার্বভৌমিকতা অপরিহার্য, কিন্তু জাতির এই ক্ষমতা নাও থাকিতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও জাপান সার্বভৌমিকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া জাতি নামের অযোগ্য হয় নাই। অবশ্য সার্বভৌমিকতা না থাকিলেও জাতি ইহা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। সার্বভৌমিকতা অর্জনের দ্বারা ইহা পুনরায় রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়। (৩) শাসনব্যবস্থা না থাকিলেও জাতির কল্পনা করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে শাসনব্যবস্থা না হইলে চলে না। সার্বভৌমিকতার ন্যায় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যও জাতি চেষ্টা করে। (৪) রাষ্ট্র একটি স্পষ্ট ও বাস্তব রাজনৈতিক ধারণা, কিন্তু জাতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ভাবগত কল্পনা। (৫) ধারণার দিক হইতে জাতিগত-কল্পনা রাষ্ট্র হইতে ব্যাপক।

Q. 28. What are the factors that tend to create a Nationality ?

Or, Discuss the factors that create a sense of unity in a state.

Or, Define Nationality. What are the basic elements of Nationality ? Is every one of them absolutely essential ?
(Cal. 1954, '55)

Or, What are the essential factors that tend to constitue a group of people into a nationality ? (Cal. 1957)

Or. How does a nation come into being in a country of diverse nationalities ? (Cal. 1959)

ভূমিকা—এক দল মানুষ বিভিন্ন কারণে নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাকে জাতীয়তা বলা হয়। কোন কোন উপাদানের সাহায্যে মানুষের মধ্যে এই ঐক্য ও চেতনার সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বিবৃতি—জাতীয়তাগঠনের উপাদানগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—বাহ্যিক ও ভাবগত। উদ্ভবগত ঐক্য, ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি, ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রভৃতি বাহ্যিক দিক হইতে জাতীয়তা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই সবই মানুষের মনে ঐক্যস্থাপনের সহায়ক। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয়তার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার কোনটিই একেবারে অপরিহার্য নয়, এইগুলির অভাবেও জাতীয়তা গঠিত হইয়াছে।

ভাবগত উপাদান রূপে একই প্রকার অভাব অভিযোগের ধারণা ও অভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক আকাংখার উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহ্যিক কারণ অপেক্ষা এইগুলির প্রভাবই জাতীয়তাগঠনে অধিকতর কার্যকরী।

পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে ঐক্যভাব জাগ্রত করিবার মূলে একই বংশ হইতে উদ্ভূত হইবার **উদ্ভবগত ঐক্যের** ধারণা যথেষ্ট সাহায্য করে। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্রে দেখা যায়, বহু বংশের মানুষ সেখানে এক জাতীয়তায় মিলিত হইয়াছে। আবার ইংরাজ, জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি প্রায় এক বংশ হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহারা পৃথক জাতি।

একই **ভাষায়** সকলে কথা বলিলে একত্র কাজ করা ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধা হয় এবং এক ভাষাভাষীর লোকেরা এক জাতীয়তা গঠনে প্রয়াসী হয়। কিন্তু ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেরা অনেকগুলি ভাষাতে কথা বলা সত্ত্বেও জাতীয়তা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয় নাই। অপর দিকে ইংরাজ ও মার্কিন একই ইংরাজি ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা এক জাতি-ভুক্ত?

ধর্মের মিলনও একত্র কাজ করিবার মূলে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু ইহুদী জাতীয়তার (ইস্‌রায়েলের) ন্যায় এক-আধটি ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ পাশাপাশি শান্তিতে একই জাতীয়তার মধ্যে রহিয়াছে। বিপরীত দিকে প্রায় সকল ধর্মের লোকই একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়াইয়া আছে।

ভৌগোলিক সান্নিধ্যের ফলেও জাতীয়তার বিকাশ ঘটিয়াছে। পাশাপাশি অবস্থিত স্থানের অধিবাসীদের মনে সহজেই ঐক্যভাব জাগে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও রহিয়াছে। ইহুদীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাকিস্তানের দুই অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এক জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত। আর অবিভক্ত ভারতে যখন মুসলমানেরা পৃথক জাতি-তত্ত্বের দাবী তুলিয়াছিল, তখন তাহারা অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে একই অঞ্চলে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। ভৌগোলিক সান্নিধ্য তাহাদের ভিন্ন হইবার দাবী তুলিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই।

সুতরাং, এই সব উপাদান আলোচনা করিলে দেখা যায় এইগুলি সবই জাতীয়তা গঠনে সাহায্য করে। তবে ইহার কোনটিই সম্পূর্ণ অপরিহার্য

নয়। ইহার যে কোন একটি বা একাধিক উপাদানের অভাবেও জাতীয়তা গঠিত হইয়াছে, এবং ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অপর দিকে এই সব উপাদান থাকিলেই যে জাতীয়তা গঠিত হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই? তবে কোন উপাদানই কি জাতীয়তা সৃষ্টিতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। ইহার উত্তরে বলিতে হয়, ভাবগত উপাদান জাতীয়তা গঠনে অবশ্যই প্রয়োজন।

রেনাঁ (Renan) যথার্থই বলিয়াছেন, জাতীয়তার ঐক্যবোধ মূলত ভাবগত ('this sentiment is essentially spiritual in character')। যাহারা একত্র জাতীয়তা গঠন করিবে তাহাদের নিজেদের এক বলিয়া ভাবা চাই। অত্যন্ত তীব্রভাবে কোন এক দল মানুষ নিজেদের এক বলিয়া মনে করিলে এবং অনুরূপ অন্যান্য জাতীয়তা হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া মনে করিলে তবেই জাতীয়তার উদ্ভব হয়। জাতীয়তার জন্য চাই নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রবল অনুভূতি।

দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিদেশী শক্তির শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিলে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিলে, পাশাপাশি একইভাবে ত্যাগ স্বীকার করিলে, একই রূপ অভাব অভিযোগের মধ্যে জীবন যাপন করিলে এবং একই কর্মপন্থা লইয়া ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিলে এই ঐক্যভাবের সৃষ্টি হয় ও ইহা হইতে জাতীয়তার জন্ম হয়।

যে দেশে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতির লোক একত্র বাস করে সেখানে এইভাবে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে।

Q. 29. Distinguish between Nationality and Nation

(Cal. 1954)

ভূমিকা—জাতীয়তা ও জাতি এই কথা দুইটিও প্রায়ই সমার্থবোধকভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

বিবৃতি—বিভিন্ন ঐক্যের বন্ধনে একত্রিত জনসমষ্টির মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সঞ্চার হইলে জাতীয়তার উদ্ভব হয়। আর রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মধ্যে জাতীয়তা সংগঠিত হইলে অথবা এইরূপ সংগঠনের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হইলে তাহা হয় জাতি।

ব্রাইস জাতীয়তা ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নিধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ভাষা ও সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির

বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টি যখন অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ অপর জনসমষ্টি হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া মনে করে তখন তাহাকে বলে জাতীয়তা। আর জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়তা যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত অথবা এইরূপ মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।" সুতরাং জাতীয়তার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের যোগ হইলে তবে জাতির সৃষ্টি হয়।

Q. 30. Do you advocate the principle of "One nation, one State." ? Are you in favour of Nation States ?

(Cal. 1952, '63)

ভূমিকা—"এক জাতি, এক রাষ্ট্র" মতবাদের মূল কথা হইল, জাতীয়তার সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারণ করা উচিত। একটি জাতি ইচ্ছা করিলে নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।

বিবৃতি—জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। তাঁহার মতে, "যে-রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয়তা বাস করে সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।" বিভিন্ন জাতীয়তার অধিবাসী থাকিলে সর্বসম্মত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না, আর এইরূপ জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র অসম্ভব। সুতরাং, "জাতীয়তার সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া উচিত।" মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় ঐক্য প্রবল হয় তখন সেই জাতির লোকেদের পৃথক শাসনব্যবস্থার দাবী মানিয়া লওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (multi-national state) স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না —একমাত্র এক-জাতি রাষ্ট্রে (mono-national state) স্বাধীনতা সম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। বর্তমান শতাব্দীতেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই নীতির ভিত্তিতেই ইউরোপের রাষ্ট্র-পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলেন, "জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানিয়া লইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের আশংকা দূর হইবে।"

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদের পক্ষে নিম্নরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়: (১) ইহা গণতন্ত্রসম্মত। একজন ব্যক্তির যেমন নিজের মত চলিবার অধিকার আছে, সেইরূপ একটি জাতির নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার আছে। (২) একটি জাতির জন্য একটি রাষ্ট্র হইলে, সে-জাতি তাহার বিকাশের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিবে। অপরে

তাহা নাও করিতে পারে। (৩) বিভিন্ন জাতি একত্র থাকিলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিবে—ইহাতে শান্তি ও জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। (৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নে বিবাদ বাধিবার আশংকা দূর হইবে। (৫) ইহা ন্যায়ের দিক হইতে প্রয়োজন। কোন নারী যদি কোন পুরুষকে ঘৃণা করে তবু যদি তাহাকে জোর করিয়া ঐ পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, তবে তাহা যেমন অন্যায় সেইরূপ কোন জাতি অপর জাতির সহিত একত্র থাকিতে না চাহিলে তাহাকে থাকিতে বাধ্য করা তেমনই অন্যায়।

সমালোচনা—বর্তমানে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আর এই মতবাদ সমর্থন করেন না। (১) মিল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ভৌগোলিক কারণে এই নীতি কার্যকরী করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন জাতির মানুষ এমনভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে মিশিয়া আছে যে তাহাদের পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপন অবাস্তব কল্পনা মাত্র। (২) লর্ড এ্যাকটনের ভাষায়, ইহা সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক মতবাদ। ইহার প্রচারের ফলে স্থায়ী রাষ্ট্রগুলিকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। (৩) বিভিন্ন জাতীয়তাসম্পন্ন রাষ্ট্রে এক সর্বসম্মত জনমত গঠন অসম্ভব, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ থাকা সত্ত্বেও এক জনমত গঠন সম্ভব হইয়াছে। (৪) বহু-জাতি-রাষ্ট্র অপেক্ষা এক-জাতি-রাষ্ট্র সুশাসিত ও সেখানে জনগণ অধিক গণতন্ত্র ভোগ করে, ইহাও সত্য নয়। এক-জাতি-রাষ্ট্র হিটলারের আমলের জার্মানী অপেক্ষা বহু-জাতি-রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড বা সোবিয়েত ইউনিয়ন অপেক্ষাকৃত সুশাসিত ও এই সব স্থানে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও বেশি। সুশাসন ও গণতন্ত্রের বিকাশ অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ইহার জন্য এক-জাতি রাষ্ট্র অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজন হইল জনগণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক এক দৃঢ় শাসনযন্ত্র এবং শক্তিশালী জনমত। (৫) পরন্তু, বহু-জাতি-রাষ্ট্রে দুর্বল জাতি সবল জাতির সহিত মিশিয়া শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতিতে উন্নত হইবার সুযোগ লাভ করে। যেমন সম্ভব হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত আজারবাইজান, উজবেকীস্থান, তুর্কমেনস্থান প্রভৃতি অংগ-রাজ্যে। সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল যাযাবর বৃত্তি সম্পন্ন। (৬) সমগ্র পৃথিবী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক-জাতি রাষ্ট্রে

বিভক্ত হইলে পরস্পরের মধ্যে সীমানার (boundaries) দৈর্ঘ্য বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলহ-বিবাদও বাড়িবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির দিক হইতেও ইহা ক্ষতিকর হইবে।

উপসংহার—সুতরাং, "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি বর্তমানে আর গ্রহণযোগ্য নয়। তবে জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ যদি নিজেদের অন্যান্যদের হইতে পৃথক বলিয়া চিন্তা করে এবং অসন্তোষের সহিত বাস করিতে থাকে তবে সেইক্ষেত্রে তাহাদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করাই উচিত।

Q. 31. Fully discuss the principle of self-determination.

Or, Discuss the value and limitation of the doctrine of self-determination as a political principle.

(Cal. 1958, Hons. '55)

[**ইংগিত**—২৯ নং প্রশ্নের উত্তর অবলম্বনে ইহার উত্তর লিখিতে হইবে। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং "এক জাতি, রাষ্ট্র" মতবাদের মধ্যে কার্যত কোন প্রভেদ নাই।]

যদি কোন জনসমষ্টি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া সংগঠিত হয় এবং নিজেদের দাবী সম্পর্কে সজাগ হইয়া রাষ্ট্র গঠনের দাবী করে তবে তাহাকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে। বহু জাতি-রাষ্ট্রে এইরূপ দাবী উঠিতে পারে। ইহাকে গণতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন ইহাকে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব গঠনের মূল নীতি রূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অসন্তুষ্ট জাতীয়তার স্বায়ত্তশাসনের বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তবে ইহার একটা সীমারেখা টানা উচিত। ১৯২০ সালে ফিনল্যাণ্ড হইতে আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ স্বতন্ত্র হইতে চাহিলে আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী এই কথাই বলিয়াছেন।

অবশ্য কোন বিদেশী জাতি কর্তৃক একটি জাতি শাসিত হইলে, সেই পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের অধিকার সর্বসময়েই স্বীকার্য। আফ্রিকার এঙ্গোলায় সেখানকার জনসাধারণ পর্তুগীজ শাসন হইতে মুক্তি ও নিজেদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতেছে। ইহা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি না মানিলে কোন অংশের মূল রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার আছে কিনা, এই মূল প্রশ্নে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত হইয়াছে। অনেকের মতে কেবলমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন বা কোন এক বিশেষ স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠী বিদ্রোহী হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করিলেই তাহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বর্তমান বহু রাষ্ট্রকেই ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। আর নিয়ন্ত্রণের দাবীর পিছনে জনগণের কতখানি সমর্থন রহিয়াছে এবং তাহা এক বিশেষ জাতি এবং ভাবধারার পরিচায়ক কিনা তাহাও বিচার্য।

Q. 32. Discuss the merits and demerits of Nationalism.

Or, "Nationalism is a menace to civilisation." Do you agree with this statement ?

Or, Discuss the value and limitation of Nationalism as a political ideal. (Cal. 1949, '53, Hons. '54)

ভূমিকা—রাজনীতির ইতিহাসে জাতীয়তাবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী জাতীয় জীবন সংগঠনের জন্য জনসমষ্টির যে চেষ্টা, তাহাই জাতীয়তাবাদ। মানুষের একত্র বসবাসের প্রবৃত্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী ইহার ভিত্তি।

বিবৃতি—মূলতঃ জাতীয়তাবাদ এক মহান আদর্শ। (১) ইহা বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন কিংবা ইতালীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উক্ত দেশসমূহের দীর্ঘদিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফল। (২) জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের মনে আনুগত্যের সৃষ্টি করে। এক জাতির সকলের সমষ্টিগত জীবনের শিক্ষার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। (৩) জাতিভুক্ত সকলের স্বার্থ এক, এই ধারণার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দুঃস্থদের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান ইহার দ্বারা সম্ভব হয়। (৪) জাত্যাভিমান অনেক সময় মানুষের মনে উন্নতির প্রেরণা যোগায়। (৫) ব্যক্তির বিকাশের জন্য যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়, তবে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিই বা কেন গ্রাহ্য হইবে না ?

সমালোচনা—কিন্তু বিগত অর্ধশতাব্দীর পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করিয়া

ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং বর্তমানে ইহা মানব সভ্যতার সম্মুখে এক মহাসংকট রূপে উপস্থিত হইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রদার্শনিক, বিশেষ করিয়া ল্যাস্কির মতে ধনতন্ত্রের বিকাশের স্তর রূপে সাম্রাজ্যবাদ জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সংগ্রহের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের সৃষ্টির মূলেও ইহাই।

জাতীয়তাবাদ মানুষের মনে নিজের জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও অন্য জাতিকে হীন ভাবিতে শিক্ষা দেয়, এবং ইহার ফলে ঘৃণা ও পরজাতি ধ্বংসের চেষ্টা শুরু হয়। মানুষের মনে এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় তাহার মানসিক অধঃপতন ঘটে। যে জাতি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী বলিয়া মনে করে সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিকে পদানত করিয়া সে-দেশে তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টা করে এবং সেখানকার সম্পদ লুণ্ঠন করে। এই ভাবেই বৃটিশ, জার্মান, জাপানী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে তীব্র ভাষায় ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। বর্তমানেও বিভিন্ন জাতি নিজেদের মত করিয়া সমগ্র পৃথিবী গঠনের কল্পনা করিতেছে এবং অন্যের উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য আণবিক বোমা, রকেট, শূন্যমার্গযান প্রভৃতি বাড়াইয়া চলিতেছে। ইহাতে একদিকে যেমন যুদ্ধের আশংকা বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি দেশের পুনর্গঠন কার্যের সম্পদ নষ্ট হইতেছে।

জাতীয়তাবাদ মানব সভ্যতার নিকট একটি ভয়াবহ রূপ লইয়া দেখা দেয় কিনা ইহা আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা যদি বিগত শতাব্দীর এবং বর্তমান শতাব্দীর অর্ধকালের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখিতে পাই বিভিন্ন জাত্যাভিমানী পাশ্চাত্য শক্তি এই জাতীয়তাবাদের মোহে উদ্বুদ্ধ হইয়া দুর্বল জাতিসমূহের উপর শোষণ চালাইয়াছে। শোষিত জাতির কাছে স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পাশব শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদের অংকুর হইল ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। বর্তমান শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল এই অন্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তির পাশব বলে। মদোন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী জাতীয় শক্তিসমূহ অপর জাতিকে পদানত করিয়া, শোষণ করিয়া, নিঃশেষ করিয়া লয়।

উপসংহার—জাতীয়তাবাদের এই ভয়াবহ রূপকে সংযত করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও জাতি-মৈত্রীই মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র পথ।

জাতীয়তাবাদের জনক ম্যাট্‌সিনি জাতীয়তাবাদের কল্পনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কোন না কোন বিষয়ে প্রতিভা রহিয়াছে। এই প্রতিভার বিকাশই জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য। তাঁহার নিকট মানব সমাজ একটি "স্বাজাত্যাভিমানী বিভিন্ন জাতির সমবায়।" এই আদর্শের সহিত আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ নাই।

অতএব জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত ধারণার মধ্যে আশীর্বাদ বা অভিশাপ কোনটিরই প্রাধান্য নাই। ইহার প্রদত্ত রূপের উপর নির্ভর করে ইহার পরিণতি। মূল্যনিরপেক্ষ এই তত্ত্বটির ফলাফলের জন্য দায়ী। ইহাকে যাহারা ব্যবহার করে সেই জনসমাজ ও তাহার রাজনৈতিক আদর্শ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইহাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহার সুফললাভ করিবার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের মানবিক আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে।

Q. 33. Discuss the problem of Natioalism vs. Internationalism. (Cal. 1962)

জাতীয়তাবাদ একটি মহান আদর্শ। ইহা মানুষের মনে ঐক্যের ভাব জাগায়, প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে শিখায় এবং দেশকে ভালবাসিয়া দেশের জন্য আত্মত্যাগে প্রেরণা দেয়।

জাতীয়তার মনোভাবের সহিত দেশপ্রেম মিলিত হইয়া যখন একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সৃষ্টি হয়, তখন তাহাকে আমরা জাতীয়তাবাদ বলি। খণ্ড, ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে এই আদর্শ ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। ইউরোপের ইতিহাসে জার্মানী ও ইতালীর ঐক্য এই জাতীয়তাবাদের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। পরাধীন জাতি বিদেশীর অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবার প্রেরণা লাভ করিয়াছে এই আদর্শ হইতে। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আজ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। জাতিচেতনা জাগ্রত হইবার ফলে মানুষের মনে নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার উন্নতির জন্য সকলে চেষ্টা করে। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট-আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, এবং অন্যের উপকারের জন্য মানুষ চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদ

দেশপ্রেম জাগায় বলিয়া মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ ও জাতির স্বার্থকে স্থান দেয়, এবং নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও দেশের জন্য কাজ করে। যুদ্ধের সময় এই আদর্শের জন্যই লোকে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়া দেশরক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। অনুন্নত দেশ হইতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য মানুষ যে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে তাহার মূলেও জাতীয়তাবাদ রহিয়াছে —নিজের দেশ ও দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, এই মনোভাব কাজ করে।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের আদর্শ অত্যন্ত মহান এবং জাতির উন্নতিতে ইহার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেও দেখা গিয়াছে, এই আদর্শ বারে বারে বিকৃত হইয়াছে এবং ইহা মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা হইতে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন মনীষী জাতীয়তাবাদকে সভ্যতার পথে একটি অভিশাপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল, ট্রিট্স্কে প্রভৃতি জাতি-প্রীতিকে তীব্র করিয়া অন্য জাতিকে গ্রাস করিবার দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহার প্রভাবে নাৎসীবাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নিজের জাতির সব ভাল এবং অন্যের সব খারাপ, সুতরাং অন্যকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে, এইরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে। অশিক্ষিত ও অনুন্নত দেশকে 'উন্নত' করিবার নামে ইউরোপের উন্নত দেশগুলি, যেমন, ইংল্যাণ্ড, ফ্র্যান্স, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে এবং লুণ্ঠন ও শোষণের রাজত্ব চালাইয়াছে। বিকৃত জাতীয়তাবাদের ফলে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং মিথ্যাচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষকে হেয় করিবার জন্য সর্বত্র জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিজের জাতি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসিয়া সকলেই যদি তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তবে জাতি-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিবে—ইহাই জাতীয়তাবাদের মূল কথা। কিন্তু আজ যেভাবে জাতীয়তাবাদ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ও মানুষে মানুষে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে এই আদর্শ কার্যকরী করা অসম্ভব। শক্তিশালী জাতি যদি গায়ের জোরে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিকে দখল করিয়া নিজের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তাহার উপর চাপাইয়া

দেয়, তবে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির জাতি-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইবে। যুদ্ধের ফলে সমগ্র বিশ্বই যদি ধ্বংস হইয়া যায় তবে কোন্ জাতি বাঁচিবে? পারমাণবিক বোমার যুগে যুদ্ধ আজ সামগ্রিক, এবং মুহূর্তের একটি ভুলের ফলে সমগ্র বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হইতে পারে।

সুতরাং যদি আজ জাতীয়তাবাদকে বাঁচাইতে হয় তবে আমাদের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধের পথ পরিহার করিতে হইবে। বিশ্বের সকল জাতি পাশাপাশি শান্তিতে মৈত্রীসম্পর্কে বাস করিবে। কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দিলে বল-প্রয়োগের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তির চেষ্টা না করিয়া নিজেদের মধ্যে আপোষের দ্বারা তাহারা মীমাংসা করিবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপর বন্ধু রাষ্ট্র অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সালিশীর সাহায্য গ্রহণ করিবে। এক জাতির বিপদে অপর জাতি দাঁড়াইবে, একের অবস্থার উন্নতির জন্য অপরে সাহায্য করিবে। ইহাই আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)। কোন রাষ্ট্রই আজ অন্যকে বাদ দিয়া একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে পারে না—অপরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতেই হইবে, এবং এই সম্পর্ক হইবে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করিলে তবেই যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া বিশ্বের অস্তিত্ব তথা নানা সভ্যতাকে রক্ষা করা যাইবে। যে বিকৃত জাতীয়তাবাদ যুদ্ধ সৃষ্টি করে, তাহাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। অপর দিকে আদর্শ জাতীয়তাবাদকে বাঁচাইতে হইলে তাহা আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমেই সম্ভব। সকলেই স্বাধীন ভাবে বাস করিবে, এবং নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে—ইহা একমাত্র আন্তর্জাতিকতার আদর্শেই সম্ভব।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আন্তর্জাতিকতার নাম করিয়া সকল জাতিকে এক সংস্কৃতির অধীন করার চেষ্টা বিকৃত জাতীয়তাবাদেরই আর এক রূপ। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধনের মধ্যেই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

সার্বভৌমিকতা

SOVEREIGNTY

Q. 34. What do you understand by Sovereignty ?
(Cal. 1942, '47, '54, '56, '60, '62)

ভূমিকা—গেটেল বলিয়াছেন, "সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভিত্তি।" সাবভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান, এবং এই ক্ষমতার অধিকারই রাষ্ট্রকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়াছে।

বিবৃতি—বার্জেসের ভাষায়, "সার্বভৌমিকতা সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর মৌলিক, চূড়ান্ত ও সীমাহীন ক্ষমতা।' ল্যাটিন শব্দ "Superannus" বা "সর্বশ্রেষ্ঠ" হইতে ইহার উদ্ভব। সার্বভৌমিকতার অর্থ রাষ্ট্রের চূডান্ত ক্ষমতা।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেব উপর চরম ক্ষমতা প্রযোগ করে, আইন প্রণয়নও ইহা বলবৎ করে। রাষ্ট্রের আইন চূড়ান্ত ও সর্বব্যাপক। রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিতে ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে সকল নাগরিক বাধ্য। আবার, এই শক্তির বলেই রাষ্ট্র সর্বপ্রকার বৈদেশিক শক্তির প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখে। অন্য কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে সার্বভৌমিকতা নষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রসত্তার বিলোপ ঘটে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকলের উপর সীমাহীন ক্ষমতা প্রযোগ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি হইল সার্বভৌমিকতা।

বহুত্ববাদী সমালোচনা—জন অষ্টিন রাষ্ট্রেব সার্বভৌমিকতাব এই সীমাহীন রূপের প্রধানতম সমর্থক। কিন্তু বহুত্ববাদী (Pluralists) নামে একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের এই সর্বব্যাপক চূড়ান্ত ক্ষমতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রযোগেব অধিকার নাই। ধর্মপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংঘ, বিদ্যায়তন প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সৃষ্ট হইযাছে এবং ইহাদের স্বাধীন

অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য আছে। ইহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। যেমন, বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম, শ্রমিক-স্বার্থ, শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতি প্রয়োজনে ধর্মপ্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে কাজ করিবে। এই মত অনুসারে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতা নাই। রাষ্ট্রের অসীম অধিকার মানিয়া লইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দিবে—সবল রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক হইতেও রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমিকতাকে মানিয়া লওয়া চলে না।

উপসংহার—বহুত্ববাদীদের এই যুক্তির মধ্যে অনেকখানি সত্যতা থাকিলেও, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে? এই সব দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী এক শক্তির অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক। এই শক্তিই রাষ্ট্র। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমত স্বাধীনতা ভোগ করিবে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশ তাহাদের মানিতে হইবে। তাহা না হইলে অরাজকতা দেখা দিবে। আইনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা প্রকাশ পায়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ইহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে। অন্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের দিক হইতেও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা মানিয়া লইতে হইবে। সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব স্বীকার না করিলেই বরং দুর্বল রাষ্ট্র শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরাধীন হইয়া পড়িবে।

সুতরাং রাষ্ট্রের অবশ্য-প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে সার্বভৌমিকতাকে মানিয়া না লইয়া উপায় নাই।

Q. 35. What are the characteristics of Sovereignty?

(Cal. 1948, '52, '62)

সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়—

(১) **চরম ক্ষমতা**—(Absoluteness)—সার্বভৌমিকতার অর্থ চরম ক্ষমতা। ইহা কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ইহার ঊর্ধ্বে আর কোন

ক্ষমতা থাকিতে পারে না। আইন প্রণয়ন ও আইন রদ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা ইহার আছে।

সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে, আইনের দিক হইতে ইহার সীমাহীন ক্ষমতা থাকিলেও ঈশ্বরের বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ। উপরন্তু সমাজে অনেক বিষয় আছে যাহা আইনের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। আবার, সাংবিধানিক আইনের দ্বারাও সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই সব সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, প্রথমত, সার্বভৌমিকতা আইনগত ধারণা—নৈতিক সূত্রের সীমাবদ্ধতার সহিত ইহার কোন যোগ নাই; দ্বিতীয়ত, যাহা আইনের এলাকায় পড়ে তাহার সম্পর্কেই সার্বভৌমিকতা প্রযোজ্য, আইনবহির্ভূত বিষয়ে নহে; আর সর্বশেষে, সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সরকারের শক্তিকে সীমিত করা চলে, রাষ্ট্র-বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতাকে নহে। সুতরাং রাষ্ট্র চরম ক্ষমতার অধিকারী।

(২) **সার্বজনীনতা** (All comprehensiveness)—রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর সার্বভৌম শক্তির চরম কর্তৃত্ব রহিয়াছে। অবশ্য, এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে এই শক্তি কেবলমাত্র আইনানুমোদিতভাবেই ব্যবহার করা যায়।

(৩) **স্থায়িত্ব** (Permanence)—যতদিন রাষ্ট্র থাকিবে ততদিন এই সার্বভৌমিকতাও থাকিবে। এই শক্তির ব্যবহারকারী সরকারের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটে না, এবং সার্বভৌমিকতারও বিলোপ নাই।

(৪) **অবিভাজ্যতা** (Indivisibility)—সার্বভৌমিকতা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। ইহাকে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পনা করা যায় না। সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের উপরেই থাকে।

বহুত্ববাদীরা অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, আন্তর্জাতিক আইন ও সমাজের বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সার্বভৌমিকতা আজ আর একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নয়। ইহা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এই সমালোচনা ঠিক নয়। কারণ, বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইলেও এবং এই সব প্রতিষ্ঠান প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করিলেও সকলের উপরে চরম কথা বলিবার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের আছে। অর্থাৎ সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য এবং ইহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে।

(৫) **অনন্যতা** (Exclusiveness)—রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী আর কেহ নাই। ইহা চূড়ান্ত ক্ষমতারই একটি অনুসিদ্ধান্ত।

(৬) **হস্তান্তর-অযোগ্যতা** (Inalienability)—সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। প্রাণ যেমন শরীর হইতে বাহির করা যায় না, এই সার্বভৌমিকতাও সেইরূপ হস্তান্তর করা যায় না। সার্বভৌম শক্তির নিকট হইতে এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিলে তাহা আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকে না, ক্ষমতার নূতন অধিকারী সার্বভৌম হইয়া উঠে।

Q. 36. How far can sovereignty be said to belong to the people ? **(Cal. 1954)**

Explain clearly the doctrine of popular sovereignty. Discuss its limitations. **(Cal. 1942, '44, '49)**

ভূমিকা—গণ-সার্বভৌমিকতার মত অনুসারে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল জনগণ। রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের ইচ্ছার উর্ধ্বে কথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই।

(৩) **বিবৃতি**—প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের শাসনে জনগণ এই সার্বভৌমিকতার অধিকারী ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া বিভিন্ন লেখক এই মত উত্থাপন করিয়াছেন। রুশোর 'সোস্থাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে ইহা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। তাঁহার মতে সার্বভৌমিকতার অধিকার একমাত্র 'জনগণের', 'সাধারণের ইচ্ছার' (General Will) মারফত জনগণ ইহা প্রকাশ করে। 'জনগণের অভিমতই হইল ভগবানের অভিমত' (vox populi vox dei)। এই মতবাদ গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের মূলে ইহার বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। আধুনিককালে অধ্যাপক রিচি ইহার প্রবলতম সমর্থক। তাঁহার মতে, একমাত্র জনগণেরই বল-প্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে, সুতরাং জনগণই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী।

সমালোচনা—গণ-সার্বভৌমিকতা মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে—

প্রথমত, রাষ্ট্রজীবনকে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আইন-কানুন প্রয়োজন। আইন-সভার ন্যায় সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ভিন্ন এই আইন প্রণয়ন করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। জনগণ স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিতে বা আইন প্রণয়ন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, জনগণের স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিধিসংগতভাবে তাহা আইনের স্বীকৃতি না পাইলে তাহাকে সার্বভৌম চূড়ান্ত ক্ষমতার অভিব্যক্তি বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। আইনের চক্ষে ইহা গ্রাহ্য হইবে না।

তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে নানা বিচিত্র মতের অবস্থান হেতু সকলের ইচ্ছা একটি স্পষ্ট 'সাধারণের ইচ্ছায়' প্রকাশিত হয় না।

চতুর্থত, জনগণ সর্বাধিক শারীরিক শক্তির অধিকারী, ইহাও সত্য নয়। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল সরকারী সৈনিক অনায়াসেই বিরাট নিরস্ত্র জনতাকে দমন করিতে পারে।

পঞ্চমত, প্রতিনিধি নির্বাচনের মারফত নির্বাচকমণ্ডলীরূপে জনগণ এই সার্বভৌমিকতার অধিকারী, এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ জনগণের সকলে নির্বাচক নয়, আর নির্বাচকমণ্ডলীর যে অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহাদের পরিমাণও জনগণের অতি অল্প অংশ। ইহা ছাড়া, দলগত রাজনীতির যুগে জনগণের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা বহু ক্ষেত্রে দলীয় মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উপসংহার—জনগণ প্রত্যক্ষ ভাবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী নয়, সমালোচকরা বিশেষ করিয়া আইনজীবিরা এইরূপ মত পোষণ করিলেও গণ-সার্বভৌমিকতার মতবাদকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে চূড়ান্ত। সুসংবদ্ধ জনমতকে কোন রাষ্ট্রই উপেক্ষা করিতে পারে না। নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন জনগণ জনমত সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং এইভাবেই তাহারা অনেকাংশে সার্বভৌমিকতা ব্যবহার করে। অধ্যাপক ল্যাস্কি এই মতের সমর্থক।

Q. 37. Clearly bring out the distinction between Legal and Political Sovereignty. (Cal. 1941,' 51, '56, '60, Burd. 1962)

How is legal Sovereignty usually distinguished from Political Sovereignty? Illustrate your answer. (Cal. 1958)

ভূমিকা—অষ্টিনের ব্যাখ্যা অনুসারে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকিবেন এবং এই কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ আইন বলিয়া বিনা দ্বিধায় সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লইতে হইবে। ইহাই আইনগত সার্বভৌমিকতা। এই ক্ষমতা চূড়ান্ত। এই ক্ষমতার প্রয়োগ অযৌক্তিক ও জনমত বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও আইনজীবিগণ ও বিচারালয় কেবল ইহাকেই মানিবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত অধিকারী, তাহাকেই আইনগত সার্বভৌমিকতা বলা হয়।

বিবৃতি—কিন্তু অনেক লেখক এই আইনগত সার্বভৌমিকতার উপরে আর এক শক্তির কথা বলিয়াছেন, যাহার কাছে ইহাকে নতি স্বীকার করিতে হয়। এই শক্তি হইল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। জনসাধারণ বা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ইহার প্রকাশ। আইনগত সার্বভৌমিকতার ন্যায় ইহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই, কোন নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে ইহার অভিমতও ব্যক্ত হয় না। তথাপি ইহার শক্তিই আইনগত সার্বভৌমিকতাকে সর্বদা প্রভাবিত করে। কোন বিষয়ে রাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ জনগণ নিজেদের মত প্রকাশ করিলে আইনগত সার্বভৌম শক্তি সেইমত রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করে। সাধারণ ভাবে জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইনগত সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য কার্য করে। জনমতের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার অভিমত ব্যক্ত হয়। গিলক্রাইষ্টের ভাষায় বলা যায়, "আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব প্রভাব কাজ করে তাহারই যোগফল হইল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা।" রাজনৈতিক সার্বভৌমের ইচ্ছার বিরোধিতা করিলে নির্বাচনকালে, এমনকি প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী আইনগত সার্বভৌম শক্তিকে অপসারিত করিতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ গ্রহণ করিলে দেখা যায়, রাজা-সহ পার্লামেণ্ট সেখানে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত আইনই

একমাত্র স্বীকৃত ও গ্রাহ্য আইন। আর নির্বাচকমণ্ডলী (যাহাদের ভোটে কার্যত ক্ষমতার অধিকারী হাউস অফ কমন্‌স্ গঠিত হয়) রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা।

আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার আলোচনাকালে এইরূপ মনে রাখিতে হইবে, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা যতই প্রভাবশালী হউক না কেন, যতক্ষণ না তাহার কোন ইচ্ছা আইনগত সার্বভৌমিকতার দ্বারা আইনের মধ্যে বিধিবদ্ধ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সার্বভৌমিকতার দিক হইতে তাহার কোন স্বীকৃতি নাই।

উপসংহার—অনেক লেখকের মতে, সার্বভৌমিকতাকে আইনগত ও রাজনৈতিক এইভাবে পৃথক করা উচিত নয়। কারণ, সার্বভৌমিকতা এক এবং অবিভাজ্য। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। এইরূপ পৃথকীকরণের দ্বারা সার্বভৌমিকতাকে বিভক্ত করা হয় না। একই সার্বভৌমিকতার দুই রূপ আইনগত ও রাজনৈতিক, ইহাই এই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

Q. 38. Distinguish between De Jure and De Facto Sovereignty. (Cal. 1951, '60)

রাষ্ট্রের মধ্যে যে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী তাহাই সার্বভৌম শক্তি। প্রচলিত আইনের দ্বারা স্বীকৃত হইলে ইহা **আইনানুমোদিত** বা **De Jure** সার্বভৌমিকতা। আইন অনুসারে ইহা সকলের আনুগত্য-লাভের অধিকারী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতা অধিকার করিয়া জোর করিয়া সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় করে। ইহাই **বাস্তব** বা **De Facto** সার্বভৌমিকতা। উদাহরণস্বরূপ রুশ বিপ্লবের কথা বলা যাইতে পারে। আইনানুসারে জারের সরকার ছিল আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু বিপ্লবের দ্বারা লেনিন যে সরকার গঠন করিলেন পূর্বের আইন তাহা স্বীকার না করিলেও জনসাধারণ তাহার নির্দেশকেই আইন বলিয়া গ্রহণ করিল। ইহা হইল বাস্তব বা কার্যত সার্বভৌমিকতা। যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্য রাষ্ট্রের কোন কোন অংশ দখল করিয়া বসে। এই অঞ্চলে তখন রাষ্ট্রের আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। এখানে আক্রমণকারী সৈন্য ও রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বাস্তব সার্বভৌমিকতা। বর্তমানে ভারতের কোন কোন

অঞ্চলে চীনের এইরূপ কর্তৃত্ব দেখা যায়। আইনানুসারে এই সব এলাকায় চীনের কোন অধিকার নাই—নেহাৎ গায়ের জোরে তাহারা শাসন চালাইতেছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্যকে খুব বড় করিয়া দেখা উচিত নয়। কোন রাষ্ট্রে এই দুই রূপ সার্বভৌমিকতার বিবাদ বা অসংগতি দেখা দিলেও ইহা বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। বাস্তব সার্বভৌমিকতা স্থায়ী হইয়া জনগণের সম্মতি আদায় করিয়া রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমিকতায় পরিণত হয়। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর নূতন শাসন এইরূপ আইনগত সার্বভৌমিকতা পরিণত হইয়াছে। অথবা, বাস্তব সার্বভৌমিকতার হাত হইতে পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া আইনগত সার্বভৌমিকতা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডে জার্মান প্রভুত্ব স্থাপিত হইলেও যুদ্ধের অবসানে পুনরায় পোল-সরকার নিজের আধিপত্য ফিরিয়া পায়।

সুতরাং অনেক লেখকের মতে সার্বভৌমিকতাকে এইভাবে পৃথক করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ, যে প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ সকলে মানিয়া লয়, তাহাই সার্বভৌম শক্তি আর তাহার নির্দেশই আইন। এই দিক হইতে বাস্তব সার্বভৌমিকতাও আসলে আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা।

গেটেল তাই বলিয়াছেন, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য না করিয়া আইনানুমোদিত ও বাস্তব সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা উচিত।

Q. 39. State and examine the Austinian theory of Sovereignty. (Cal. 1945)

ভূমিকা—সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যাতা রূপে ইংরাজ আইনবিদ-দার্শনিক জন অষ্টিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩২ সালে তাঁহার "আইন-শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা" নামক পুস্তকে তিনি সার্বভৌমিকতার একটি সুস্পষ্ট রূপ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করেন। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী (Monistic) ও আইনানুগ (Juristic) দৃষ্টিভংগীর ইহা শ্রেষ্ঠতম বিশ্লেষণ।

বিবৃতি—অষ্টিনের মতে, যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ) অপর কোন উর্ধ্বতন শক্তির প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে, এবং সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তবে সেই সমাজে ঐ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম এবং এইরূপ

সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ। ("If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society, and that society including the superior, is a society political and independent.")

অষ্টিন আইনবিদ্ ছিলেন এবং আইনবিদের দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হব্‌স ও বেস্থামের মতবাদ দ্বারা অষ্টিন যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে আইন হইল অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতনের আদেশ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করে—ইহার আদেশই আইন।

অষ্টিন প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক গিলক্রাইষ্ট সার্বভৌমিকতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) সার্বভৌম শক্তি হইল নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ (body)। সুতরাং 'সাধারণের ইচ্ছা' বা সমগ্র জনগণ সার্বভৌমিকতা রূপে গণ্য হইতে পারে না।

(২) আইন অনুসারে সার্বভৌম শক্তির ক্ষমতা চূড়ান্ত ও অসীম। রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য কোন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের অস্তিত্ব ইহা স্বীকার করে না। সার্বভৌমিকতা কোন আইনসংগত বাধা মানে না।

(৩) সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য। ইহা একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে বিভক্ত করিলে, এক শক্তিকে কোন বিষয়ে হয়ত অপরের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, আর অন্যের আনুগত্য স্বীকার করিলে ইহা সার্বভৌম থাকিবে না।

সমালোচনা—হেনরী মেইন, সিজ্‌উইক, ল্যাস্কি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি লেখকগণ অষ্টিনের এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান সমালোচনাগুলি নিম্নরূপ—

(১) অষ্টিনের মতবাদ গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী। আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া জনসাধারণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

(২) আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে

গিয়া রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। কার্যত, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার নির্দেশই শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয়।

(৩) আইনের দিক হইতেও ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে, সার্বভৌমিকতার আদেশই একমাত্র আইন। বহু প্রথাগত আইন, রীতি-নীতি ও লোকাচার আছে যাহা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক আইনরূপে প্রণীত বা বিধিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি এইগুলি আইনরূপে গ্রাহ্য।

(৪) অষ্টিনের মতানুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম শক্তির অধিকারী কোন নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র তো আর সার্বভৌমিকতাহীন নহে।

(৫) সার্বভৌমিকতাকে মানবীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ রূপে বর্ণনা করিলে তাহা সরকাররূপে গণ্য হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে।

(৬) অষ্টিন সার্বভৌমিকতার যে চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতার কথা বলিয়াছেন, বহুত্ববাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না। বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজের অন্য অনেক সংঘ (যেমন ধর্মসংঘ, শ্রমিক সংঘ, প্রভৃতি) সমভাবে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের অধিকারী—রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার একক অধিকারী নহে। আন্তর্জাতিকতাবাদীরাও বলেন, কোন রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিবে এবং বিশ্ব ধ্বংস হইবে। রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও বিশ্বজনমত মানিয়া চলিতে হয়।

উপসংহার—অষ্টিনের মতবাদের এই প্রকার বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার মতবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনিই প্রথম অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে কল্পনার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্বভৌমিকতার একটি স্পষ্ট রূপ বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত চিত্রে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। অষ্টিনবিরোধী সমালোচকরা অনেক ক্ষেত্রেই অষ্টিনকে ভুল বুঝিয়াছেন। অধ্যাপক ডি, এন, ব্যানার্জীর মতে, অষ্টিন গণতন্ত্রবিরোধী ছিলেন না। প্রমাণ হিসাবে দেখান যায়, অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বে জনমতের উৎসকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। তবে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত আইনঘেঁষা বলিয়া ইহা সংকীর্ণ ও একপেশে হইয়াছে। তাঁহার মতবাদকে ভ্রান্ত না বলিয়া অসম্পূর্ণ বলাই যুক্তিযুক্ত।

Q. 40. Write an analytical note on the attacks upon the Monistic theory of Sovereignty. (Cal. **1962**)

[**ইংগিত**—এই প্রশ্নের উত্তরে অষ্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার মতবাদ, যাহা সার্বভৌমিকতার **একত্ববাদ** (Monism) বা সনাতন (classical) মতবাদ নামেও পরিচিত, তাহার সমালোচনা লিখিতে হইবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অষ্টিনের মতবাদের যে সমালোচনা হইয়াছে (৩৮ নং প্রঃ ও ৪০ নং প্রঃ উত্তর দেখ)—তাহার উল্লেখ এবং এই সম্পর্কে মূল্যায়ণ করিতে হইবে।]

Q. 41. Discuss the Pluralistic criticism of the classical theory of Sovereignty. **(Cal.** 1954**)**

ভূমিকা—বোঁদা, হব্‌স, বেন্থাম, অষ্টিন প্রভৃতি সার্বভৌমিকতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ সনাতন (classical), পরম্পরাগত (traditional), আইনানুগ (juristic) বা একত্ববাদী (monistic) ধারণা নামে পরিচিত। এই ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌম শক্তিরূপে রাষ্ট্র চরম ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সকল ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সংসদ ইহার নির্দেশ মানিতে বাধ্য, সার্বভৌমের আদেশই একমাত্র আইন এবং সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য।

এই চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একদল লেখক সার্বভৌমিকতার নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করিলেন। গিয়ার্কে, মেইট্‌ল্যাণ্ড, ফিগিস, ডুগুই, ক্র্যাব, ল্যাস্কি, লিণ্ড্‌সে, বার্কার, ম্যাকাইভার, কোল্‌, হব্‌সন প্রভৃতি লেখক সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে সনাতন ধারণার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন—ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় **বহুত্ববাদী** (Pluralists) নামে পরিচিত।

বিবৃতি—বহুত্ববাদীরা বলেন, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নয়। ইহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন শক্তি নয়। সমাজে রাষ্ট্র ব্যতীত পরিবার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ, শিক্ষা সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। রাষ্ট্র যেমন মানুষের একটি বিশেষ প্রয়োজন (রাষ্ট্রনৈতিক কল্যাণের প্রয়োজনে) অনুসারে উদ্ভূত হইয়াছে, সেইরূপ মানুষের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনসাধনের জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে, এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। রাষ্ট্রের ন্যায় ইহারাও সমভাবে সার্বভৌমিকতার অধিকারী। সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের

সদস্য হিসাবে তাহার প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য থাকিবেই—সুতরাং কমবেশি হইলেও আনুগত্য বিভাজ্য। বহুত্ববাদীরা অষ্টিন প্রভৃতির সার্বভৌমিকতার ধারণাকে মূল্যহীন ও বিপজ্জনক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক দিক হইতেও রাষ্ট্রের চরম ও অসীম সার্বভৌমিকতার দাবী বহুত্ববাদীরা স্বীকার করেন না। আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি বর্তমানে যেভাবে প্রবল জনমতের সমর্থনে পুষ্ট হইতেছে তাহাতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এই সব আইন ভংগ করা কিংবা সম্পূর্ণ একক স্বেচ্ছাচারীভাবে কার্য করা সম্ভব নহে।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বহুত্ববাদীদের আলোচনা ও রাষ্ট্রের চরম শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ফলে বিশেষ লাভ হইয়াছে। প্রথমত, রাষ্ট্রের চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিনাশ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশকে প্রতিহত করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে না, এই মত ব্যক্ত করিয়া বহুত্ববাদীরা ক্ষমতার বণ্টনকে সম্ভব করিয়াছেন। তৃতীয়ত, শ্রমিক সংঘ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যায়তন প্রভৃতি সংগঠনের স্বাতন্ত্র্য দাবী করিয়া বহুত্ববাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বিচারে ইহাদের গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

সমালোচনা—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথমত, সমাজে অন্যান্য সংঘের উপর চরম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার যদি রাষ্ট্রের হাতে না দেওয়া হয়, তবে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে?

দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের ভিত্তি নৈতিক, ইহা আইনগত নহে। আইনগত অধিকারের সহিত বহুত্ববাদীরা নীতিশাস্ত্রকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদী হইয়াও ল্যাস্কি দেখাইয়াছেন, বহুত্ববাদীদের একটি প্রধান ত্রুটি হইল, তাঁহারা রাষ্ট্রকে শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশরূপে দেখেন না।

উপসংহার—মূল কথা হইল সমাজজীবনে বিভিন্ন সংঘের স্বতন্ত্র গুরুত্ব নির্ধারণে বহুত্ববাদ যথেষ্ট কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রের

অবিভাজ্য ও চরম সার্বভৌমিকতার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে পারে নাই। অতএব লেস্‌লী লিপসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, আধুনিক সার্বভৌমিকতার ধারণা একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের মধ্যবর্তী একস্থানে অবস্থিত।

Q. 42. "The state is limited within, it is also limited without." Examine the statement. (Cal. 1957)

অষ্টিন ও একত্ববাদী চিন্তাধারার অন্যান্য লেখকগণ বলিয়াছেন, রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কোনরূপ বাধাকে স্বীকার করে না—ইহা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই চরম কর্তৃত্বের ধারণার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক লেখকগণ, বহুত্ববাদিগণ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমর্থকগণ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে, উভয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

প্রথমত, দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি-নীতি অমানা করিবার সাহস রাষ্ট্রের হয় না। স্বৈরাচারী শাসকেরাও ইহা মানিয়া চলে। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার কোন সার্বভৌমের পক্ষেই অমান্য করা সম্ভব নয়। ইংল্যাণ্ডের পার্ল‌ামেণ্ট সার্বভৌম বলিয়া কি সকল নাগরিকের ভোটের অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে? তৃতীয়ত, সার্বভৌম শক্তি ক্ষমতা প্রয়োগের সময় নিজের ক্ষমতার সীমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা প্রয়োগ করে। স্বৈরাচারের মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে জনসাধারণ তাহা সহ্য করিবে না। চতুর্থত, বহুত্ববাদীরা দেখাইয়াছেন, সমাজে যে নানাপ্রকার সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কার্যে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই পরিবেশ, সামাজিক মানুষের শিক্ষা ও তাহাদের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সীমিত। তাই ব্লুণ্টস্লি বলিয়াছেন "চরম স্বাধীনতা বলিয়া কোন ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাই এবং রাষ্ট্রও সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকার নহে। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আভ্যন্তরীণভাবে ব্যক্তির অধিকার ও বাহ্যিকভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ।"

তাহা ভিন্ন সংবিধানও রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অনেকখানি সংকুচিত করে। বর্তমান রাষ্ট্রে মৌলিক আইন ও সাধারণ আইন, এই দুই প্রকার আইনের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৌলিক আইনগুলি সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকে। সাধারণ আইনের ন্যায় ইচ্ছা করিলেই ইহাদের পরিবর্তন সাধন করা যায় না। সংবিধানে বিধিবদ্ধ আইনগুলিকেই বলা হয় সাংবিধানিক আইন। রাষ্ট্রকে সকল সময় এই সাংবিধানিক আইন মানিয়া চলিতে হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘ (যথা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, প্রভৃতি) ও বিশ্বজনমতের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হইলেও এবং পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্রের উপর যথেষ্ট লোভ থাকিলেও সে ইচ্ছামত তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। আক্রমণের পূর্বে তাহাকে দশ বার ভাবিতে হয়। কারণ আক্রমণ করিলেই তাহাকে বিশ্বজনমতের সম্মুখীন হইতে হইবে ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিন্দাভাজন হইতে হইবে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই নিন্দাভাজন হওয়ায় তাহার কোন ক্ষতি হয়তো হয় না। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহার ক্ষতি অপরিসীম। কারণ বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া উন্নয়নে সক্ষম নহে, এমনকি তাহার পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাই কষ্টকর। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরংকুশ অধিকার কোন মতেই মানিয়া লওয়া চলে না, কেননা তাহা হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরিণামে বিশ্ব ধ্বংস হইবে।

আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপরের আলোচনা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি নির্ভুল তত্ত্ব হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। বহুত্ববাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের একক চরম ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ বাধিলে রাষ্ট্রকেই তাহার মধ্যস্থতা করিতে হয়। প্রথা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি রাষ্ট্র ইচ্ছা করিয়া মানে। রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করিলে ইহার বিরোধিতা করিতে পারে, এবং ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়। তবে রাষ্ট্রের কর্তব্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রথাগত বিধান প্রভৃতিকে মানিয়া চলা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা আজ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। আন্তর্জাতিক আইন মানা বাধ্যতামূলক নহে। অন্যায়কারী রাষ্ট্রকে শাস্তি দিবার মত ক্ষমতা আজ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হয় নাই। চীন জোর করিয়া ভারতের ভূমি দখল করিয়া বসিয়া আছে। ইহা নিবারণ করা যায় নাই।

সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যতটুকু নিয়ন্ত্রিত মনে হয় তাহা রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় করে, তত্ত্বগত ভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

আইন

LAW

Q. 43. Define Law. (Cal. **1962**)

Discuss the nature and sanction of Law. (Cal. 1950, '56)

Is it enough to say that Law is the command of the sovereign ? (Cal. 1962)

ভূমিকা—রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের বিধি বা আইন লইয়াই আলোচনা করা হয়। অবশ্য রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় এবং মানুষের আচার-ব্যবহারের বিধিনিষেধকে আমরা আইন বলিয়া থাকি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের অর্থ অন্যরূপ।

বিবৃতি—অষ্টিনের মতে, আইন হইল নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের আদেশ। আইন একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় এবং সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ইহা প্রয়োগ করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তি অপরিহার্য। এই সংজ্ঞার সমালোচনা করিয়া স্যার হেনরী মেইন বলিয়াছেন, আইন কেবলমাত্র সার্বভৌমের আদেশ নহে। প্রত্যেক দেশেই নানারূপ প্রচলিত প্রথা, লোকাচার, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন প্রথা বা লোকাচার যতক্ষণ না রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ ইহা আইনে পরিণত হয় না। বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের পশ্চাতেও রাষ্ট্রের অনুমোদন রহিয়াছে। সুতরাং, সার্বভৌমিকতা কর্তৃক প্রণীত বা অনুমোদিত এবং প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন।

উড্রো উইলসন আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আইন হইল মানুষের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে সার্বভৌমিকতার সুস্পষ্ট সমর্থন রহিয়াছে।" হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাটি আরও স্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ও সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মই আইন।"

মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে আইনের পশ্চাতে। আইন মান্য করিলে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের স্বার্থ রক্ষিত হইবে, এই বিশ্বাসেই মানুষ আইন মানিয়া চলে। যে আইন স্পষ্টতঃ জনসাধারণের কল্যাণের পরিপন্থী তাহা কেহ মানিতে চায় না, এবং জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত ইহা পরিত্যক্ত হয়। জনসাধারণ যদি মনে করে আইন তাহাদের কল্যাণের জন্য হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে, তবে তাহারা স্বেচ্ছায় আইন মানিবে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইন যদি জনসাধারণের সমর্থনপুষ্টই হয়, তবে ইহা প্রয়োগের জন্য শারীরিক শক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয় কেন? পুলিশ, আদালত, জেলখানা রাখিবার দরকার কি? ইহার কারণ, সমাজের অধিকাংশ মানুষ নীতিবোধ ও কর্তব্যের দ্বারা পরিচালিত হইলেও কিছু সংখ্যক দুষ্টবুদ্ধি ও স্বার্থপর লোক অন্যায়ভাবে আইন অমান্য করিতে পারে। ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই আইনের পশ্চাতে বলপ্রয়োগের অবস্থিতি প্রয়োজন।

সমাজের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন আইনের মধ্যে দেখা যায়। জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা যে আইনের সাহায্যে পূরণ করা সম্ভব, সেই আইনের পশ্চাতেই জনসাধারণের অনুমোদন থাকিবে।

Q. 44. What are the different types of Law?

How far is it correct to use such expressions as "Laws of Nature", "Law of Morality", and "International Law"?

(Cal. 1950, '58)

Differentiate positive laws from (i) laws of nature, (ii) moral laws, (iii) social laws and (iv) religious laws. Give suitable illustrations.

মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র যে সব নিয়ম-কানুন তৈরী করে অথবা রীতি-নীতি প্রয়োগ করে সেগুলিকে আইন বা প্রকৃত আইন (Positive law) বলা হয়। আইন সম্পর্কে এই ধারণা স্বীকার করিলে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন (Natural law বা law of Nature), নৈতিক আইন (Laws of Morality বা moral law) অথবা ধর্মীয় আইন (religious law) প্রভৃতিকে আইন রূপে মানা যায় না।

(ক) **প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন** (Natural Laws)—অনেকে

লেখকের মতে রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। প্রাকৃতিক রাজ্যের নিয়মানুবর্তিতা, সামঞ্জস্য প্রভৃতি স্বাভাবিক বিধিকে মানুষ আইন বলিয়া গ্রহণ করিত। এইসব আইন স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহা রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ঊর্ধ্বতন। কিন্তু এই স্বাভাবিক আইনের ধারণাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বীকার করে না। কারণ, যে আইন বলবৎ করিবার পশ্চাতে কোন সার্বভৌম শক্তি নাই, তাহা আইন পদবাচ্য হইতে পারে না। তবে স্বাভাবিক আইনের ধারণার অন্তর্ভুক্ত বিধিনিয়মগুলি রাষ্ট্রের বিধি কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হইলে তবে আমরা তাহাকে আইন বলিতে পারি।

(খ) **নৈতিক আইন** (Laws of Morality)—মানুষের ন্যায় বোধ, ধর্মীয় ধারণা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি রীতি-নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে মানুষ এগুলি মানিয়া চলে। যেমন, অপরের অনিষ্ট করা উচিত নহে, সত্য কথা বলিবে, বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করিবে, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে রাষ্ট্র আইনরূপে স্বীকার করিয়া তাহা প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর কতকগুলি লোকে সাধারণভাবে মানে, কিন্তু রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। কেহ যদি ইহা ভঙ্গ করে তবে লোকনিন্দা হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে কোন শাস্তি পাইতে হইবে না। এইরূপ নিয়ম নৈতিক বিধি—আইন নহে। যেমন, অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা অন্যায়—ইহা নৈতিক আইন। কিন্তু ইহা আইন নহে—'চিন্তা করিলে' রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে না। সুতরাং যে সব বিধি প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে নাই অথচ যাহা পালনীয় বলিয়া মনে হয় তাহা নৈতিক আইন—আইন নহে। ধর্মীয় আইনও এই প্রকার।

(গ) **আন্তর্জাতিক আইন** (International Law) [৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দেখ]

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও রাষ্ট্রে আরও নানাপ্রকার আইন আছে—যেমন, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান ও এই সংক্রান্ত আইনকানুন, অর্থাৎ সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law), সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে আইন অর্থাৎ শাসনসংক্রান্ত আইন (Administrative law), খুন, ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ফৌজদারী আইন (Criminal law),

রীতি-নীতি, প্রথা-আচার হইতে উদ্ভূত সাধারণ আইন (Common law), প্রভৃতি।

Q. 45. Examine the sources of Law. (Cal. 1932, '35)

ভূমিকা—মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব বিধিনিয়ম রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় তাহাই আইন। এই আইন কেবলমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই, নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইন গঠনে কার্যকরী হইয়াছে।

বিবৃতি—সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ছয়টি আইনের উৎস বলিয়া স্বীকৃত হয়—

(১) **প্রথা** (Custom)—প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রথাগত বিধিনিষেধ দেখা যায়। সমাজবদ্ধ মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে যে সব আচরণ করিতে থাকে, তাহাই ক্রমে প্রথায় পরিণত হয়। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পর সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণত এইগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আইনের মর্যাদা লাভ করে।

রাষ্ট্রবর্গও অনেক সময়ে দেশের প্রচলিত প্রথাগত বিধানকে যুগোপযোগী করিয়া আইনসংগত রূপ দিয়া থাকে। অতীতের বহু প্রথা বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রে আইনসংগত রূপ পাইয়াছে। ভারতে হিন্দু সংহিতার (Hindu Code) নাম এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(২) **ধর্ম** (Religion)—ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ প্রাচীনকালে সমাজ জীবনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। রাষ্ট্র-পরিচালনায় এইসব বিধিনিষেধ সহায়ক বিবেচনায় রাষ্ট্র অনেক ধর্মীয় নিয়মকে আইনরূপে স্বীকার করিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আইনের প্রধান উৎসই হইতেছে ধর্মাচরণ।

(৩) **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত** (Adjudication)—বিচারকরা কেবল আইনের প্রয়োগ করেন না, মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিতে গিয়া প্রয়োজন মত আইনের ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ করেন। আইনের অর্থ স্পষ্ট না হইলে বিচারকেরা যে আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং অন্যান্য বিচারকগণ নজীর (precedent) রূপে ইহা গ্রহণ করেন। এইভাবে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হইতে নূতন আইনের সৃষ্টি হয়।

(৪) **ন্যায়বিচার** (Equity)—অনেক সময় আইনের অসম্পূর্ণতা ও

সংক্ষিপ্ততার জন্য বিচারকার্যে বিচারককে নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। প্রচলিত আইনের আওতায় ইহার মীমাংসা না হইলে বিচারক ন্যায়, সুবিচার, বিবেকবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত পরে আইনের ন্যায় মর্যাদা লাভ করে।

(৫) **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** (Scientific discussions)—আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনা প্রভৃতি বিচারকগণ শ্রদ্ধার সহিত আইনের ন্যায় গ্রহণ করেন এবং বিচারকার্যে প্রয়োগ করেন। প্রাচীন হিন্দু আইনবিদ্ মনুর আলোচনা এখনও আইনের ন্যায় মর্যাদা লাভ করে।

(৬) **আইনপ্রণয়ন** (Legislation)— বর্তমানকালে আইনপ্রণয়নই আইনের সর্বপ্রধান উৎস। নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন আইনসভার দ্বারা রচিত হইতেছে।

Q. 46. Distinguish between Law and Morality.

(Cal. 1932, '38, '42, '60, **'62**)

ভূমিকা—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, আর সমাজের নৈতিক বিশ্বাস নৈতিক বিধির (morality বা moral laws) মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

বিবৃতি—পূর্বে প্রচলিত ধর্মের নৈতিক ধারণা প্রভৃতিই কালক্রমে স্পষ্ট আইনের আকার ধারণ করিয়াছে। আইনের পশ্চাতে জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকা প্রয়োজন। এমনভাবে আইন প্রণয়ন করা উচিত যাহাতে মানুষের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষসাধন সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা প্রয়োজন, মদ্যপান ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের বিরুদ্ধে নৈতিক ধারণা যথেষ্ট দৃঢ় না হইলে কেবলমাত্র আইন করিয়া ইহা দেশ হইতে দূর করা যাইবে না। আবার, সতীদাহ নিবারণ বা বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আইন ভারতবাসীর নৈতিক জীবনকে উন্নত করার উদ্দেশ্য লইয়াই রচিত হইয়াছে।

সমালোচনা—এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আইন ও নৈতিক বিধি এক নয়। ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রথমত, বিষয়বস্তুর দিক হইতে নৈতিক বিধি মানুষের সমগ্র জীবন, অর্থাৎ বাহ্যিক আচরণ ও মানসিক চিন্তা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। কিন্তু আইন কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণের সহিতই সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত, আইনের পশ্চাতে আছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন। কেহ আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু নৈতিক বিধি ভংগ করিলে এইরূপ শাস্তি দিবার কেহ নাই। তবে ইহাতে লোকনিন্দা হয়। লোকনিন্দার এই ভয়েই সকলে নৈতিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলে।

তৃতীয়ত, আইন মানা বাধ্যতামূলক, কিন্তু নৈতিক বিধি মানা অনেকটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।

চতুর্থত, আইন নির্দিষ্ট, কিন্তু নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত অথবা নির্দিষ্ট রূপে অনুমোদিত হওয়ার ফলে আইনের মধ্যে স্পষ্টতা দেখা যায়। অপরপক্ষে নৈতিক বিধি সাধারণত নির্দিষ্ট আকারে সংকলিত করা হয় না বলিয়া ইহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই।

পঞ্চমত, আইনের বিধান সকলের সম্পর্কেই এক, কিন্তু নৈতিক বিধি বিভিন্ন মানুষের নিকট বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। রাষ্ট্রে সকলকেই শান্তি রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু মদ্যপান একজনের নিকট নৈতিক বিধি, অপরজনের নিকট হয়ত নহে।

ষষ্ঠত, ঈর্ষা, হিংসা, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কয়েকটি মানসিক ধারণা নীতি-শাস্ত্রের দিক হইতে নিন্দনীয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি কোন বিধিসম্মত আইনকে ভংগ না করিতেছে ততক্ষণ আইনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহার জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় না।

উপসংহার—এই সব পার্থক্য নির্দেশ করিলেও মনে রাখিতে হইবে, আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। যে-আইন নৈতিক ঔচিত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা জনগণ মানিতে চাহিবে না। আর নৈতিক বিধির পশ্চাতে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের সমর্থন না থাকিলে কালক্রমে তাহা লোপ পাইবে।

Q. 47. What do you understand by the expression "Rule of law?"

ভূমিকা—আইনের বিধান কথাটির অর্থ হইতেছে আইনের চোখে সকলেই সমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক হইতে এই ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় ইহা একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। 'আইনের বিধান' শব্দটি ডাইসি (Dicey) বিশেষভাবে প্রচলিত করেন। তাঁহার মতে ইংল্যাণ্ডের সমাজের ভিত্তিমূল হইল অধিকার, কোন

পাশব শক্তি নয়। দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারাই জনগণ শাসিত হয়। রাজশক্তির ক্ষমতা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ নাগরিকদের স্বাধীনতা স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্রের দমননীতির দ্বারা ব্যাহত হইতে পারে না।

বিবৃতি—ম্যাকাইভারের ভাষায়, "আইনের বিধান মতে, আমার পক্ষে যাহা আইন, ন্যায়সংগত অধিকার ও কর্তব্য, অন্য সকল নাগরিকের পক্ষেও ঠিক তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। কেহ কোন সুবিধাবলে কিংবা আইনবিরুদ্ধ কারণে কোন দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভ অথবা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারিবে না।" সুতরাং, আইনের বিধান বলিতে বুঝায় প্রথমত, আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। দ্বিতীয়ত, জন্ম, ধর্ম, সম্পদ প্রভৃতি দিক হইতে উচ্চ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সুবিধা পাইবে না। তৃতীয়ত, সরকারের অংগীভূত ব্যক্তি অর্থাৎ মন্ত্রী, কর্মচারী ইত্যাদি সকলকেই আইন অনুযায়ী তাহাদের কার্য পালন করিতে হইবে। তাহাদের কার্যাবলী আইনের ঊর্ধ্বে নয়। চতুর্থত, আইনের নির্দিষ্ট কোন বিধান ভংগ না করিলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া চলিবে না। পঞ্চমত, সাধারণ আইন ভিন্ন অপর কোন স্বৈরাচারী নিয়মের দ্বারা দেশ শাসন কিংবা নাগরিকদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে না।

সমালোচনা—অবশ্য সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে এইরূপ আইনের বিধান ইংলাণ্ড বা অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশেই নাই। কারণ, বিভিন্ন প্রকারে কর্মচারী, বিচারপতি, সৈন্যদল এবং বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণ আইনের আওতা হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ভিন্নরূপ পদ্ধতিতে ইহাদের বিচার হইয়া থাকে। তথাপি আইনের দিক হইতে সাধারণ নাগরিকগণ সমান এবং তাহাদের অধিকার আইন দ্বারা রক্ষিত, এইরূপ ধারণা গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হয়।

ডাইসি যখন ইংল্যাণ্ডে 'আইনের অনুশাসন' শব্দটি প্রচলিত করিয়াছিলেন তখন তিনি তৎকালীন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শাসন বিভাগের কোন স্বৈরী বা স্ববিবেচনা প্রসূত ক্ষমতা নাই। কিন্তু ১৮৮৫ সালে যখন ডাইসি তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন তখনও ইংল্যাণ্ডের শাসন বিভাগ এই স্বৈরী ক্ষমতা ভোগ করিত। এবং বর্তমানকালে সকল রাষ্ট্রেরই এই ক্ষমতা রহিয়াছে।

Q. 48. How far do you agree with the view that law is an expression of the "general will of the Community"?
(Cal. 1955)

ভূমিকা—রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, রাষ্ট্র 'সাধারণের ইচ্ছার' (general will) দ্বারা পরিচালিত। সকলের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়ই এই সাধারণ ইচ্ছা। আইনের ব্যাখ্যাতেও তিনি এই তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে, আইন সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ।

বিবৃতি—আইনের একমাত্র উৎস হইতেছে সাধারণের ইচ্ছা। রাষ্ট্র তথা নাগরিকদের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সব বিধিনিয়ম প্রস্তুত হইতেছে তাহা সকল নাগরিকের ইচ্ছার নির্দেশ অনুযায়ী হইতেছে। অন্য কোনরূপ ভাবে আইন প্রণীত হইতে পারে না। ল্যাস্কির ভাষায় বলা চলে, এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র চিরন্তন গণভোটের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

সমালোচনা—রুশোর আইন সম্পর্কিত ধারণা বর্তমান যুগে অচল। বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রাচীনকালের ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত। সকল নাগরিকের ইচ্ছা জানিয়া সেই অনুসারে আইন প্রণয়ন করা তখনকার দিনে সম্ভব হইলেও বর্তমানের বৃহৎ রাষ্ট্রে ইহা কল্পনা করাও যায় না। সাধারণের ইচ্ছা বর্তমানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কার্যত আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছানুসারেই আইন রচিত হইয়া থাকে। সুতরাং, আইন আসলে দেশের আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, 'সাধারণের ইচ্ছা' মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিকও আছে। আইন যদি সাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়, তাহা হইলে কোন আইনের বিরুদ্ধেই নাগরিকদের প্রতিবাদ করার অধিকার নাই, কারণ ইহা তাহার ইচ্ছানুসারেই হইয়াছে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, শ্রেণীশাসনের ফলে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণী অন্য শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী আইন প্রণয়ন করে এবং অন্যদের ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়।

উপসংহার—সুতরাং, আইন বলিতে সাধারণের ইচ্ছা বুঝায় না। তবে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আইন রচিত হইলেও দেশের জনমতের দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখা হয়। কোন আইন জনমতবিরুদ্ধ হইলে ইহা কার্যকরী করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

Q. 49. What is International Law? Can it be described as law in the strict sense of the term? (Cal 1950, '58)

"International Law is the vanishing point of Jurrisprudence." Examine this statement.

ভূমিকা—ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মানুষের যেমন অপরের সংস্পর্শে আসিতে হয় প্রত্যেক রাষ্ট্রকেও সেইরূপ অন্য রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক. বাণিজ্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি বিধিনিয়ম গড়িয়া উঠে, ইহাই আন্তর্জাতিক আইন।

বিবৃতি আন্তর্জাতিক প্রথা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত, খ্যাতনামা আইনবিদগণের আলোচনা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন গঠিত। শান্তির সময়ে কিংবা যুদ্ধাবস্থায় অথবা নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনে এইসব নীতির দ্বারা এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় কোন একটি নির্দিষ্ট সার্বভৌম মানবিক কর্তৃপক্ষ ইহা রচনা করে না কিংবা অনুমোদন করে না। কেন আইন ভংগ করিলে তাহাকে শাস্তি দিবার মতও কোন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নাই। দীর্ঘকালের প্রথা, ন্যায় ও সত্যের ধারণা এবং বিশ্ব-জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক আইন চলিয়া আসিতেছে।

সমালোচনা—আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার জন্য সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নাই, এই যুক্তিতে অষ্টিন প্রভৃতি আইনবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের স্বার্থ অনুযায়ী এই আইন মানিয়া চলে। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগিলেই ইহা ভংগ করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ বোধ করে না। আইন-ভংগকারীকে শাস্তি দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র জনমতের উপর ভরসা। এই কারণে আন্তর্জাতিক আইনকে নৈতিক বিধি বলা যায়, কিন্তু আইন বলা চলে না।

হল, ওপেনহাইম্, ব্রায়ার্লি প্রভৃতি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ উপরোক্ত মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, আন্তর্জাতিক আইন অন্যান্য আইনের ন্যায়ই আইন। প্রথমত, আইনের অস্তিত্ব সার্বভৌম কর্তৃত্বের অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। ইহা জনসাধারণের সম্মতির উপর

প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নিয়মের সমষ্টি। আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে সুস্পষ্ট জনমত অবশ্যই রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন প্রায়ই ভংগ করা হয়, এই যুক্তিতে ইহাকে আইন নামের অযোগ্য বলা ঠিক নয়। রাষ্ট্রীয় আইনও তো প্রায়ই ভংগ হয়। চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সর্বদাই হইতেছে, তাই বলিয়া ফৌজদারী আইন কি আইন নয়? তৃতীয়ত, বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করিতে পারে না। সকলেই প্রচলিত নিয়মকানুন মানিয়া চলে। এমনকি যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাহারও বিরুদ্ধে আইনভংগের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সেই রাষ্ট্র আইনভংগের জন্য গর্বপ্রকাশ করে না, বরং সে যে আইন বা চুক্তি ভংগ করে নাই, তাহা প্রমাণ করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে। মোট কথা, বিশ্বজনমত যতই শক্তিশালী হইতেছে, আন্তর্জাতিক আইনও ততই আইনের মর্যাদা লাভ করিতেছে।

উপসংহার—সূক্ষ্মভাবে দেখিলে রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় একই বিচারে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা চলে না। কারণ ইহা প্রণয়ন, অনুমোদন, কিংবা বলবৎ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন ও শান্তিরক্ষার স্বপক্ষে ক্রমবর্ধমান জনমত সৃষ্টি, বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম রচনা এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রায় আইনের মর্যাদা দান করিয়াছে। এইরূপ বলা যায়, ইহা দ্রুত পূর্ণ-আইনের স্থান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে।

নাগরিকতা

CITIZENSHIP

Q. 50. What do you understand by a citizen? In what way is the position of a citizen superior to that of an alien? (Cal. 1930, '42, '43).

ভূমিকা—সাধারণতঃ যে নগরে বাস করে তাহাকে নাগরিক বলা হয়। যেমন, কলিকাতার নাগরিক। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহার অর্থ আরও ব্যাপক। প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে কেবল যাহারা রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিত, তাহাদের নাগরিক বলা হইত। এই বিচারে নগরের ক্রীতদাস, শ্রমিক, নারী প্রভৃতি এবং নগরবহির্ভূত ব্যক্তিগণ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না। বর্তমানে নাগরিকের ধারণা অন্যরূপ।

বিবৃতি—যাহারা রাষ্ট্রের সদস্য, বর্তমানে তাহাদের নাগরিক বলা হয়। শহর বা গ্রাম, যেখানেই বাস করুক না কেন, প্রত্যক্ষভাবে দেশ-শাসনে অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, কোন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিলে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিকরূপে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে কতকগুলি সুবিধা পায় এবং অপর দিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নাগরিক ও প্রজা (Subject), এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক, দণ্ডিতঅপরাধী, উন্মাদ, দেউলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী সাধারণভাবে আনুগত্য মানিয়া চলিলেও তাহারা পূর্ণ নাগরিক নয়, প্রজা বা আংশিক নাগরিক মাত্র। ভোটাধিকার-সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তিই কেবল নাগরিক। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটাধিকার না পাইলেও তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করায় কোন বাধা নাই। ইংলণ্ডের নাগরিকদের রাণীর প্রজা (Queen's Subject) বলা হয়। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়া বর্তমানেও ইহা প্রচলিত আছে। সুতরাং প্রজা নামে অভিহিত হইলেও ইংলণ্ডের ব্যক্তিগণ পূর্ণ নাগরিক রূপে স্বীকৃত।

বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকতার আরও স্পষ্ট রূপ বর্ণনার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের সদস্য হইয়া কয়েকটি সুযোগ সুবিধা ভোগ করিলেই নাগরিক হওয়া যায় না। শিক্ষালাভ করিয়া স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা যে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে সেই-ই নাগরিক। ল্যাস্কির ভাষায়, জনসাধারণের মংগলের জন্য নিজের সুচিন্তিত মত প্রয়োগই হইল নাগরিকতা। ("Citizenship is the contribution of one's instructed judgement to the public good".)

নাগরিক ও বিদেশী—যাহারা রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহারা নাগরিক (citizen)। আর যাহারা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক কিন্তু ব্যবসায় বা অন্য কোন কার্য উপলক্ষ্যে অপর রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বাস করিতেছে, তাহারা সেই রাষ্ট্রে বিদেশী (alien)।

মিল—(১) নাগরিক ও বিদেশী উভয়েই রাষ্ট্র অভ্যন্তরে বাস করে এবং তাহাদের জীবন, সম্পত্তি প্রভৃতির নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্যলাভ করে।

(২) নাগরিক ও বিদেশী উভয়কেই রাষ্ট্রের কর দিতে হয়।

পার্থক্য—নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে মিল অপেক্ষা পার্থক্যই বেশি, যথা—

প্রথমত, নাগরিক অবস্থানরত রাষ্ট্রের সদস্য ও তাহার প্রতি আনুগত্যশীল, কিন্তু বিদেশী অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ও সেই রাষ্ট্রের সদস্য।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের বিপদের সময় নাগরিকের যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র বিদেশীকে নিজের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, সাধারণত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিক স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশীদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র বিদেশীকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যতক্ষণ বিদেশী অবস্থান করিবে ততক্ষণই রাষ্ট্র তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, অন্য রাষ্ট্রে চলিয়া গেলে সেই বিদেশী সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সব সময়েই থাকে। ভারতের কোন নাগরিক ফ্রান্সে গিয়া বিপদে পড়িলে ভারত রাষ্ট্র তাহাকে সাহায্য করিবে, এবং ফ্রান্সে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কোন মার্কিন নাগরিক ভারতে বেড়াইতে আসিলে ভারত সরকার তাহার নিরাপত্তা ও অন্যান্য দায়িত্ব লইবে

কিন্তু সেই মার্কিন নাগরিক ভারত ভ্রমণের পর ব্রহ্মে গেলে সেখানে ভারত সরকারের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

পঞ্চমত, নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয়প্রকার অধিকারই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বিদেশীরা সামাজিক অধিকার (যেমন জীবন রক্ষার অধিকার, ধর্মপালনের অধিকার ইত্যাদি) ভোগ করিলেও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। অর্থাৎ, দেশের নির্বাচনে ভোট দিতে অথবা প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে কিংবা সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারে না। নাগরিকের সহিত বিদেশীর ইহাই সবাপেক্ষা প্রধান এবং মৌলিক পার্থক্য।

উপসংহার—পূর্বে বিদেশীর কোন মর্যাদা বা অধিকার অপর রাষ্ট্রে স্বীকার করা হইত না। ইহা অনেকটা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর করিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের প্রসারের ফলে বর্তমানে বিদেশীরাও অন্য রাষ্ট্রে বিশেষ মর্যাদালাভ করিতেছে এবং তাহাদের বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজনৈতিক অধিকার না পাইলেও পূর্ণ-সামাজিক অধিকার বর্তমানে বিদেশীরা প্রায় সর্বত্রই ভোগ করিয়া থাকে। সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকুক, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, ধর্ম অনুশীলন, শিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতির সুযোগ সকলেই সর্বত্র পাইবে ইহাই সভ্য সমাজের নিয়ম।

Q. 51. Describe the different methods of acquisition of citizenship. (Cal. 1930, '42, '43)

ভূমিকা—প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়। প্রথম, স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ জন্মসূত্রে (Natural born), আর দ্বিতীয়, কৃত্রিম উপায়ে বা অনুমোদন দ্বারা (Naturalised)।

বিবৃতি—জন্মসূত্রে নাগরিক আবার দুইভাবে হওয়া যায়—প্রথম, রক্তগত সম্পর্কে (Jus Sanguinis) আর দ্বিতীয়, জন্মস্থান নীতি অনুসারে (Jus Soli বা Jus Loci)। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী শিশু যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহার পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। অপরদিকে, জন্মস্থান নীতির হিসাবে শিশু যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে, তাহার

পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউক না কেন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমি নির্ণয় করিতে কোন রাষ্ট্রের পতাকা সমন্বিত জাহাজকেও সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

উপরিউক্ত কোন নীতিই ত্রুটিহীন নয়। রক্তগত সম্পর্কের দিক হইতে অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর প্রকৃত পিতামাতার সন্ধান পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন ব্যক্তির নাগরিকতা কিরূপে নির্ণয় করা হইবে? আবার, জন্মস্থানের হিসাবেও দেখা যায়, যদি কোন ভারতীয় দম্পতি পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের ভূমিতে তিনটি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহা হইলে একই পিতামাতার তিনটি সন্তান কি তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে? ইহা স্পষ্টতই অবাস্তব।

বর্তমানে এই দুই নীতির কোনটিই এককভাবে পৃথিবীর সর্বত্র অনুসৃত হয় না। ভারত, ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্র উভয় নীতিই মানে। অর্থাৎ, ভারতীয় পিতামাতার সন্তান ভারতের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। আবার, ভারতের অভ্যন্তরে কোন বিদেশীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সেও ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা সমস্যার খানিকটা সমাধান হয় বটে, কিন্তু দুই নিয়ম একসংগে মানিলে অনেক সময় ভিন্নরূপ জটিলতারও সৃষ্টি হয়। কোন মার্কিন দম্পতির সন্তান ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে সে কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে? ভারতের জন্মস্থান নীতি অনুসারে সে ভারতের নাগরিক। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তগত সম্পর্কের নীতি অনুসারে সে মার্কিন নাগরিক। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এইসব প্রশ্নে খুবই বিবাদ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃশিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ইচ্ছামত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটির নাগরিকতা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। আবার দুই রাষ্ট্রের আলোচনার দ্বারাও ইহার মীমাংসা হয়।

অনুমোদন (Naturalisation)—অনুমোদনের দ্বারা এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে নাগরিকতা লাভ করিতে পারে। এক রাষ্ট্রের নাগরিক নানাকারণে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে চায়। নিজের রাষ্ট্র অপেক্ষা অন্য রাষ্ট্রকে কোন কারণে ভাল মনে হইলে নাগরিক নিজ রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রে যোগ দিতে চায়। অনেক সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি কারণে কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরিয়া অপর

রাষ্ট্রে বাস করিলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। রাজনৈতিক কারণেও অনেক ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রে চলিয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া অপর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন করে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ইহা অনুমোদন করিলে আবেদনকারীকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে স্বীকার করা হয়।

বিদেশীকে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে সাধারণতঃ কয়েকটি সর্ত পালন করিতে হয়। এই বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করিলেও মোটামুটি নিম্নরূপ সর্তপালনের উপর জোর দেওয়া হয়: (১) রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ। (২) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সম্পত্তি ক্রয়। (৩) সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া রাষ্ট্রের জন্য কাজ। (৪) রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে বিবাহ। সাধারণতঃ পুরুষ নাগরিককে বিবাহ করিলে অপর রাষ্ট্রের নারী স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে। তবে জাপানে এইরূপ নিয়ম আছে, কোন জাপানী নারীকে অপর রাষ্ট্রের পুরুষ বিবাহ করিলে সেই পুরুষ জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারে। (৫) একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন, ৫ বৎসর) রাষ্ট্রে বসবাস। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কোনরূপ সর্তপালন ভিন্নই এইরূপ নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারেন।

সাধারণতঃ এই সবগুলি সর্ত অথবা কোন কোন সর্ত (সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী) পালন করিয়া অপর রাষ্ট্রের নাগরিক (বিদেশী) রাষ্ট্রের বিচারালয় অথবা অপর কোন যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (Competent Authority) নিকট আবেদন করিয়া নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে সাধারণতঃ কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। যখন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক অন্য নাগরিকের ন্যায় পূর্ণ অধিকারলাভ করে তখন ইহাকে পূর্ণ অনুমোদন (Grand Naturalisation) বলে। কিন্তু কোথাও কোথাও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না—তবে অন্যান্য সকল অধিকার ভোগ করে। এই ক্ষেত্রে অনুমোদন আংশিক (partial)।

Q. 52. What are the hindrances to good citizenship? How can you remove them?

ভূমিকা—নাগরিক জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে কয়েকটি গুণের

সমাবেশের উপর। বুদ্ধি, বিবেচনা, সংযম, চেতনা প্রভৃতি গুণ একজন নাগরিকের মধ্যে থাকা একান্ত আবশ্যক। এই সব গুণ থাকিলে তবেই নাগরিক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের দ্বারা নিজ জীবন উন্নত করিতে পারে এবং সংগে সংগে বৃহত্তর সমাজেরও কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যে কয়েকটি দোষ সাধারণতঃ নাগরিক জীবনের পথে অন্তরায়—ব্রাইসের মতানুসারে তাহা হইল—(১) নির্লিপ্ততা, (২) স্বার্থপরতা ও (৩) দলগত স্বার্থ।

বিবৃতি—(১) **নির্লিপ্ততা (Indolence):** ইহা নাগরিক জীবনের প্রধানতম অন্তরায়। নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিক সম্যকভাবে অবহিত হইয়া যথাযথভাবে কার্য না করিলে নাগরিক জীবন তথা সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ভাঙিয়া পড়িবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া, নির্দিষ্ট করপ্রদান করা, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করা প্রভৃতি কার্যে কোন নাগরিকেরই নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকা চলে না।

(২) **স্বার্থপরতা (Private self-interest):** দেশ ও দশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নাগরিকগণ যদি নিজ নিজ ব্যক্তি-স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে, তবে এই স্বার্থপরতা নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থের লোভে অনেকে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়া থাকে। অর্থের লোভে বিদেশী রাষ্ট্রের চরবৃত্তি বা নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কার্য কিংবা খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ন্যায় কাজ সুনাগরিকতার পথে বিশেষ অন্তরায়।

(৩) **দলগত স্বার্থ (Party-spirit):** দল ব্যবস্থা গণতন্ত্রে অপরিহার্য এবং রাজনৈতিক দলের কার্যে অংশগ্রহণ নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু দলাদলির আবর্তে পড়িয়া অনেক সময় নাগরিকগণ প্রকৃত কর্তব্য পালনে অবহেলা করে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের উপরে দলের স্বার্থকে স্থান দেয়। ইহা সুনাগরিক হইবার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। দলের প্রয়োজনে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া কিংবা দলের জন্য দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কার্ল ম্যানহাইম বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পন্ন গণতন্ত্রে কতগুলি কল্যাণধর্মী কর্মপ্রসংগে বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতাবোধ থাকা উচিত।

অশিক্ষাকেও নাগরিকতার পথে অন্তরায় বলিয়া মনে করা হয়। শিক্ষার অভাবে নাগরিক সকল বিষয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

অন্তরায় দূরীকরণের উপায়—সু-নাগরিকতার পথে এই যেসব অন্তরায় তাহা দূর করার উপায় সম্পর্কে ব্রাইস বলিয়াছেন, দুইভাবে ইহা করিতে হইবে। প্রথম, শাসন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের দ্বারা। আর দ্বিতীয়, নাগরিকদের জীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন করিয়া। প্রত্যেক নাগরিককে ভোট দানে বাধ্য করা, আইন প্রণয়নের কার্যে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ, অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি বিধান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ প্রভৃতির দ্বারা শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। আর জনসাধারণের জীবনের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এই সঙ্গে নাগরিকদের কর্তব্যবোধকেও জাগ্রত করিতে হইবে।

অধিকার ও কর্তব্য

RIGHIS AND DUIIIS

Q. 53. What are Rights ?

ভূমিকা—সাধারণতঃ অধিকার বলিতে নাগরিকের স্ব ইচ্ছায় কোন কিছু করার বা না করার অবাধ স্বাধীনতা বুঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকারের অর্থ যাহা-ইচ্ছা তাহা করিবার স্বাধীনতা নয়। চোর যদি মনে করে, তাহার চুরি করিবার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে, রাষ্ট্র সে-ক্ষেত্রে তাহার সেই অধিকার মানিয়া লইতে পারে না, বরং তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে।

প্রকৃতি—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতা রহিয়াছে। মানুষ ইহার বিকাশের জন্য চেষ্টা করে। ইহার জন্য তাহাকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে হইবে, উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইলে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। বিনা বাধায় তাহার এই সব করিবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন-এই সব সুযোগ সুবিধার নামই অধিকার। একজন নিজের অধিকার ভোগ করিতে যাইয়া অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইহা দেখিবার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইন প্রভৃতির দ্বারা এমন পরিবেশের সৃষ্টি করা যাহাতে ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে এবং ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সমষ্টি জীবনও উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাহার বিকাশের জন্য যে সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন তাহারই নাম অধিকার। সমাজ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অধিকারগুলি স্থির করিতে হইবে। একের অধিকার ভোগ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। এই অধিকারগুলির যথাযথ সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র ভিন্ন অধিকারের কল্পনাই করা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের বাহিরে কোনরূপ অধিকারের অস্তিত্ব নাই। মোটকথা, ব্যক্তি তথা সমষ্টি-জীবনের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ সুবিধাই হইল অধিকার। সুতরাং কোন সুযোগ-

সুবিধাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে ইহাকে দুইটি শর্ত পালন করিতে হইবে—প্রথম, ইহা ব্যক্তি তথা সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর হওয়া চাই, এবং দ্বিতীয়, ইহা রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

ল্যাস্কি বলেন, 'অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, যে গুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না।" ("Rights . are those conditions of social life without which no man can seek' in general, to be himself at his best") গ্রীণ বলেন, "মানুষের নৈতিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সব সুবিধার প্রয়োজন তাহাই অধিকার"।

Q. 54. Can Rights be absolute? Give reasons for your answer.

ভূমিকা—মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে ব্যক্তি এই অধিকার রূপে ব্যক্তি এই অধিকার ভোগ করে।

প্রাচীন কালে নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে বলিতে গেলে অধিকারের দাবি উঠিয়াছে, এবং বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই নাগরিকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নাগরিকরা নানারূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। কয়েকটি অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকারও বলা হয়—যেমন, কাজ পাইবার বা ন্যায্য মজুরী পাইবার অধিকার।

এখন প্রশ্ন হইল এই সব অধিকার কি চরম? অর্থাৎ, এই অধিকারগুলি কি সর্বক্ষেত্রে সর্বদা প্রযোজ্য, এবং রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত?

বিবৃতি—রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন অধিকারকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যেকটি অধিকারই নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তন সাপেক্ষ। আইন ছাড়া যেমন স্বাধীনতার কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ নিয়ন্ত্রণবিহীন অধিকারের কথাও ভাবা যায় না। •

অধিকার সাধারণ ভাবে নাগরিককে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক অধিকারের ক্ষেত্রেই কয়েকটি ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা থাকে। যেমন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অশালীন কথা কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর বক্তৃতা করার অধিকার নিশ্চয়ই তাহার নাই। দ্বিতীয়ত, অধিকার প্রয়োগের ফলে যদি অপর কোন ব্যক্তির সম-অধিকারে ব্যাঘাত ঘটে, তবে রাষ্ট্র তাহা নিয়ন্ত্রণ করে। তৃতীয়ত, সার্বভৌমিকতার ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব রহিয়াছে। রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধে যে কোন অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে, এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না। খুনীকে রাষ্ট্রের আইনে ফাঁসি দেওয়া হয়—এইক্ষেত্রে ফাঁসির আসামীর জীবনের অধিকার নষ্ট হইল বলিয়া আপত্তি উঠে না। চতুর্থত, অধিকারের ধারণা কালনিরপেক্ষ নহে। সময়ের সহিত অধিকার সম্পর্কেও ধারণার পরিবর্তন হয়। ক্রীতদাস রাখিবার অধিকার এককালে ভাল বলিয়া মনে হইত, কিন্তু এখন ইহা একটি ঘৃণ্য প্রথা এবং সর্বত্র ইহা উঠিয়া যাইতেছে। অধিকার চরম হইলে ইহা পরিবর্তন করা যাইত না।

উপসংহার—মোট কথা, ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্য যে-সব সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হইবে তাহাকেই অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য কোথাও পুরানো অধিকার একেবারে বর্জন করিতে হইবে, আবার কোথাও সম্পূর্ণ নূতন অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে সংবিধান রচনার পর প্রথম সংশোধনই হইয়াছে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির অধিকারের ধারার পরিবর্তন। সমাজ কল্যাণের জন্য জমিদারী উচ্ছেদ প্রয়োজন হইয়াছে, এবং ইহার জন্য সম্পত্তির অধিকার সংশোধন করিতে হইয়াছে।

জনমতের মধ্য দিয়া অধিকারের ধারণা গড়িয়া উঠে, এবং রাষ্ট্রের আইন ইহাকে স্পষ্ট রূপ দেয়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের হাতেই অধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে।

Q. 55. Critically examine the doctrine of Natural Rights. **(Cal 1953.)**

ভূমিকা—রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত আইনগত অধিকার ছাড়া আরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়, যেগুলি স্বাভাবিক বা

প্রাকৃতিক অধিকার বলিয়া পরিচিত। এই সব অধিকার স্থানকাল ও রাষ্ট্রশাসনের উর্ধ্বে এবং মানুষের পক্ষে ইহা চিরন্তন, সহজাত, অপরিহার্য ও অবাধ। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সুখ অনুসরণের অধিকার প্রভৃতি এইরূপ স্বাভাবিক অধিকার।

বিবৃতি—গ্রীক দার্শনিকগণের রচনার মধ্যে এই অধিকারের উল্লেখ থাকিলেও হবস্, লক, রুশো প্রভৃতি সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকগণ ইহার সুস্পষ্ট আলোচনা করেন। এই সব লেখকদের মতে রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে যে 'প্রকৃতির রাজ্য' ছিল, তাহাতে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে মানুষ স্বভাব অনুসারে ও প্রকৃতির নিয়মে কতকগুলি অধিকার ভোগ করিত। ইহাই স্বাভাবিক অধিকার।

এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষই স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেমন, জীবনধারণের অধিকার। ইহা কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। আবার, প্রকৃতি-জগতের (nature) কতকগুলি চিরন্তন ও অপরিহার্য নিয়ম রহিয়াছে, প্রকৃতির অংগস্বরূপ মানুষ অবশ্যই সেই সব অধিকার ভোগের অধিকারী। মোট কথা, মানুষের স্বভাবজাত ধারণা, জীব জগতের সাধারণ নিয়ম-কানুন, প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের কতকগুলি অধিকার কল্পনা করা হয়, যাহা কোন রাষ্ট্র অনুমোদন করিল কি করিল না তাহার উপর নির্ভর করে না—মানুষের গায়ের রং বা চামড়া যেমন মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই অধিকারগুলিও সেইরূপ তাহার জীবনে অবিচ্ছেদ্য।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী দেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় এই স্বাভাবিক অধিকার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার, অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার অধিকার প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারকে মানুষের অপরিহার্য স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়া এই সব অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানিগণের রচনায় এই মতবাদ এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। গিডিংস্ বলেন যে, স্বাভাবিক অধিকারগুলি সহজাত চিরন্তন বা অপরিত্যাজ্য নহে। যে অধিকারগুলি সমাজের কল্যাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং যাহা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা প্রযুক্ত তাহা

স্বাভাবিক অধিকার রূপে রাষ্ট্র-স্বীকৃতি লাভ করে। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, প্রচালত সামাজিক পরিস্থিতির সহিত তাহার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

সমালোচনা—স্বাভাবিক অধিকার মতবাদের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে।

(১) 'স্বাভাবিক' কথাটি বিভিন্ন অর্থে লেখকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ ইহা মানুষের স্বভাব, কেহ স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন, আবার কেহ বা প্রকৃতি-জগতের রীতি-নীতি অর্থে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২) রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যের কল্পনা করিয়া সেই অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। আদৌ কখনও এইরূপ প্রকৃতির রাজ্য ছিল না।

(৩) রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা করা যায় না। অধিকার ভোগের উপরে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিবে। সে অবস্থায় কেবলমাত্র সবলেরই অধিকার থাকিবে, দুর্বলের কোন অধিকার থাকিবে না। অধিকারকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও তাহার নিয়ন্ত্রণ-শক্তি অপরিহার্য।

(৪) কোন অধিকারকেই চিরন্তন বলিয়া মনে করা যায় না। ইহা সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে। ক্রীতদাস-প্রথা এককালে অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহাকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হয় না ইহাকে নিন্দনীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধ বলিয়া মনে করা হয়।

উপসংহার—যুক্তি-বিবেচনায় স্বাভাবিক অধিকারকে অধিকারের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানিগণ যে অর্থে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবলমাত্র সেই অর্থেই ইহা স্বীকার করা যায়। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য কতকগুলি অধিকার নিতান্ত মৌলিক, কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং সমাজ-কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রের উচিত সেইগুলির পূর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। তবে ইহা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কিংবা চিরন্তন নয়।

Q. 56. Distinguish between Civil and Political Rights.
(Cal 1931, '40)

ভূমিকা—আধুনিককালে যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, তাহা আইনগত অধিকার (Legal Rights)। এই আইনগত অধিকারকে সাধারণতঃ পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

বিবৃতি—যে সব সুযোগ সুবিধা না থাকিলে মানুষকে সভ্যসমাজের অধিবাসীরূপে কল্পনা করা যায় না, অর্থাৎ যাহার অভাবে তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা কিংবা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটান সম্ভব নয়, সেগুলিকে পৌর বা সামাজিক অধিকার বলা হয়। যেমন, জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ইচ্ছামত ধর্ম পালনের অধিকার ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধাকে বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

[ইংগিত—এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে অধিকার বলিতে কি বুঝায় সেই সম্পর্কে ৪২ নং প্রশ্নের উত্তরটিও যোগ করিতে হইবে]

Q 57. Enumerate the more important fundamental rights which a citizen in a modern state enjoys.
(Cal. 1951)

ভূমিকা—সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন তাহাই অধিকার। ইহা অবাধ, অসীম বা চিরন্তন না হইলেও কতকগুলি অধিকারকে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া প্রায় সকল রাষ্ট্রেই স্বীকার করা হয়। এইগুলিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলিয়া সংবিধানে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং নাগরিকগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে এইগুলি ব্যবহার করিতে পারে সংবিধানে সেই সম্পর্কে বিধান নির্দিষ্ট করা থাকে। অবশ্য ইংলণ্ডে লিখিত ভাবে এই সব অধিকার স্বীকার করা না হইলেও, আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) বলে অধিকারগুলি মানা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই যে সবগুলি অধিকার

মানিয়া লইয়াছে তাহা নহে। রাষ্ট্র নাগরিকদের কতটা অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহার উপরেই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

বিবৃতি—সাধারণতঃ নাগরিকরা নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করে :

(১) **জীবনধারণের অধিকার** (Right to life)—এই অধিকারের বলেই মানুষ আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে পারে। আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত কাহাকেও বন্দী করা, আঘাত করা, কিংবা কাহারও প্রাণনাশ করা সম্ভব নয়।

(২) **বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার** (Right to marriage and family life)—জীবনধারণের ন্যায় প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিবার এবং পরিবার গঠনের অধিকার আছে।

(৩) **সম্পত্তি ভোগের অধিকার** (Right to property)—আইনসম্মত উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি ভোগের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। অবশ্য সম্পত্তির পরিমাণের প্রশ্ন লইয়া নানারূপ মতভেদ রহিয়াছে। বর্তমানে অনেকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের মতে, জীবনধারণের জন্য ও মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যভোগের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত সম্পত্তি কাহারও থাকা উচিত নহে।

(৪) **জীবিকা অর্জনের অধিকার** (Right to work)—বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবিকা অর্জন করিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিকেরই তাহার সাধ্যমত জীবিকা অর্থাৎ চাকরী পাইবার অধিকার থাকা প্রয়োজন।

(৫) **ন্যায়সংগত মজুরী ও নির্দিষ্ট কার্যকালের অধিকার** (Right to reasonable wages and hours of work)—ইহা জীবিকার্জনের অধিকারের অনুসিদ্ধান্ত। কেবল কাজ পাইলেই চলিবে না, কাজের জন্য উপযুক্ত মজুরী ও নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা) অধিকারও থাকা প্রয়োজন। শিল্পপ্রসারের ফলে প্রায় সব দেশেই এই অধিকার স্বীকার করা হইতেছে।

(৬) **শিক্ষার অধিকার** (Right to education)—অধিকারসমূহ ঠিকভাবে ব্যবহার ও কর্তব্যগুলি যথাযথ পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। সকলের জন্যই হয়ত উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

(৭) **ধর্মপালনের অধিকার** (Right to religion)—নিজ ইচ্ছামত ধর্মবিশ্বাস রক্ষা ও ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করার অধিকার থাকা প্রয়োজন। কোন বিশেষ ধর্মপালনের জন্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রদান করাও এই অধিকারের বিরোধী। সোভিয়েট ইউনিয়নে নাগরিকেরা ধর্মপালনের অধিকার স্বীকার করিয়াছে, এবং সংগে সংগে ধর্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতাও নাগরিকদের দিয়াছে।

(৮) **বক্তৃতা ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকার** (Right to speech and press)—প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও সেইভাবে অভিমত প্রকাশের অধিকার আছে। বক্তৃতার দ্বারা কিংবা পত্রিকা প্রকাশ, ইস্তাহার মুদ্রণ, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতির দ্বারা নিজ মত প্রকাশ করা যায়। যদি কেহ মনে করে যে তাহার মত অনুযায়ী চলিলে দেশ ও দশের মংগল হইবে তবে তাহা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ইহার বিপরীত কোন মত থাকিলে তাহাও প্রকাশ করিতে দিতে হইবে। রাষ্ট্রের পক্ষে কোনটিরই কণ্ঠরোধ করা উচিত নয়। তবে কেহ যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিরোধী বা প্রচলিত শালীনতা বিরোধী মত প্রচারের চেষ্টা করে নিশ্চয়ই তাহা করিতে দেওয়া হইবে না।

(৯) **সংঘ গঠনের অধিকার** (Right to form association)—ইহা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারেরই অনুসিদ্ধান্ত। কোন ব্যক্তির পক্ষেই একা কোন বৃহৎ কায করা সম্ভব নয়। নিজ মতের পক্ষে জনসাধারণকে আনিতে হইলে সংঘ গঠন করিয়া জনমত সৃষ্টি করিতে হয়। স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ এখানেও সেইরূপ অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। খুন করিবার উদ্দেশ্যে কোন সংঘ গঠনের চেষ্টা হইলে অবশ্যই তাহা বরদাস্ত করা হইবে না।

(১০) **রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের অধিকার** (Right to political power)—জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করিবে, ইহাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং, প্রত্যেকের ভোট দিবার, নির্বাচিত হইবার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিজেদের সরকার গঠনের অধিকার থাকা প্রয়োজন।

Q. 58. What are Duties? What are the important duties of a citizen in a modern state?

ভূমিকা—প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতকগুলি অধিকার ভোগ করে,

সেইরূপ তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। কর্তব্য ভিন্ন অধিকার কল্পনা করা যায় না। সকলেই যদি নিজের কর্তব্য পালন না করিয়া অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে কেহই অধিকার ভোগ করিতে পারিবে না। সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। নাগরিকের কর্তব্য পালনের উপর নাগরিকের ব্যক্তি তথা সমষ্টি জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করে।

বিবৃতি—ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা তাহাই অধিকার। আর প্রত্যেক নাগরিক নিজের নিকট, অন্য নাগরিকের নিকট ও রাষ্ট্রের নিকট যে সব কাজ করিবার জন্য দায়িত্ব বোধ করে তাহা কর্তব্য।

(১) যে সব অধিকার রহিয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া নিজ জীবনকে উন্নত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। যেমন, প্রত্যেকেরই উচিত শিক্ষা গ্রহণ করা, ভোট দেওয়া ইত্যাদি।

(২) নিজে যে সব অধিকার ভোগ করে অন্য নাগরিকও যাহাতে সেই সব অধিকার ভোগ করিতে পারে তাহা দেখা প্রত্যেকের কর্তব্য। নিজের যেমন জীবনের অধিকার আছে, অপরেরও সেইরূপ আছে। সুতরাং অপরের প্রাণনাশ করা চলিবে না।

(৩) সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রকে মানিয়া চলা, আইন প্রয়োগে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কর ইত্যাদি প্রদান করা।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য - রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্ততঃ পক্ষে তিনটি কর্তব্য পালন করিতে হয়:

(১) আনুগত্য (Allegiance): প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্য করা চলিবে না এবং রাষ্ট্র বিপদে পড়িলে প্রাণ দিয়াও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইবে।

(২) আইন মানা (Obedience to Law): রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলা নাগরিকের কর্তব্য। আইন অনুসারে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের কার্যে সাহায্য করা সকলেরই উচিত। কোন আইন অন্যায় বলিয়া মনে করিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার পরিবর্তনের চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তাহা থাকিবে ততক্ষণ তাহা মানিতে হইবে।

(৩) কর প্রদান (Payment of Taxes): রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর যে সব কর ধার্য করিবে তাহা কষ্টকর হইলেও দিতে হইবে। রাষ্ট্রের কার্য

পরিচালনার জন্য এই অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকরা ইহা না দিলে রাষ্ট্র চলিবে কি করিয়া?

ইহা ভিন্ন রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে-সব কর্মপন্থা (যেমন, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) গ্রহণ করে, তাহার সহিত সহযোগিতা করা নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা এবং প্রয়োজনমত তাহার সমর্থন বা প্রতিবাদ করা নাগরিকের কর্তব্য। কারণ নাগরিকের সদা-সতর্ক মনোভাবই গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষা কবচ।

Q. 59 "Rights and duties are two aspects of the same thing". Elucidate or, "Rights imply duties." Discuss

ভুমিকা—অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কল্পনা করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ কেবল নিজের অধিকারের দাবী জানাইতেই ব্যস্ত, কিন্তু কর্তব্য-পালনের বিষয়ে আগ্রহী নয়। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কর্তব্য পালন না করিলে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়।

বিবৃতি—অধিকার ভোগ করিতে গেলেই সংগে সংগে কর্তব্য পালন করিতে হইবে। একের অধিকার মানেই অপরের কর্তব্য। হবহাউসের ভাষায় বলা যায়, ধাক্কা না খাইয়া পথ চলার অধিকার ভোগ করিতে হইলে অপরকেও ধাক্কা না দিবার কর্তব্য পালন করিতে হইবে। ("If I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give reasonable room"). কোন নাগরিক তখনই শান্তিতে ঘুমাইতে পারে, যখন তাহার প্রতিবেশী নাগরিক তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত না করিবার কর্তব্য পালন করে।

মনুষ্যসমাজে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য পালন করি বলিয়াই সমাজ জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং নানারূপ অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারই স্পষ্ট প্রকাশ রাষ্ট্র ও তাহার আইনের মধ্যে।

নাগরিক যে বিভিন্ন প্রকার কর্তব্য পালন করে, তাহার উপরেই অধিকার নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ জীবনধারণের অধিকার ভোগের কথা ধরা যাক। এই অধিকার ভোগ করিতে হইলে নাগরিককে নিজের প্রতি, অপর নাগরিকের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

নির্দিষ্ট সময়ে আহার ও নিদ্রা, শরীরের প্রতি যত্ন, ব্যায়াম চর্চা, রোগ হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা—নিজের প্রতি এই সব কর্তব্য পালন না করিলে স্বাস্থ্যহানি হইবে, এবং পরিণামে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। তাহা হইলে জীবনের অধিকার কে ভোগ করিবে। দ্বিতীয়ত, অপর নাগরিকের জীবনের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করার কর্তব্য পালন করিতে হইবে। কেহ যদি অপরকে দেখিলেই মারিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকেই বা লোকে মারিবে না কেন? তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানা ও কর প্রদান করিতে হইবে। রাষ্ট্র শক্তিশালী হইলে ও ঠিক মত কাজ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকিলে তবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে এবং চোর ডাকাত, খুনী-গুণ্ডা নিয়ন্ত্রিত থাকিবে। রাষ্ট্র দুর্বল হইলে গোলযোগ দেখা দিবে, এবং কাহারও জীবনের নিরাপত্তা থাকিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে জীবনের অধিকার ভোগ করিতে হইলে নাগরিককে ত্রিবিধ কর্তব্যই পালন করিতে হইবে। এইরূপ সব অধিকার সম্পর্কেই বলা যায়।

অপর দিকে কর্তব্য পালনের জন্যও অধিকার প্রয়োজন। নাগরিক সামাজিক জীবনে যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাহাই অধিকার। অধিকার ভোগের মধ্য দিয়া নাগরিক তাহার জীবনের বিকাশ সাধন করে এবং নাগরিক কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হয়। অধিকার না দিয়া কেবল কর্তব্য পালন করিতে বলিলে নাগরিক স্বেচ্ছায় তাহা করিবে না—রাষ্ট্রকে জোর করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে। ফলে ইহাকে আর কর্তব্য বলা চলিবে না, এবং কাজও ভাল হইবে না।

সুতরাং অধিকার ও কর্তব্য একই জিনিসের এদিক আর ওদিক। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে দেখা যায়, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা ও সাম্য

LIBERTY AND EQUALITY

Q. 60. Discuss the various meanings of the term Liberty. (Cal. 1935.)

ভূমিকা—ইংরাজী liberty কথাটি ল্যাটিন liber হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে—যাহার অর্থ স্বাধীন। সুতরাং এই দিক হইতে ইহাকে আমরা স্বাধীনতা বলিতে পারি। সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলিতে যাহা খুসি করিবার অবাধ স্বাধীনতাকে বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে চোরের চুরি করিবার বা খুনীর খুন করিবার ইচ্ছাকেও স্বাধীনতা বলিয়া সমর্থন করিতে হয়—কিন্তু তাহা অসম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

বিবৃতি—কোনরূপ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে তবেই স্বাধীনতা সম্ভব, এই ধারণা ভুল। সবলের অন্যায় আচরণ বন্ধ না করিলে দুর্বলের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। সুতরাং স্বাধীনতার জন্যই ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অবশ্য সব নিয়ন্ত্রণও আবার সমর্থনযোগ্য নয়। যে সব কার্য অন্যের অধিকার ভোগে বাধার সৃষ্টি করে, তাহা বন্ধ করা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়। কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকিলেই স্বাধীনতা হয় না। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন তাহার অবাধ ব্যবহারের ব্যবস্থা স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোনরূপ অযথা নিয়ন্ত্রণ চাপান অবাঞ্ছনীয়।

বর্তমানকালে স্বাধীনতার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। স্বাধীনতা বলিতে এমন একটি পরিবেশকে কল্পনা করা হয় যেখানে মানুষ পরিপূর্ণভাবে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ পায়। ল্যাস্কি বলিয়াছেন; "স্বাধীনতা বলিতে আমরা সযত্নে এমন একটি পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বুঝি, যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।" ("By liberty we mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their

best selves")। আর এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় অধিকারের দ্বারা। তাই ল্যাস্কি আরও বলিয়াছেন, "Liberty is the product of rights." অর্থাৎ স্বাধীনতা অধিকার হইতে উদ্ভূত।

তবে স্বাধীনতা অধিকার হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহা কর্তব্য বহির্ভূত নহে। স্বাধীনতা ও কর্তব্যপালন পরস্পরের পরিপূরক। একের স্বাধীনতা অন্যের কর্তব্যবোধের দ্বারা সীমিত। তাই জন ডিউয়ি বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা যদি দায়িত্বজ্ঞানের দ্বারা সংযত না হয় তবে উহা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়, এবং দায়িত্ব পালন করিবার সময় স্বাধীনতার কথা মনে না রাখিলেও যথেচ্ছচারী শক্তির উদ্ভব হয়। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা (Different kinds of liberty): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখকগণ স্বাধীনতা শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ইহার ফলে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার বর্ণনা পাওয়া যায়:

(১) **স্বাভাবিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty) বলিতে স্বাভাবিক অধিকারের ন্যায় রাষ্ট্রবিহীন একটি প্রকৃতির রাজ্য কল্পনা করিয়া উক্ত অবস্থায় মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহা বুঝায়। এইরূপ স্বাধীনতায় রাষ্ট্র বা তাহার নিয়ন্ত্রণের কোন স্থান নাই। কাহারও স্বাধীনতার উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে ইহা স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। সুতরাং "স্বাভাবিক স্বাধীনতা"র কল্পনা অবাস্তব।

(২) **রাজনৈতিক স্বাধীনতার** (Political Liberty) অর্থ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে নাগরিকদের অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা। প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে ভোট দান করিতে, নির্বাচিত হইতে, সরকার গঠন করিতে কিংবা সরকারী কার্যের সমালোচনা করিতে পারিবে, এইরূপ স্বাধীনতা গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়াছে।

(৩) **পৌর স্বাধীনতা** (Civil Liberty)—পৌর অধিকারসমূহ ভোগ করিবার স্বাধীনতার নাম পৌর স্বাধীনতা। জীবন ধারণের অধিকার, ধর্ম পালনের অধিকার প্রভৃতি ইহার জন্য প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার ফলে মানুষ সভ্যসমাজের অংশ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

(৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)—অভাব, অনশন ও বেকারত্বের আশংকা হইতে মুক্ত থাকিবার যে স্বাধীনতা তাহার নাম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অন্তত সকলের জন্যই জীবনধারণ করিবার মত ন্যূনতম আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, মোটামুটি শিক্ষালাভ, সাধ্যমত কাজ পাইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি না থাকিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে। সর্বদা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে কাহারও পক্ষে রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক ও পৌর স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া ধরা হয়। ল্যাস্কির মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল কাহারও জন্য অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে সকলের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনের অভাব অবশ্যই মিটাইতে হইবে। ("There must be sufficiency for all before there is superfluity for the few.")।

(৫) জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)—অপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হইতে কোন রাষ্ট্রের মুক্ত ও স্বাধীন থাকার নাম জাতীয় স্বাধীনতা। ভারত ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ইহার পূর্বে তাহার এই স্বাধীনতা ছিল না।

Q. 61. "Law is the condition of liberty". Discuss.

Or, "The liberty of an individual is not always in inverse ratio to the amount of state legislation." Examine.

Or, What is precisely the relation between law and liberty?

ভূমিকা—সাধারণতঃ আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করা হয়। আইন বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অর্থই হইল ব্যক্তির নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্যের উপর হস্তক্ষেপ। আইন মানিয়া চলিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত ও গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যায়। এই কারণেই অনেক লেখক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অভাবকেই স্বাধীনতা বলিয়াছেন, এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকে না এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আইন-কানুন স্বাধীনতার পরিপন্থী তো নয়ই, বরং তাহার পরিপোষক।

বিবৃতি—অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না।

স্বাধীনতা বলিতে পরের বা বাহিরের সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি বুঝিলে তাহা মানব-সমাজের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেকে যদি সীমাহীন স্বাধীনতা চায়, তাহা হইলে একের ইচ্ছার সংগে অপরের ইচ্ছার বিরোধ বাধিবে এবং 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অনুসৃত হইবে। ফলে কেবলমাত্র অধিক বলশালী ও বিত্তবান লোকের স্বাধীনতা থাকিবে, দুর্বল ও নিরীহ প্রকৃতির লোকের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। ইহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের জন্য, সকলেরই সমভাবে স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আছে। এই কারণেই কোন ব্যক্তির কার্যের দ্বারা অপরের অধিকার তথা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হইলে, রাষ্ট্র বিধি নিষেধ আরোপ করিয়া ইহা বন্ধ করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এমনভাবে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে সকলেই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে আইনই স্বাধীনতার রক্ষক। রাষ্ট্র বা আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কারণ আইনই প্রত্যেকের অধিকারের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয়। আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই যে আমি অন্যের নামে কুৎসা রটাইয়া তাহার সুনাম নষ্ট করিব তাহা হইতে পারে না। বার্কার বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।" উইলোবিও বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ আছে বলিয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতা টিঁকিয়া আছে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে হবস্ কল্পিত বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক রাজ্যে ফিরিয়া আসিবে। কোন ব্যক্তি জীবন ও ধনসম্পত্তি লইয়া সুনামের সহিত বসবাস করিতে পারিবে না।

রাষ্ট্র বা আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে। স্বাধীনতা বা অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট কিনা সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কিংবা আমরা যদি ধরিয়াও লই যে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, তাহা হইলেও রাষ্ট্রই যে উহা রক্ষা করে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা সামাজিক আদর্শের বিরোধীতা করিয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, রাষ্ট্র তাহাদিগকে দণ্ড দেয়। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না মানিলে ব্যক্তি স্বাধীনতা অবশ্যই বিপন্ন হইবে।

আবার শাসক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে নাগরিকের স্বাধীনতা ব্যাহত বা নষ্ট না হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রের সংবিধান বা চরম আইন এবং বিশেষ ধরনের আইন থাকে।

ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রের কর্তব্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাহাতে নাগরিকগণ

তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারে। ইহার জন্য রাষ্ট্র শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, সংবাদ সরবরাহ, পার্ক ইত্যাদি সংরক্ষণ প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতার বিকাশলাভে সহায়তা করে। রীচি (Ritchie) বলিয়াছেন, "স্বাধীনতাকে যদি আত্মবিকাশের প্রত্যক্ষ সুযোগ বলিয়া মনে করা হয় তবে তাহা অবশ্যই আইন দ্বারা সৃষ্ট।" তাই আইন দ্বারা সমর্থিত নহে এমন স্বাধীনতা নীতিসঙ্গত হইলেও কার্যক্ষেত্রে ভোগ করা চলে না।

মোটকথা, আইনের অবস্থিতি স্বাধীনতার অবলুপ্তি প্রমাণ করে না, বরং আইন স্বাধীনতার রক্ষক, নির্ধারক ও সম্প্রসারক।

উপসংহার—স্বাধীনতার জন্য আইন অপরিহার্য ইহা যেমন সত্য কথা, তেমনি মনে রাখিতে হইবে সব আইনই স্বাধীনতার অনুকূল নয়। বহু দেশে এমন অনেক আইন আছে যাহা স্বাধীনতার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের উল্লেখ করা যায়। এইরূপ আইন মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ এবং স্বাধীনতার বিরোধী। এই কারণেই অনেক লেখক রাষ্ট্রকে সর্ব ক্ষমতার আধার করিতে রাজি নহেন। আসল কথা হইল, কোন আইন স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা নির্ভর করে সেই আইনের প্রকৃতির উপর।

Q. 62. What are the safeguards of liberty ?

ভূমিকা—স্বাধীনতা বলিতে এমন একটা পরিবেশকে আমরা বুঝি যেখানে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্র-স্বীকৃত অধিকারগুলি ভোগ করিয়া নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্তব্য এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শাসকমণ্ডলী অন্যায়ভাবে নাগরিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তিরা নিজেদের অধিকারবলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে অপরকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। এই কারণেই বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতার কয়েকটি রক্ষা-ব্যবস্থা বা রক্ষাকবচের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিবৃতি—নিম্নলিখিতভাবে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলিকে (safeguards) বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) **সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধকরণ**—নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করা এবং উহা ভংগ করিলে তাহার প্রতিবিধানের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষা-কবচ বলিয়া ধরা হয়। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার এইভাবে নির্দিষ্ট করা আছে।

(২) **আইনের বিধান (Rule of law)**—ইংল্যাণ্ডের সংবিধান প্রধানত অলিখিত বলিয়া সেখানে মৌলিক অধিকার উপরিবর্ণিতভাবে বিধিবদ্ধ করা নাই। ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় আইনের বিধান ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা এই স্বাধীনতা রক্ষায় সহায়তা করে। আইনের চোখে সকলেই সমান এবং কেহই আইনের উর্ধ্বে নয়, ইহাই আইনের বিধানের মূল কথা।

(৩) **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ** (Separation of powers)—ফরাসী লেখক মন্টেস্কু প্রভৃতির মতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ভিন্ন স্বাধীনতা অর্থহীন। এই মতবাদ অনুসারে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার—এই তিনটি বিভাগকে পরস্পর পৃথক করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কার্যত ইহা সম্ভব নহে। ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহা কার্যে প্রয়োগ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। আর ইহার প্রয়োজনও নাই। ইংলণ্ডে এই নীতি একেবারেই অনুসরণ করা হয় নাই, তথাপি সেখানে স্বাধীনতা রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ লেখকই স্বীকার করেন, বিচার বিভাগকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা বিভাগ হইতে পৃথক করা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

(৪) **দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা** (Responsible Government)—গণতান্ত্রিক অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় শাসকদল তাহাদের কার্যের জন্য আইনসভা ও জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে এবং সরকারী কার্যের সমালোচনার জন্য বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। ইহাও স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।

(৫) **নাগরিকদের সতর্কতা**—কিন্তু স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষাকবচ হইল নাগরিকদের মধ্যে চেতনা এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সদাসর্বদা সতর্ক থাকা। জনমত সৃষ্টির দ্বারা এবং স্বাধীনতার প্রতি আঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়া নাগরিকগণ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। গ্রীক

পণ্ডিত পেরিক্লস্ বলিয়াছেন, "সদা সতর্ক থাকাই হইল স্বাধীনতার মূল্য" ("Eternal vigilance is the price of liberty.")।

উপসংহার—বর্তমান যুগে এই সব রক্ষাকবচের কোন একটিমাত্র ব্যবস্থা যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় না। অবস্থা বিবেচনায় মৌলিক অধিকারের বিধিবদ্ধকরণ, আইনের বিধান, নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রয়োজন আর সর্বোপরি প্রয়োজন অধিকার রক্ষা সম্পর্কে সজাগ নাগরিক চেতনা।

Q. 63. Define Equality. To what extent does the realisation of civil liberty depend upon economic equality?

"Political liberty in the absence of economic equality is a myth". (Cole). Examine the statement.

সংজ্ঞা—সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। উনবিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতার অধিকার আর বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল সাম্যের অধিকার। কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার সহিত সাম্যের অধিকার না থাকিলে গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণাংগ রূপায়ণ সম্ভব নহে। তাই বলা হয় সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। সাম্য অর্থে এখানে বিশেষতঃ অর্থ নৈতিক সাম্যের কথা বলা হইয়াছে। লর্ড অ্যাক্টন, তক্ভিল্, প্রভৃতি লেখক অবশ্য সাম্য ও স্বাধীনতাকে পরস্পর পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। সাম্য স্থাপিত হইলে কাহারও নিজস্ব স্বাধীনতা থাকিবে না, আবার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইলে অন্যকে ধনসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া সাম্যের অবসান ঘটানো হইবে, এইরূপ মনে করা হইত। কিন্তু ইহা ভুল। সাম্য ও স্বাধীনতা উভয়েই সমভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তি।

সাম্যের অর্থ সকলের আথিক অবস্থাকে একই স্তরে নামাইয়া আনা কিংবা সকলের ক্ষমতা ও ব্যবহার একইরূপভাবে নির্ধারণ করা নয়। একজন বৈজ্ঞানিকের যে অর্থ ব্যয় হইবে, একজন রিকসা-শ্রমিকের তাহা হইতে পারে না। দেশের প্রধান মন্ত্রী যে ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, তাহা একজন সাধারণ নাগরিকের অপেক্ষা অবশ্যই বেশি হইবে। তাহা হইলে সাম্যের অর্থ কি? প্রাচীনকালে ধনসম্পদ, ধর্ম, বংশ, রাজমর্যাদা প্রভৃতির জোরে কিছু মানুষ অন্যের তুলনায় অধিক সুবিধা ভোগ করিত। এইরূপ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ

অধিকার লোপই সাম্যের প্রধান কথা। এই বিচারে প্রত্যেক নাগরিকই সমান এবং রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান ব্যবহার পাইবার অধিকারী। আইনের চোখে একজনের সহিত অপরের কোনরূপ পার্থক্য করা চলিবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা সমান। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় প্রত্যেক নাগরিককেই ন্যূনতম শিক্ষা দিতে হইবে এবং জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার পরে কেহ যদি নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে অপরের অপেক্ষা বেশি শিক্ষিত, ধনী কিংবা ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। তবে, একজনের তুলনায় অপরে অধিক সম্পদের মালিক হইলে সেই বাড়তি সম্পদ তাহাকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যের বিনিময়ে অর্জন করিতে হইবে। অলস হইয়া পিতৃদত্ত অর্থে সম্পদশালী হইবার সুযোগ সাম্য স্বীকার করে না।

বিভিন্নপ্রকার সাম্য—স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

(১) ব্যক্তিগত সাম্য (Civil equality) : ইহার অর্থ প্রত্যেক নাগরিক সমানভাবে পৌর অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পাকিস্তানে ইসলামকে রাষ্ট্র-ধর্মরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, ফলে হিন্দুরা সেখানে সমান ধর্মগত পৌর অধিকার ভোগ করিতেছে না বলিয়া তাহারা ব্যক্তিগত সাম্য হইতে বঞ্চিত।

(২) রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (Political equality) : শ্রেণী, ধর্ম বংশ, ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিক রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণের অধিকারী হইলে এবং রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে সকলের সমান আলোচনার অধিকার থাকিলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য আছে বলিয়া মনে করা হয়। সার্বজনীন ভোটাধিকারকেই রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, যদি কোন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সাম্য না থাকে তবে সেখানে রাজনৈতিক সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকারী কার্যের সমালোচনার অধিকার সাধারণ নাগরিকের নাই বলিয়া অনেক লেখক মনে করেন, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য নাই।

(৩) অর্থনৈতিক সাম্য (Economic equality)—প্রত্যেকের জীবনধারণের জন্য যাহা ন্যূনতম প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা, প্রত্যেকের কাজ পাইবার

অধিকার এবং মানুষের প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় আয়ের বণ্টন হইল অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তি।

অর্থনৈতিক সাম্যের সহিত ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার সম্পর্কঃ অর্থনৈতিক সাম্য ভিন্ন ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। মানুষ যদি অনাহারে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করে তবে তাহার জীবনধারণের অধিকারই নষ্ট হইয়া যায়। প্রতিনিয়ত যদি একজনকে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য কাল কাটাইতে হয় এবং আগামীকালের অনশনের জন্য ভাবিতে হয় তবে রাষ্ট্রের উন্নতি বিষয়ে সে কখন চিন্তা করিবে, রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণের সুযোগই বা কি করিয়া গ্রহণ করিবে?

অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে সমাজে ধনবৈষম্য থাকিবে, এবং এই কারণে দরিদ্রকে ভোটদানকালে এবং নিজ মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ধনী বিশেষ করিয়া তাহার কর্মকর্তার নিকট অনুগত থাকিতে হইবে। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হইয়া যায়। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের নিকট হইতে ধনী ও দরিদ্র কখনও সমান সুযোগ পাইতে পারে না। বিচারের ব্যয়ভার বহন করিবার ক্ষমতা দরিদ্রের থাকে না। এই কারণেই ল্যাস্কি বলিয়াছেন অর্থনৈতিক সাম্যের সহিত যুক্ত না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য সম্ভব হয় না।

সংবিধান

CONSTITUTIONS

Q 64. Define constitution. Classify the different constitutions. (Cal. 1923, '1?)

ভূমিকা—মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেমন কতকগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপও সেইরূপ কতকগুলি বিধি-নিষেধ দ্বারা নির্দিষ্ট। এই বিধিনিষেধগুলি না থাকিলে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে।

বিবৃতি—প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা শাসক-শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে এই সম্পর্ক যে মূল বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনের দ্বারা নির্ধারিত, তাহাকেই রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়। মোটকথা একটি রাষ্ট্রের সরকার কিভাবে গঠিত হইবে ও তাহার কি কি ক্ষমতা থাকিবে, এই সব ক্ষমতা কি ভাবেই বা প্রয়োগ করা হইবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকিবে এবং শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে. সেই সম্বন্ধে যে সব বিধিবদ্ধ বিধান থাকে, তাহাদের সমষ্টিকে বলা হয় সংবিধান বা শাসনতন্ত্র (constitution)।

সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়া মার্কিন আইনজ্ঞ কুলি (Cooly) বলিয়াছেন, "সংবিধান হইল রাষ্ট্রের মৌলিক আইন, যেখানে সরকারের গঠন ব্যবস্থা, সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার কে করিবে এবং কিরূপে করিবে তাহা লিপিবদ্ধ আছে।" এই প্রসংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম লেখক গিলক্রাইষ্ট বলেন, "কোন রাষ্ট্রের সংবিধান হইল লিখিত বা অলিখিত বিধি নিয়মের এক সমষ্টি যাহার বলে সরকার গঠন করা হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং এই সকল বিভাগের কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে সংবিধান, তাহা যে ধরণেরই হউক না কেন, রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য। এমনকি সামগ্রিক রাষ্ট্রে যেখানে শাসকের মতামতই আইন, সেই মতামতকে সংবিধান হিসাবে মানিয়া চলিতে হইবে। জেলিনেকের ভাষায় ইহার কারণ নির্দেশ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সংবিধানের অনুপস্থিতির অর্থ মাৎস্যন্যায়।

কিন্তু সংবিধান থাকিলেই যে তাহা লিখিত হইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। লিখিত সংবিধান ছাড়াই আমরা কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে, অতীতে এমন অনেক রাষ্ট্র ছিল যেগুলি প্রধানতঃ অলিখিত নিয়মকানুন অনুসারেই পরিচালিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে শাসন ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন লিখিত আইন ছিল না। বর্তমানে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থাও প্রাথমিকভাবে প্রথাগত বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রেণীবিভাগ—সংবিধানকে প্রাথমিকভাবে ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে —লিখিত ও অলিখিত; বিবর্তনমূলক ও কার্যকারণ সম্বন্ধমূলক (a priori); সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়। অনেকে আবার সংবিধানকে, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক বলিয়াও শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীবিভাগগুলি সংবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ইহা একান্তভাবে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ।

প্রথম, লিখিত (written) এবং অ-লিখিত (unwritten)। লিখিত সংবিধানে শাসন পরিচালনার আইনকানুনগুলি স্পষ্টভাবে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা থাকে। সাধারণতঃ কোন একটি সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিষদ কর্তৃক এই সংবিধান রচনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সংবিধান এইরূপ লিখিত। আর অলিখিত সংবিধানে এই সব নিয়ম-কানুন, লিখিত বা লিপিবদ্ধভাবে থাকে না, দেশের প্রচলিত প্রথা, ব্যবহার, রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সংবিধানের ধারণা গড়িয়া উঠে। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান এইরূপ।

স্যার হেনরী মেইন সংবিধানকে, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক এবং কার্যকারণ সম্বন্ধমূলক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিবর্তনমূলক সংবিধান বলিতে তিনি সেই সব সংবিধানকে বুঝাইয়াছেন যেগুলি বহুদিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র হইল এই ধরণের সংবিধান। আর কার্যকারণ সম্বন্ধমূলক সংবিধান হইল সেই সকল বিধি-নিয়ম যাহার সহিত অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নাই এবং যাহা কেবলমাত্র কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীদিগের সংবিধান হইল এই ধরণের সংবিধান। কিন্তু এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। কারণ অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্ক

বিবর্জিত হইয়া কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না এবং এই ধরণের শাসনব্যবস্থা একবার গঠন করিলে তাহা বিবর্তনমূলক সংবিধানের ন্যায় বিবর্তিত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া, বিবর্তনমূলক সংবিধানের চিন্তার মধ্য দিয়াও মেইন নূতন তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। কারণ অলিখিত সংবিধান ও বিবর্তনমূলক সংবিধানের মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নাই।

সংবিধানকে লিখিত ও অ-লিখিত এই দুইপ্রকারে বিভক্ত করার বিপক্ষে আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোন সংবিধানই সম্পূর্ণ লিখিত বা সম্পূর্ণ অ-লিখিত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অনেক অ-লিখিত রীতি-নীতি স্বীকার করা হয়। যেমন বিচারকদের ব্যাখ্যা। সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে বিচারকগণ মার্কিন সংবিধানের নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন; আর এই সকল ব্যাখ্যাই মূলসংবিধানের পাশাপাশি থাকিয়া কার্যকরী হয়। বস্তুতপক্ষে, এই সকল ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে মার্কিন সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না। ইংলণ্ডের সংবিধানেও অনেক লিখিত অংশ রহিয়াছে। যেমন বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ আইন, সংস্কার আইন (১৯১১), সংশোধনী আইন (১৯৪৯), প্রভৃতি পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনগুলি সংবিধানের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং, লিখিত ও অলিখিত এই ভাবে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নহে। বর্তমানে লেখকগণ তাই সংবিধানকে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় (flexible) ও অ-নমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় (rigid), এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। আইনপরিষদে সাধারণ আইন যেভাবে সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়, সংবিধানের নিয়ম-কানুনও যদি সেই একই পদ্ধতিতে সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়, তবে তাহাকে নমনীয় সংবিধান বলা হয়। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান নমনীয়। আর, সাধারণ আইন পরিবর্তনের প্রচলিত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি যদি সংবিধানের বিধি-নিয়ম সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহাকে অ-নমনীয় সংবিধান বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এইরূপ।

Q. 65. Distinguish between a written and an unwritten constitution. What are their respective merits and demerits? (Cal. 1937)

"The distinction between States with written and those

with unwritten constitutions is an illusionery basis of division." Examine this statement.

বিবৃতি—পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংবিধানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন। একটি লিখিত (written) ও অপরটি অ-লিখিত (unwritten)। লিখিত সংবিধানে প্রত্যেকটি বিষয়ই এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। সাধারণতঃ পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী একটি প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক ইহা রচিত হয়। বর্তমান যুগে ইংলণ্ড ছাড়া প্রায় সকল দেশেরই সংবিধান লিখিত।

অ-লিখিত সংবিধান কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী কোন পরিষদ কর্তৃক রচিত হয় না। ইহার নিয়ম-কানুনগুলি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করার কোন চেষ্টা হয় না। দেশের বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি ও বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির উপর ধারণা করিয়া ধীরে ধীরে ইহা গড়িয়া উঠে। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফল। যে-সব বিধিব্যবস্থা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, অলিখিত হইলেও লিখিত আইনের মতই সেগুলি কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডের সংবিধান এই অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমালোচনা—কিন্তু সংবিধানের এই শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞান-সম্মতও নয়। কোন সংবিধানই সম্পূর্ণরূপে লিখিত কিংবা সম্পূর্ণরূপে অলিখিত নয়। সব লিখিত সংবিধানেই কিছু অ-লিখিত অংশ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হইলেও বহু অ-লিখিত প্রথা বর্তমানের সংবিধানের অংশ রূপে গণ্য হইয়াছে। সংবিধানের লিখিত নির্দেশ অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবার কথা। কিন্তু প্রথানুসারে দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আবার, বিপরীত দিকে ইংলণ্ডের সংবিধান অ-লিখিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে অলিখিত নয়। ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ, ১৯১১ সালের পার্লামেন্টারী আইন প্রভৃতি বহু লিখিত অংশ এই অ-লিখিত সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য মূলগত নয়। কোন সংবিধানে লিখিত অংশ বেশি, আর কোনটাতে কম। পার্থক্য শুধু মাত্রাগত। আবার, লিখিত সংবিধান অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা ভাল এই ধারণারও কোন যৌক্তিকতা

নাই। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান অলিখিত হইলেও বহু লিখিত সংবিধানের রাষ্ট্র অপেক্ষা ইহার শাসন-ব্যবস্থা অনেক বেশি সুপরিচালিত।

গুণাগুণ: লিখিত সংবিধানে সব নিয়মকানুন স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্পষ্ট। লিখিত আকারে থাকে বলিয়া ইহা অলিখিত সংবিধানের তুলনায় অনেক বেশি স্থায়ী। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সংগে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। কোন সময় প্রয়োজন হইলেও সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এমন কি বিপ্লবেরও সৃষ্টি হয়।

লিখিত সংবিধানের দোষ অলিখিত সংবিধানের গুণ, আর তাহার গুণগুলি ইহার দোষ। অলিখিত সংবিধান অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সহজে পরিবর্তন করিয়া সময়োপযোগী করা যায়। কিন্তু অলিখিত বলিয়া ইহার নিয়ম-কানুনগুলি অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট মনে হয়। অতি সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার দায়িত্ব কম। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান একেবারেই অনুপযোগী বলিয়া লেখকগণ মনে করেন।

১৭

Q. 66. Distinguish between a rigid and a flexible constitution. What are their respective merits and demerits?

Are the constitutions of (a) U. S. A. (b) England and (c) India, rigid or flexible? (Cal. 1947)

Distinguish between a rigid and a flexible constitution. Are the constitutions of (a) U. S. A, (b) England and (c) India, rigid or flexible? (Cal. Degree Part I, 1963)

ভূমিকা: সংবিধানের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হওয়ায় লর্ড ব্রাইস সংবিধানকে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় (flexible) এবং অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় (rigid), এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সংবিধান সংশোধন-পদ্ধতির পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

বিবৃতি: দেশের সাধারণ আইনসমূহ যে ভাবে পরিবর্তন করা হয়, আইন-সভার দ্বারা ঠিক একই উপায়ে যদি সংবিধান পরিবর্তন করা হয়, তবে

সেই সংবিধানকে নমনীয় সংবিধান বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ আইন ও সংবিধানিক আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান এই নমনীয় সংবিধানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক রেলগাড়ীর ভাড়া সংক্রান্ত সাধারণ আইন যেভাবে পাশ করা হয়, ঠিক সেইভাবেই পার্লামেণ্ট কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠনের বিধিনিয়ম অর্থাৎ সংবিধানের একটি বিষয় মূল নির্ধারিত হইতে পারে।

যে সংবিধানের কোন পরিবর্তন বা সংশোধন আইনসভা কর্তৃক সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত পদ্ধতিতে করা যায় না, ইহার জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়, তাহাকে অ-নমনীয় সংবিধান বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এইরূপ অনমনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ে সাধারণ কোন আইনের সংশোধন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা, অর্থাৎ কংগ্রেসের উভয় সভা কর্তৃক সংখ্যাধিক্যে পাশ করিলেই চলে। কিন্তু সংবিধানের সামান্য কোন সংশোধন করিতে হইলেও ভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেসের দুই পরিষদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সংশোধনের প্রস্তাব সমর্থন প্রয়োজন, অথবা মোট পঞ্চাশটি অংগ-রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশকে এই সংশোধনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া তাহার সমর্থন প্রযোজন। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা অথবা সংশোধনের জন্য আহূত সভায় উপস্থিত তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সংখ্যা দ্বারা গৃহীত হইলে তবে সংশোধন কার্যকরী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধনের সংখ্যা বিচার করিলেই তাহার দুষ্পরিবর্তনীয়তা খুব ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। অদ্যাবধি মাত্র ২২বার সংশোধন কার্যকরী হইয়াছে; তাহার মধ্যে ১৭৯১ সালেই ১৫ বার সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহীত হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে বাকী ১২টি সংশোধন ১৬০ বৎসর সময়ের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

অবশ্য এই আলোচনা প্রসংগে ইহাও উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন যে প্রত্যেক দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানই সম্যকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে; তাহাদের মধ্যে মাত্রাভেদ আছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে অনেক দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কার্যতঃ সুপরিবর্তনীয়। যেমন সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান। কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যার সমর্থন ব্যতীত সংবিধানের সংশোধন সম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবে সোভিয়েট ব্যবস্থায় এই বিশেষ সদস্য

সংখ্যার সমর্থনের কোন মূল্য নাই। কারণ একদলীয় ব্যবস্থার ফলে এমন কি সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই সকল সদস্য একমত হইয়া থাকেন। তাহা ভিন্ন দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রত্যেক অধিবেশনেই সংবিধানের কোন না কোন অংশ সংশোধিত হইয়া থাকে। তাই দেখা যাইতেছে যে দুষ্পরিবর্তনীয় ব্যবস্থার মাত্রাভেদের এক অংশে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র অন্য অংশে সোবিয়েত ইউনিয়ন আর তাহাদের মধ্যবর্তী অবস্থায় রহিয়াছে ভারত ও অনুরূপ সংবিধানগুলি।

গুণাগুণ :—দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হইল ইহার স্পষ্টতা। জনসাধারণের অধিকারসমূহ এক সরকারের ক্ষমতা সীমা এই ধরনের সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত থাকায় সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের ন্যায় এখানে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ বা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা অনেক কম। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দুষ্পরিববর্তনীয় সংবিধান বেশী উপযোগী। কারণ জনসাধারণ যদি তাহাদের অধিকারসমূহ স্পষ্টভাবে না জানিতে পারে তবে তাহাদের রাজনৈতিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে না। ফলে গণতান্ত্রিক শাসন অচল হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে সংশোধন করা যায় না। ইহার প্রধান সুবিধা হইল এই যে সংবিধান একবার রচিত হইবার পর আর জনসাধারণের ভাবালুতা ইহাকে প্রভাবিত করিতে পারে না। ক্ষমতাসীন দলও ইচ্ছামত যখন তখন সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে না। ফলে জনসাধারণের অধিকারসমূহ সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ইচ্ছামত সংশোধন করা সম্ভব হওয়ায় জনসাধারণ তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে খুব বেশী নিঃসন্দেহ নহে।

তৃতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান জনসাধারণকে সর্বদা তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেয় বলিয়া জনসাধারণের রাজনৈতিক অভ্যাসগুলি সুস্পষ্টভাবে গঠিত হয়।

কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলী ইহাই প্রমাণিত করে না যে ইহা ক্রুটিহীন। ইহাতে যথেষ্ট ক্রুটি রহিয়াছে। ইহার অতি স্থায়িত্বই প্রধানতঃ ইহার দুর্বলতার কারণ হইয়া উঠে। সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের অধিকারবোধও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু

সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ায় সেই পরিবর্তন সংবিধানে প্রতিফলিত হইতে পারে না। ফলে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর সেই অসন্তোষ যদি অধিকদিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইবার সুযোগ পায় তবে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনকে সবসময়েই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংবিধানে গৃহীত হইবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটিই সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণ নির্দেশ করে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল প্রথার উদ্ভব হয় সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে শান্তিপূর্ণভাবে তাহা মানিয়া লয়। ইহার ফলে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সহজে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান যত সহজে বিপদমুক্ত হইতে পারে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পক্ষে তাহা সুবিধা-জনক। লর্ড ব্রাইস্ বলিয়াছেন, "বৃক্ষশাখাকে উত্তোলিত করিয়া যেমন যানবাহন চলাচলের সুবিধা দান করা যায় সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের কাঠামোকে তেমনি পরিবর্তন না তাহাকে কিছু পরিমাণে সংকুচিত করিয়া সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়।"

কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হইল তাহার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অভাব। এখানেও আমরা লর্ড ব্রাইসের উপমাকে অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে, এই সংবিধান যেন স্রোতস্বিনী নদী যাহাতে দুইবার অবগাহন করা যায় না। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে যেহেতু জনগণের অধিকার ও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সর্বদা পরিবর্তিত হইয়া থাকে সেই হেতু এখানে জন-সাধারণ সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করে। সাধারণ আইনের ন্যায় পরিবর্তন করা যায় বলিয়া এখানে প্রকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ জন-সাধারণ ভোগ করিতে পায়। ইংলণ্ডে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও পার্লামেন্টের বিভিন্ন আইন দ্বারা জনসাধারণের অধিকারগুলি রক্ষিত হইয়া থাকে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে জনসাধারণের মনে সংবিধান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে না। ফলে রাজনৈতিক অভ্যাসগুলিও গঠিত হয় না। নানাবিধ প্রথার প্রচলন থাকায় তাহাদের মাত্রাগত গুরুত্ব সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের এই সকল ত্রুটি থাকায় বর্তমানে সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করিবার প্রতি একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইতেছে।

সাম্প্রতিককালে যতগুলি সংবিধান রচিত হইয়াছে সবকয়টিই দুষ্পরিবর্তনীয়। ইংলণ্ডের সংবিধান একমাত্র সুপরিবর্তনীয় হইলেও সেখানেও বর্তমানে দুষ্পরিবর্তনীয়তা আরোপিত হইতেছে। অবশ্য ইংরেজজাতির রক্ষণশীলতাই সংবিধানিক নিয়মগুলিকে দুষ্পরিবর্তনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রসারের জন্যও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের সংবিধান নমনীয় না অনমনীয়ঃ ভারতের সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদে ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছিলেন, বৃটিশ সংবিধানের পরিবর্তনীয়তা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয়সাধন করিয়া ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করা হইয়াছে—ইহার কিছুটা সুপরিবর্তনীয় ও কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয়। ভারতের সংবিধান সংশোধন করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে।

প্রথমটিতে কতকগুলি ধারা (৩, ৫ ইত্যাদি ধারা) পার্লামেণ্টের সাধারণ সংখ্যাধিক্যে সংশোধিত হইতে পারে। অতএব এই অংশে ভারতীয় সংবিধান ব্রিটিশ সংবিধানের মত নমনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতির অন্তর্গত ধারাগুলি (যেমন মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারা) সংশোধন করিতে গেলে একটি বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যক। এইরূপ সংশোধন পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। এই দুই-তৃতীয়াংশ আবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত ও অনুপস্থিত মোট সদস্য-সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হওয়া চাই। তৃতীয়ত. কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, (রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি) এই সংশোধন গ্রহণ করিতে হইলে রাজ্য আইনসভাগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের অনুমোদন আবশ্যক। এক্ষেত্রে সুতরাং, সংবিধান সংশোধনের জন্য সাধারণ আইন সংশোধনের নিয়ম অপেক্ষা ভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া ভারতের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। অতএব প্রথম পদ্ধতির সংশোধন প্রমাণ করে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত ব্রিটিশ সাংবিধানিক সুপরিবর্তনীয়তা গ্রহণ করিয়াছে, তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রায় মার্কিন দুষ্পরিবর্তনীয়তার নিকটবর্তী হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই দুই চরম পন্থার মধ্যবর্তী এক ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে।

Q. 67. "An American writer has said that the constitution of the U.S.A. is more flexible than the British one". How would you justify this viewpoint ?

(Cal. 1951)

[ইংগিত : ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তরের অনুসরণে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এবং এই প্রসংগে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানরূপে ইংলণ্ডের সংবিধান ও দুষ্পরিবর্তনীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া নিম্নের আলোচনা যোগ করিতে হইবে।]

সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি অনুসারে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, ইংলণ্ডের সংবিধান অত্যন্ত সুপরিবর্তনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান খুব বেশি পরিমাণে দুষ্পরিবর্তনীয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ইংলণ্ডের সংবিধান অপেক্ষা অনেক বেশি নমনীয় সুপরিবর্তনীয়।

নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করা খুবই কঠিন। এই কারণে দেখা যায়, ১৭৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হইবার পর হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র ২২ বার ইহার আনুষ্ঠানিক সংশোধন হইয়াছে। তথাপি এই সংবিধানে এত ব্যাপক পরিবর্তন হইয়াছে যে অনেক ক্ষেত্রেই ইহাকে আর পূর্বের সংবিধান বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। ইহা কিরূপে হইল ?

বিভিন্ন প্রথার প্রভাবে ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা এই বিপুল পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়াই রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন, ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন এত সহজে ও প্রয়োজনকালে এত দ্রুত সম্ভব হইয়াছে যে ইহাকে কার্যতঃ খুবই সুপরির্তনীয় বলিয়া মনে হইবে। সুপ্রীম কোর্টের হাতে সংবিধান ব্যাখ্যার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার বলে এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতার (implied powers) ধারণাবলে বিচারকগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রায়ই সংবিধানের পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার পরিবর্তন ঘটাইতেছেন এবং প্রকৃত পক্ষে সংবিধানকে সংশোধন করিতেছেন।

অপরদিকে ইংলণ্ডে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি খুব সহজ হওয়া সত্ত্বেও

সহসা সেখানে কোন সংশোধন হয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও ও ইংলণ্ডের অধিবাসিদের রক্ষণশীলতাই ইহার কারণ। সম্প্রতি লর্ডসভার সদস্যদের লর্ড পদ ত্যাগ করিয়া কমন্স সভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টার পর ইহা সম্ভব হইয়াছে।

এই কারণেই বলা চলে, যে-ভাবে সংবিধানের ব্যবহার হইতেছে তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বর্তমানে ইংলণ্ডের সংবিধান অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সুপরিবর্তনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। আইনের ভাষা সংবিধানের প্রকৃত চরিত্র অনেক সময়ে সম্যকরূপে প্রকাশ করে না। ব্যবহারিক জীবন দ্বারাই সংবিধানের মূল চরিত্র প্রকাশ পায়।

রাষ্ট্র ও সরকারের রূপ

FORMS OF STATE AND GOVERNMENT

Q. 68. Criticise Aristotle's classification of States.

Do you agree with the view that Aristotelian classification of states is unsuited to the facts of modern political organisation ?

ভূমিকা—অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা চলিতেছে। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল তাঁহার "রাষ্ট্রনীতি" গ্রন্থে রাষ্ট্রের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিবৃতি—তিনি প্রধানত দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রগুলিকে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমত, রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যাদ্বারা। একজন লোকের হাতে এই ক্ষমতা থাকিলে তাহা রাজতন্ত্র (Monarchy), কিছু সংখ্যক লোকের হাতে থাকিলে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), এবং সকল লোকের হাতে থাকিলে গণতন্ত্র (Democracy)। দ্বিতীয়ত, কোন্ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে ? সকলের কল্যাণ যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা 'স্বাভাবিক' আর একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে তাহা 'বিকৃত'। এই বিচারে একজনের শাসনে স্বাভাবিক রূপ রাজতন্ত্র, আর বিকৃতরূপ স্বৈরতন্ত্র (Tyranny), কিছু সংখ্যক ব্যক্তির শাসনে স্বাভাবিক অভিজাততন্ত্র আর বিকৃত ধনিকতন্ত্র (Oligarchy); এবং সকল লোকের শাসনে স্বাভাবিক অবস্থা গণতন্ত্র (Polity) ও ইহার বিকৃত রূপ জনতাতন্ত্র (Democracy)।

অ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যায়—

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃতি
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কিছু সংখ্যক ব্যক্তি	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
সকল লোক অর্থাৎ, বহু লোক)	গণতন্ত্র	জনতাতন্ত্র

সমালোচনা—অ্যারিষ্টটলের এই শ্রেণীবিভাগের অনেক সমালোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান : (১) অ্যারিষ্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই। আসলে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। (২) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর দিক হইতে তিনি রাষ্ট্রগুলিকে যেভাবে ভাগ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবে সম্ভব নহে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রে ঠিক কোন স্থানে সার্বভৌমত্বের অবস্থান, তাহা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। একজন বা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রায় কোথাও নাই বলিলেই চলে। (৩) অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিছু লোকের শাসন ও বহু লোকের শাসনের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা কোথায় টানা হইবে? (৪) বর্তমানে এমন অনেক রাষ্ট্র দেখা যায়, যেখানে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডের নাম করা যায়। অ্যারিষ্টটলের দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব ব্যাপার। (৫) অ্যারিষ্টটল যেভাবে স্বাভাবিক ও বিকৃত, এই দুইভাগে রাষ্ট্রকে ভাগ করিয়াছেন, তাহাও অবাস্তব।

উপসংহার—অ্যারিষ্টটল প্রাচীনকালের "নগররাষ্ট্রের" রূপের সহিতই পরিচিত ছিলেন। উক্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই তিনি এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালের বৃহৎ রাষ্ট্রের রূপ তাঁহার জানা ছিল না। এখনকার রাষ্ট্রের রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই কারণেই অ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগের সাহায্যে আর বর্তমানে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয় না।

তবে বার্কারের মতে, যে নীতিবোধের উপর ভিত্তি করিয়া অর্থাৎ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অ্যারিষ্টটল এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন, তাহা আজও একেবারে অচল হইয়া যায় নাই। আমরা যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র পুলিশ রাষ্ট্র, যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করি তখন আসলে অ্যারিষ্টটলের নীতিকেই অনুসরণ করি।

Q. 69. On what principles states should be classified ? How would you classify forms of Governments ?

(Cal. 1951)

ভূমিকা—রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে অ্যারিষ্টটলের সূত্র বর্তমান লেখকগণ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা ভিন্নভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই লেখকদের মধ্যে মন্টেস্কু, ম্যারিয়ট ও লীককের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিবৃতি ঃ মণ্টেস্কু্য রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র (Republics), রাজতন্ত্র (Monarchies) ও স্বৈরতন্ত্র (Despotism), এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রজাতন্ত্রে জনগণ দেশ শাসন করে। রাজতন্ত্রে একজন ব্যক্তি নিদিষ্ট আইন অনুসারে দেশ শাসন করে। আর স্বৈরতন্ত্রে একজন লোক তাহার খেয়াল-খুসীমত শাসন চালাইয়া যায়। ইহার পর ব্লুণ্টস্লি যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই তিনটি ভাগ গ্রহণ করিয়া ইহার অতিরিক্ত আর একটি রাষ্ট্রের রূপের কথা বলিয়াছেন। তাহা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (Theocracy)। যে সব রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ঈশ্বর বা কোন অলৌকিক শক্তির হাতে রহিয়াছে তাহা এইরূপ রাষ্ট্র। কিন্তু ইহা অবাস্তব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করে না।

ম্যারিয়ট রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথমত, ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে তিনি এককেন্দ্রিক (Unitary) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal), এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। সমস্ত শাসন ক্ষমতা একটি মাত্র সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকিলে তাহা এককেন্দ্রিক, আর একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কয়েকটি আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টন করা হইলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয়।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি অনুসারে নমনীয় ও অনমনীয়, এই দুইভাগে রাষ্ট্রকে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ আইনের ন্যায় একইভাবে সংবিধান সংশোধন করা হইলে, তাহা নমনীয়। আর, বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা এই সংশোধন করিতে হইলে তাহা অনমনীয়।

তৃতীয়ত, শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের সম্পর্ক অনুসারে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রপতি শাসিত ও পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। শাসনবিভাগ আইনবিভাগের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতি শাসিত। আর শাসনবিভাগ তাহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকিলে তাহা পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন-ব্যবস্থা।

লীকক যেভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। তিনি প্রথমত রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাচারী ও গণতান্ত্রিক, এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একজনের দ্বারা তাহার খুসীমত শাসন পরিচালিত হইলে তাহা স্বেচ্ছাচারী শাসন। আর জনগণ শাসনের অধিকারী হইলে তাহা গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে তিনি প্রত্যক্ষ

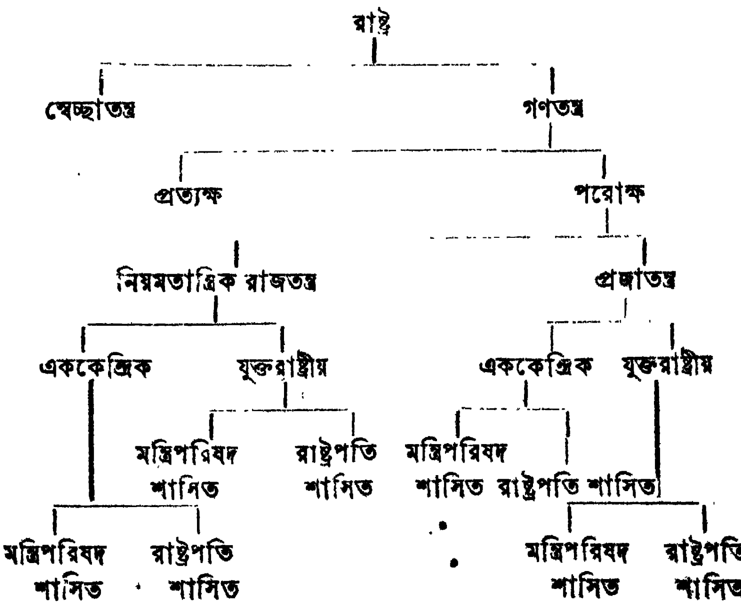
ও পরোক্ষ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সকল লোক এক স্থানে মিলিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে দেশ শাসন করিলে তাহা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন করিলে তাহা পরোক্ষ গণতন্ত্র।

পরোক্ষ গণতন্ত্রকে আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপ্রধান রূপে একজন রাজা থাকিলেও প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকিলে তাহা গণতন্ত্র; এইরূপ শাসন ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়। প্রজাতন্ত্রে বংশানুক্রমিক কোন-রাজা থাকেন না, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হন।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, উভয় রাষ্ট্রকেই কেন্দ্রের সহিত আঞ্চলিক সরকারের সম্পর্ক অনুসারে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সকল ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিলে তাহা এককেন্দ্রিক। আর সংবিধান দ্বারা ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত করা হইলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয়।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, এই উভয় প্রকার রাষ্ট্রই আবার রাষ্ট্রপতিশাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত হইতে পারে। শাসনবিভাগ আইনবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র হইলে তাহা রাষ্ট্রপতি শাসিত। আর, শাসনবিভাগ আইনবিভাগের নিকট দায়ী থাকিলে তাহা পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত।

লীকক তাঁহার শ্রেণীবিভাগকে নিম্নরূপ ছকে প্রকাশ করিয়াছেন—



[ইংগিত—রাষ্ট্র ও সরকার এক নহে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সরকারের শ্রেণীবিভাগ হইতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নরূপ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি দেখা গিয়াছে, সরকারের শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, অন্যভাবে নহে। রাষ্ট্রে যে সরকার আছে, তাহার বৈশিষ্ট্য অনুসারেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ একইরূপ।]

Q. 70. Discuss the merits and demerits of the Monarchical form of Government.

ভূমিকা—সরকারের প্রাচীনতম রূপগুলির মধ্যে রাজতন্ত্র অন্যতম প্রধান। অ্যারিষ্টটলের মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা, ইহার বিকৃত রূপের নাম স্বৈরতন্ত্র। এখনও বিভিন্নরূপে ইংলণ্ড, নেপাল, আফগানিস্থান, ইথিওপিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে।

বিবৃতি—যে শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা বংশানুক্রমিক সূত্রে এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। জন্মগত উত্তরাধিকার-সূত্রে একজন রাজা এই শাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন।

বর্তমানে রাজতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—(১) অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ও (২) নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)। অবাধ রাজতন্ত্রে রাজা কেবল নামে নয়, কাজেও রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। এই শাসন-ব্যবস্থার পরিচালন-কার্যে শাসিতের কোন স্থান নাই। ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুই-এর উক্তি হইতে এই প্রকৃত রাজতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র।" এই শাসনব্যবস্থায় রাজা ও রাষ্ট্রে কোন পার্থক্য থাকে না। রাশিয়ায় জারের শাসনও ইহার উদাহরণ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা নামেই কেবল শাসক, সংবিধানের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই কার্যত শাসন পরিচালনা করেন। ইংলণ্ড এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানকালে এইরূপ রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় না।

সমালোচনা—রাজতন্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত রাজতন্ত্র বলিতে

অবাধ রাজতন্ত্রকে বিবেচনা করিতে হইবে। ইহার যেমন কতকগুলি গুণ আছে, সেইরূপ দোষও আছে।

গুণ ঃ রাজতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল, রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে থাকে বলিয়া শাসনকার্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রজাবৎসল রাজা প্রজাদের বহু মংগলসাধন করিতে পারেন। রাজা সকল দলাদলি ও বাদ-বিসম্বাদের উর্ধ্বে থাকিয়া সকলের প্রতি নিরপেক্ষভাবে সমান দৃষ্টি দিতে পারেন। গণতন্ত্রের দলীয় শাসন ব্যবস্থায় এক পক্ষের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে অপর পক্ষ এইরূপ সমবিচার নাও পাইতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজার প্রভাবে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে শেখে।

ত্রুটি ঃ কিন্তু এই সব গুণ সত্ত্বেও ইহার অনেক দোষ রহিয়াছে। ইতিহাস প্রমাণ করে, অশোক বা আকবর, অথবা ইংলণ্ডের-এলিজাবেথ বা রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটের ন্যায় রাজা-রাণী খুব কমই দেখা গিয়াছে। অত্যাচারী স্বার্থপর রাজার সংখ্যাই বেশি। তাহাদের খেয়াল-খুশীতে জনগণের অশেষ দুর্গতি হইয়াছে। বংশানুক্রমিক প্রথা অনুসরণের ফলে ভাল রাজা হইবেই এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

দ্বিতীয়ত, শাসনকার্যে প্রজাসাধারণের কোন অধিকার না থাকার ফলে তাহাদের মধ্যে সাম্য ও স্বাধীনতা বিস্তারলাভ করিতে পারে না। উদ্যোগের অভাবে তাহাদের প্রতিভা নষ্ট হয়। শাসনকার্যের সহিত তাহারা সহযোগিতা করার উৎসাহও বোধ করে না। ইহার ফলে সু-নাগরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে না। এই কারণেই রাজা বিজ্ঞ ও সুদক্ষ হইলেও রাজতন্ত্র সমর্থনযোগ্য নহে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

DEMOCRACY AND DICTATORSHIP

Q. 71. Explain clearly what do you understand by democracy. **(Cal. 1936)**

সংজ্ঞা ঃ গ্রীক শব্দ "Demos" হইতে "Democracy" কথাটি আসিয়াছে। 'Demos' শব্দটির অর্থ জনসাধারণ। 'Democracy' বা গণতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের শাসন। যে শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা একটি ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে না থাকিয়া রাষ্ট্রের জনসাধারণের আয়ত্তাধীন থাকে তাহাকেই গণতান্ত্রিক শাসন বলে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের (Lincoln) সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণতন্ত্র হইতেছে "জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার" ("the Government of the people, by the people and for the people".)

বিবৃতি ঃ অ্যারিষ্টটল হইতে সুরু করিয়া আধুনিক লেখকগণ বিভিন্নভাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধ্যাপক ডাইসি বলেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে সমগ্র জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ শাসক। লর্ড ব্রাইসের মতে, গণতন্ত্রে শাসন কর্তৃত্ব কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া হয় না, ইহা দেওয়া হয় সমগ্রভাবে সমাজের সদস্যদের হাতে। অধ্যাপক সিলির মতে গণতন্ত্র হইতেছে এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেরই অংশ আছে। বার্ণসের মতে, আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজে সকল মানুষ সমান ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রত্যেকেই সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্য দিয়া দেখা গেল যে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রকে এক ধরণের শাসনব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, শাসনতন্ত্রকে বিশেষ এক শাসনব্যবস্থা হিসাবে বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে ইহার অর্থকে সংকুচিত করা হয় এবং মৌলিক আদর্শের প্রতিও অবিচার করা হয়। কারণ গণতন্ত্র হইতেছে একটি নৈতিক আদর্শ। বিভিন্ন লেখক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক গণতন্ত্র ইত্যাদির ধারণা প্রকাশ ও প্রচার

করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহাদের কোনটিই বিচ্ছিন্ন নহে সব কয়টিই একটি মৌলিক আদর্শের সহিত জড়িত। গণতন্ত্রের সেই মৌলিক আদর্শ হইতেছে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষের সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার রহিয়াছে এবং ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বিলুপ্ত করা হইয়াছে। যদি কোন দেশে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গণতন্ত্র না থাকে তবে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কোনরূপেই সফল হইতে পারে না। কোন সমাজ যদি ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচে বিভক্ত হয় তবে সেখানে প্রকৃত রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভবপর হয় না। তেমনি কোন সমাজে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করে না। গণতন্ত্র তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে যখন সকলে সামাজিক মর্যাদা লইয়া খানিকটা অন্তত অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারী হইয়া রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিবে।

Q. 72. Distinguish between direct and indirect democracy. (Cal. 1948)

গণতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক একত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করে। কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্রে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা তাহাদের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এইজন্য ইহাকে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থাও (Representative Government) বলা হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ঃ প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। একটি স্থানে সকল নাগরিক মিলিত হইয়া পররাষ্ট্র নীতি, যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের বিষয়, আয়-ব্যয়ের হিসাব, আইন-প্রণয়ন এমনকি বিচার বিষয়ক কার্যাদিও সম্পাদন করিত। রাষ্ট্রসংক্রান্ত যাহা কিছু করণীয় তাহার সবই নাগরিকগণ এইভাবে নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে করিত। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ শাসন সম্ভব হইলেও, আধুনিক কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা মোটেই সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নাগরিক একটি উন্মুক্ত স্থানে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রশাসনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না। এই কারণে, ক্রমশ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে

সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে (Canton) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন রহিয়াছে।

পরোক্ষ গণতন্ত্র ঃ পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া জনষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, ইহা হইল এমন শাসন-ব্যবস্থা যেখানে সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণের ভোটে আইনসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার জন্য তাহারা আইন প্রণয়ন করেন। পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রধানগণ অর্থাৎ মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনে শাসন-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা জনসাধারণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন বলিয়া তাহাদের স্বেচ্ছাচারী হইবার বা জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করিবার বিশেষ আশংকা থাকে না। কারণ এইরূপ করিলে তাহাদের পুনরায় নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

পুনর্নির্বাচনে জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা জানা সত্ত্বেও অনেক সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক রাখে না এবং তাহাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ইহাতে জনগণের শাসন হিসাবে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative) ও পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতির ব্যবস্থা কোন কোন রাষ্ট্রে করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, শক্তিশালী জনমতের দ্বারা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনে পরিণত করা সম্ভব।

Q. 73. In what respects modern democracy differs from the ancient democracy ?

ভূমিকা—গণতন্ত্রের ধারণা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন এথেন্স ও রোমে যে শাসন প্রচলিত ছিল তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাচীন গণতন্ত্রের সহিত আধুনিক গণতন্ত্রের পার্থক্যগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ :

পার্থক্য ঃ (১) প্রাচীনকালে গণতান্ত্রিক শাসন ছিল প্রত্যক্ষ ; সকলেই রাষ্ট্রশাসনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্র পরোক্ষ অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক—জনসাধারণের পরিবর্তে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন করেন।

(২) প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল মানুষের ভাগ্যে সমানাধিকার জুটিত না। নাগরিকরাই কেবল রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। ইহা ভিন্ন যে সব ক্রীতদাস ছিল, তাহাদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। এক এথেন্স শহরেই যেখানে নাগরিক সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ সেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০। বর্তমান গণতন্ত্রে রাষ্ট্রশাসনের অধিকার এইরূপ সীমাবদ্ধ নহে, ইহা সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত। সমাজের বৃহৎ এক অংশকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

(৩) প্রাচীন গণতন্ত্রে প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

(৪) প্রাচীন গণতান্ত্রিক শাসনে আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য নির্বাহ ও বিচার পরিচালনা বিভাগগুলিকে পৃথক করা হইত না, কিন্তু বর্তমানে কিছুটা পরিমাণে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(৫) দল ব্যবস্থা বর্তমানে গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু প্রাচীনকালে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না।

(৬) বর্তমান গণতন্ত্র রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত। নাগরিকের অধিকার রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু প্রাচীন গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে সর্বব্যাপক বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং নাগরিকের নিজস্ব অস্তিত্ব ও অধিকারকে স্বীকার করা হইত না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রাচীন গণতন্ত্রে কল্পনার অতীত ছিল।

উপসংহার ঃ এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও প্রাচীন গণতন্ত্রের সহিত আধুনিক গণতন্ত্রের মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্র-শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়।

Q. 74. What are the cardinal features of Democracy ? How far are these present in the U. S. A. and India ?

(C. U. B. A. 1953)

What are the conditions required for the successful operation of a Democracy ?

(C. U. B. A. 1955, Degree Part I, '62)

ভূমিকা—বিশেষ কোন একটি শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সাংবিধানিক নিয়মকানুনই যথেষ্ট। যদি সেই নিয়মকানুনের যথাযথ রূপায়ন হয় তবে সেই ধরণের শাসনব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকরী হইবে। একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র হইল এইপ্রকার বিশেষ এক একটি শাসনব্যবস্থা। কিন্তু গণতন্ত্র সেইরকম কোন শাসনব্যবস্থা মাত্র নহে। ইহার অর্থ আরও ব্যাপক। গণতন্ত্র হইল একটি সামাজিক আদর্শ যাহা আবার নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেই আদর্শকে সফল করিতে হইলে কতকগুলি সাংবিধানিক বিধিনিয়ম যথেষ্ট নহে ; আরও কতকগুলি সর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখ করা উচিত যে কোন সামাজিক আদর্শ গণিত শাস্ত্রের সমস্যা নহে যে বিশেষ কতকগুলি সর্ত পালিত হইলেই লক্ষ্যে পৌছান যাইবে। এই আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নানাবিধ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু এই জটিল সামাজিক অবস্থার সবকয়টি দিক আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নহে, তাই প্রধান কয়েকটি সর্তের কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি। এই সর্তগুলি পালনের উপর গণতন্ত্রের সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে।

১। গণতান্ত্রিক পরিবেশ—প্রথমেই গণতান্ত্রিক পরিবেশের কথা উল্লেখ করিতে হয়। যে সামাজিক পরিবেশে সকল নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে সক্ষম হয় তাহাকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বলা হয়। প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ভিত্তিতেই এই সুযোগ প্রদান করা সম্ভব।

২। সদাসতর্ক মনোভাব—গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠন করিতে হইলে প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা। নাগরিকদের সর্বদা রাষ্ট্রের বিষয়ে সজাগ থাকিতে হইবে। কারণ 'সদা সজাগ থাকাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য'।

রাষ্ট্রের কাজে নাগরিকরা কোন উৎসাহ বোধ না করিলে শাসনকার্যে সকলের যোগদান সম্ভব হইবে না, এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির খেয়াল খুশীমত তাহা চলিবে। লর্ড ব্রাইস "সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক" বিষয়ে আলোচনায় বলিয়াছেন, উদ্যমহীনতা ও উৎসাহের অভাব সুনাগরিক হইবার পথে প্রধান অন্তরায়। জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বদা সজাগ থাকিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

৩। শিক্ষা—কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষা ভিন্ন এই ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহ কোন প্রকারেই সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। অতএব শিক্ষার ব্যাপকতা গণতন্ত্রের কৃতকার্যতার জন্য আবশ্যক। সম্যক শিক্ষা ব্যতীত শাসনসংক্রান্ত জটিল সমস্যাগুলি অনুধাবন করা কঠিন। গণতন্ত্রে সেইজন্য প্রত্যেক বালক-বালিকাকে তাহার বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিতে হইবে। শিক্ষার মধ্য দিয়া নাগরিকের চরিত্র গঠিত হইবে এবং তাহারা অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে।

৪। লিখিত সংবিধান—গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল লিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব। সংবিধানে যেমন আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের কার্য সুনির্দিষ্ট থাকে নাগরিকের অধিকারগুলিও তেমনি স্পষ্টত লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে আইনবিভাগ বা শাসন বিভাগ নাগরিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে না যাহার সম্ভাবনা অলিখিত সংবিধানে অত্যন্ত বেশি। অবশ্য এই প্রসংগে ইংলণ্ডের অলিখিত সংবিধানের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ ইংলণ্ডে অলিখিত সংবিধান থাকা সত্ত্বেও সেখানকার জনসাধারণ পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন দেশ অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। শাসন বিভাগ নাগরিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ইহার কারণ হইল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংগে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায় সেখানে সরকার জনসাধারণের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপে সাহসী হয় না।

৫। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য—গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংগে পরিচয় না থাকিলে কোন দেশের উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন এই ব্যবস্থা ভাঙিয়া

দিয়া একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন তখন জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ বাধা দেয় নাই। কারণ আবহমান কাল যাবৎ রাজতন্ত্রে অভ্যস্ত জার্মানীরা গণতন্ত্রের মূল্যায়নে সক্ষম ছিল না। এমনকি বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে গণতন্ত্র নাই তাহার কারণও অনুরূপভাবে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। রাশিয়াবাসী অতীতেও জানিত না, বর্তমানেও জানে না প্রকৃত গণতন্ত্র কি। ফলে তাহারা গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান হইতে পারে নাই।

৬। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য—রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্রে যদি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অত্যন্ত বেশী পার্থক্য থাকে তবে সেই রাষ্ট্রে ধনীরা অধিকাংশের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ন্যায়বোধ ব্যাহত হয়। দরিদ্রেরা সর্বদা পেটের চিন্তায় অস্থির; সার্বজনিন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার মত সময় ও সামর্থ্য তাহাদের থাকে না। যে সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রবল সেখানে সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তন করিলেও একে অপরের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হয় না। ভারতে কোন কোন স্থান, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ধরণের জাতি এবং বর্ণভেদ অতি মাত্রায় বিদ্যমান। তাই সেখানে গণতন্ত্রের বুলি আছে কিন্তু যে গণতন্ত্র মানুষকে তাহার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা অনুপস্থিত। সাম্প্রতিককালে অবশ্য এই জাতি-ধর্ম বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এই সকল স্থানে আন্দোলন শুরু হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও ইংলণ্ড গণতন্ত্রের মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। সংখ্যালঘুর অধিকার—পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া শাসন পরিচালনাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বলা হয়। প্রত্যেকটি লোকের নিজের ইচ্ছামত মত প্রকাশ করিবার ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা অবশ্যই শাসন পরিচালনা করিবে; কিন্তু সংখ্যালঘুরাও যাহাতে সকল অধিকার ভোগ করিতে পারে সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুরা সব সময়েই যেন বিনা বাধায় সরকারের দোষত্রুটি দেখাইবার সুবিধা লাভ করেন। পরমত অসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রকে বিফলতার দিকে লইয়া যায়।

৮। বিবর্তন প্রয়োজন, বিপ্লব নহে—প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যাঁহারা

তাঁহারা বিপ্লবের দ্বারা আমূল পরিবর্তন করিতে চাহেন না; জনমত গঠন করিয়া ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তনের পক্ষপাতী। তাড়াতাড়ি করিলেই ভুল ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। তাহাছাড়া গায়ের জোরে কাহাকেও নত করিলে, সে সুযোগ পাইলেই প্রতিশোধ লয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, হিংসার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

ইহা ভিন্ন প্রয়োজন সাধু ও সুনিপুণ নেতার নেতৃত্বে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের সততা ও দক্ষতার সহিত কার্যপরিচালনা। দেশে যদি ঘন ঘন নেতার পরিবর্তন হয় এবং সরকারী কর্মচারীরা অসাধু ও অক্ষম হন তবে মহান এই আদর্শের বিফলতা অনিবার্য।

ভারতে গণতন্ত্র—"বাঁচ এবং বাঁচাও" গণতন্ত্রের এই যে মূল নীতি, ভারত বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাতে দীক্ষিত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বীজমন্ত্র হইল পরমত সহিষ্ণুতা। নানা ঝড় ঝঞ্ঝা ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে কিন্তু মূল আদর্শ থেকে তাহাকে কোনদিন বিচ্যুত করিতে পারে নাই। অনেক ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভারত সভ্যতার সেই সংকটকে কাটাইয়া উঠিয়াছে। তবে বিদেশী শাসকের বিভেদমূলক নীতি আমাদের সভ্যতাকে একবারে যে স্পর্শ করিতে পারে নাই এখন কথা বলা চলে না। সভ্যতাকে নষ্ট করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে কিছুটা ক্ষত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। তাই স্বাধীনতা লাভের উত্তরকালে ভারতে যখন গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয় তখন নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। তবু আজও ভারত গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অবিচল থাকিয়া সেইসকল অন্তরায়কে দূর করিবার জন্য দৃঢ় সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।

ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণাংগ রূপায়নের প্রধান বাধা হইল অজ্ঞাত এবং, দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যজনিত বিভিন্ন সংকীর্ণতা। এখানে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ ও অক্ষরজ্ঞানবর্জিত। ফলে সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইলেও বিচার বিবেচনার সহিত ভোট দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, এখানে অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং, অনেকলোক নিরন্ন ও বেকার। এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে সর্বজনিন উন্নয়নের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। তৃতীয়ত, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা হেতু এখানকার লোকেদের জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও আঞ্চলিক আনুগত্য প্রবল।* ভাষার কলহে দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটিয়া থাকে। উহার মূলে আছে চাকুরী ও সরকারী কাজের লোভ।

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইলেও ধর্মের নামে ঝগড়াদ্বন্দ্বও এখানে কম হয় না। নির্বাচনের সময় তো বটেই মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ও জাতি ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে কিছু লোকের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখান হয়।

কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও ভারতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিনা রক্তপাতে সমস্ত প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব হয় নাই। যুগযুগান্তর সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া শাসনতান্ত্রিক ভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জনের নীতি গৃহীত হইয়াছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পুরুষের একপত্নীত্ব ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে চিরকালের বৈষম্য দূর করা হইয়াছে। জাতি, ভাষা বা ধর্মীও বিরোধ থাকিলেও জাতির বিপদের দিনে যে তাহা মুছিয়া যায় কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের কালে তাহা ভারতবাসী প্রমাণ করিয়াছে।

বহুদিন যাবৎ একটি মাত্র দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় অনেকে মনে করেন যে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু অন্য কোন দল গঠনের এখানে বাধা দেওয়া হয় না বা সরকারের নিন্দা করা দণ্ডনীয় নহে। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু যতক্ষণ অন্য কোন দল বিকল্প সরকার গঠনের শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত এদেশে পূর্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে বলা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র—শাসন ব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। কারণ সেখানকার অধিবাসীরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে পারে ও স্বেচ্ছামূলক সংঘ গঠন করিতে পারে; ইহা ভিন্ন রহিয়াছে সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার যাহাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান মাপকাঠি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই গণতন্ত্রের পূর্ণাংগ রূপে নহে, ইহার সংগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্য যুক্ত হইয়া গণতন্ত্রকে পূর্ণতা দান করে। সেখানে গণতন্ত্রের এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য দুইটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। সেখানে ভারতের ন্যায় দারিদ্র্য নাই সত্য, কিন্তু সেই সংগে ইহাও অসত্য নহে যে ধনের অসম বণ্টন রহিয়াছে। তাহাছাড়া, উৎপাদনের মালিকানায় শ্রমিকের কোন অংশ নাই। তাহারা মজুরী ভোগী শ্রমিক

মাত্র। সমস্ত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হস্তে রহিয়াছে। আমেরিকায় সামাজিক সাম্যও যে নাই তাহা সেখানকার বর্ণবৈষম্যও নীতি হইতেই স্পষ্টত অনুধাবন করা যায়। রাজনৈতিক সাম্যের বুলি থাকিলেও সেখানে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিরা শ্বেতকায় ব্যক্তিদের ন্যায় সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্ত হয় না। শ্বেতকায় কর্তৃক কৃষ্ণকায়ের নির্যাতন এখনও দৈনন্দিন ঘটনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহারা সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের প্রভাবেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। রাজনৈতিক সাম্যের বুলি কার্যকরী হইতেছে না। তবে ইহা আনন্দের বিষয় যে বর্তমানে এই ধরণের বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের জন্য কিছুকিছু আন্দোলন শুরু হইয়াছে। এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিবে।

Q. 75. Estimate the strength and weakness of democracy as a form of Government. Do you think that democracy will survive ? (Cal. 1943, '48, '49, '55)

ভূমিকা: গণতন্ত্রের গুণাগুণ লইয়া বিতর্ক আজ নূতন নহে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ইতিহাস ইহার সমর্থক ও বিরুদ্ধ সমালোচকদের দীর্ঘ আলোচনায় পরিপূর্ণ। অ্যারিষ্টটল হইতে সুরু করিয়া বেন্থাম, জেমস মিল, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার এবং আধুনিককালের বার্কার, ল্যাস্কি, ম্যাকাইভার প্রভৃতি যেমন ইহার সপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, অপর দিকে স্যার হেনরী মেইন, লেকি প্রভৃতি ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(১) গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি—গণতান্ত্রিক শাসন হইল অজ্ঞলোকের শাসন। মেইন, লেকী, ফ্যাগুইট প্রমুখ চিন্তাবীদরা মনে করেন যে গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ফলে সমাজে গুণীব্যক্তিরা অবহেলিত হইবেন এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে। কারণ জনসাধারণের মধ্যে কেহ কেহ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। তাহাদের নিকট ভালমন্দের কোন প্রভেদ নাই।

(২) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে রাষ্ট্রনীতিতে লাগামহীন ভাবালুতা প্রশ্রয় পাইবে। কারণ 'জন-মন' একান্তভাবে ভাবপ্রবণ—যুক্তির কোন স্থান নাই সেখানে। যে সকল সমস্যার যুক্তি তর্কের দ্বারা

সমাধান হওয়া উচিত গণতন্ত্রে তাহা ভাবালুতা দ্বারা বিকৃত হইবে ও সামাজিক প্রগতি ব্যাহত হইবে।

(৩) কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সামাজিক প্রগতিকে অব্যাহত রাখেন। লে বোঁ বলেন যে, অভিজাত শুধুই কেবলমাত্র প্রগতির পথ নির্দেশ করিতে পারে।

(৪) সাম্প্রতিককালের ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যাবলীর সমাধান কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশেষজ্ঞের কোন স্থান না থাকায় কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব হয় না।

(৫) গণতন্ত্রে প্রকৃত নেতৃত্বের বিকাশ সম্ভব নহে। যে সকল ব্যক্তি জনসাধারণের মন রাখিয়া কাজ করে তাহারাই নেতার স্থান লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রতিভাবান ব্যক্তি সমাজের উন্নতির জন্য কোন কাজ করিতে পারেন না। অধ্যাপক ক্র্যাম বলেন যে দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি কোন ক্ষেত্রেই বর্তমান নেতৃবর্গ পুরাতন নেতৃবর্গের সমতুল নহেন।

(৬) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ভিন্ন কার্যকরী হয় না। গণতান্ত্রিক শাসন হইল কোন একটি দলের শাসন। কিন্তু দলব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে সামাজিক কল্যাণ অন্তর্হিত হইয়া দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই দলগুলি জনসাধারণের ভাবপ্রবণতার সুযোগ লইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

(৭) গণতন্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হইল নির্বাচনে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয়। যে সকল প্রার্থী প্রচুর অর্থের মালিক তাহারা নির্বাচনে দারিদ্র্য পরাজিত করিয়া সহজেই সুযোগ লইয়া নির্বাচিত হয়। অর্থই এখানে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে, প্রতিভা নহে। সুতরাং গণতন্ত্র হইল ধনের শাসন, জনগণের নহে।

(৮) অর্থ এখানে আইনপ্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থাকেও অসাধু করিয়া তোলে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধনিক সম্প্রদায় অর্থব্যয় করিয়া আইনপ্রণয়ন ও শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। দেশের পক্ষে যত ভালই হউক না কেন নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল হইলে কোন বিশেষ আইন তাহারা বিধিবদ্ধ করিতে বাধা দান করে।

(৯) গণতান্ত্রিক শাসন অত্যন্ত মন্থর। জরুরী অবস্থায় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু গণতন্ত্রে তাহা সম্ভব নহে। তাই যুদ্ধ

বাধিলে গণতন্ত্রকে হয় পতন আর না হয় স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিষিদ্ধকরণ মানিয়া লইতে হয়।

(১০) গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষণস্থায়ী। এখানে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয় ও নূতন নেতা পুরাতন নেতার স্থান গ্রহণ করে। ফলে দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন নীতি অনুসৃত হইতে পায় না।

গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি—গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন যে, নানাবিধ ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের ব্যবস্থা। কারণ এক কথায় এই ধরণের ব্যবস্থা ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষ তাহার যথার্থ মর্যাদা লাভ করে। তাঁহারা বলেন,

(১) জন-কল্যাণ হইতেছে সরকারের প্রধান কর্তব্য; সেই কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই জন-কল্যাণের প্রতি অধিক দৃষ্টিশীল। গণতান্ত্রিক সরকার অধিকসংখ্যক লোকের সুখসমৃদ্ধির জন্য কাজ করে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ক্ষমতা না থাকিলে সুযোগসুবিধা লাভ করা যায় না। গণতন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য ব্যবস্থায় জনসাধারণের হাতে কোন ক্ষমতা থাকে না, তাই তাহারা সুযোগ সুবিধা হইতেও বঞ্চিত। অভিজাততন্ত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় তাহাদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রই প্রসারিত হয়; রাজতন্ত্রে সমস্ত ভাগ্য একটি লোকের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণতন্ত্রে জনগণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় জনসাধারণের উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(২) অন্যান্য শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্য হয়তো অধিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ভিন্ন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না বা তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতে পারে না। অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রে সাধারণ মানুষ আইনপ্রণয়ন ও শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা অন্যের আজ্ঞাবহ মাত্র। ফলে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় না বা আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধ জাগরিত হয় না। ডিউয়ি, এলউড, হবহাউস প্রমুখ চিন্তানায়করা বলিয়াছেন যে গণতন্ত্রকে অন্যায়ভাবে নিম্নস্তরের শাসনব্যবস্থা বলিলেও, ইহা পরিহার করা চলে না। কারণ মানুষ এখানে মানুষের মর্যাদালাভ করে এবং একে অপরের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে।

(৩) লেকী, মেইন, ক্র্যাম প্রমুখ চিন্তানায়করা গণতন্ত্রকে অজ্ঞ লোকের

শাসন বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ কেবলমাত্র ব্যাপক নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকে, সেই নীতির বাস্তবরূপায়নের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত। আর সাধারণ মানুষ যত অজ্ঞই হউক না কেন তাহাদের নিজের ভালমন্দের বিচার তাহারাই ভাল করিতে পারে। কারণ শিক্ষাগত অজ্ঞতা থাকিলেও প্রত্যেক মানুষের এক ধরণের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি আছে। ম্যাকলিন বলিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক চেতনা আছে যাহার দ্বারা নীতিহীনতাকে তাহারা প্রতিহত করিতে পারে। ইহা অবশ্য বলা হইতেছে না যে শিক্ষা ভিন্নই গণতান্ত্রিক শাসন চলিবে। শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তবে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিয়া জনগণকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে জন-কল্যাণ অধিক সাধিত হইবে।

(৪) গণতান্ত্রিক শাসন ত্রুটিহীন ইহা অবশ্যই সত্য নহে। কারণ কোন ব্যবস্থার সম্বন্ধেই এই উক্তি করা চলে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে ইহা ব্যয়বহুলতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং এই ব্যয়বাহুল্য আইনপ্রণয়ন ও শাসন পরিচালনাকে প্রভাবিত করে, তাহা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেই সত্য নহে। প্রত্যেক ব্যবস্থায় এই ত্রুটি রহিয়াছে; বরং গণতন্ত্রে ইহা অনেক কম। কারণ জনসাধারণ এখানে সরকারের প্রতিটি কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকারী। দলীয় শাসনের ত্রুটি অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু অভিজাততন্ত্রের শ্রেণী স্বার্থসংরক্ষণ ও রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে।

(৫) গণতন্ত্রের সমর্থকদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা মানুষের জন্মগত অসাম্যকে স্বীকার করেন না। কিন্তু এই ধরণের সমালোচনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ জৈবিক অসাম্যকে গণতন্ত্রের সমর্থকরা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে তাঁহারা স্বীকার করেন না। যদি প্রত্যেক লোককে আত্মবিকাশের সমান সুযোগ না দেওয়া হয় তবে প্রকৃত সমাজ চেতনা কখনই সম্ভব হইবে না।

(৬) ইহা অনস্বীকার্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। পৃথিবী আজ গণতন্ত্রের সপক্ষে রায় দিয়াছে। তাই বর্তমানে গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। এখনকার প্রশ্ন হইল কিভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ রূপদান করা যায় এমন কি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি যেখানে গণতান্ত্রিক শাসন নাই বলিয়া মনে করা হয়, সেখানেও আজ বলা হইতেছে যে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এইভাবে পরোক্ষভাবে কম্যুনিষ্ট দুনিয়াও আজ গণতন্ত্রের আদর্শকে মানিয়া লইয়াছে।

(৭) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত স্থায়িত্ব এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই বর্তমান। কারণ যে ব্যবস্থায় জনসাধারণই শাসন ক্ষমতার উৎস সেখানে অসন্তুষ্টির অবকাশ কম। বিপ্লবের মধ্য দিয়া পুঞ্জীভূত অসন্তুষ্টির প্রকাশ বরং অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্রের ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়।

(৮) গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সমর্থক লর্ড ব্রাইস বলেছেন যে গণতন্ত্র অপেক্ষা উন্নততর শাসনব্যবস্থার কথা যাঁহারা বলেন বা চিন্তা করেন তাঁহারা জানেন না, উন্নত শাসনব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার অবকাশ থাকিলেও ইহার অপেক্ষা ভাল শাসনব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয় নাই।

উপসংহার ঃ গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহার অনেক দোষ রহিয়াছে। কিন্তু সমালোচকগণ ইহাকে যেরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা সংগত হয় নাই। যে সব ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী গণতন্ত্রের ব্যবহারগত ত্রুটি এবং ইহার অসম্পূর্ণতা। নীতি হিসাবে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, এই মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল রাজনৈতিক সাম্য নহে, অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত গণতন্ত্রের আদর্শ কখনও সফল হইতে পারে না।

সমাজে ধনবৈষম্য বজায় থাকিতে গণতন্ত্র কোনদিন সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। ল্যাস্কি যথার্থই বলিয়াছেন, সমাজে ধনবৈষম্য বজায় থাকার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের শাসনের নামে ধনিক এবং বিত্তবান পুঁজিপতিদের শাসন-ব্যবস্থাই কায়েম হয়। ইহার ফলে দরিদ্র আরও নিঃস্ব হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানারূপ একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করায় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সর্ববাধা অতিক্রম করিয়া গণতন্ত্রের আদর্শ জয়লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গণতন্ত্রকে সফল করিবার জন্য অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে এবং সর্বপ্রকার শোষণের অবসান করিতে হইবে।

Q. 76. Define representative government and responsible government. (Cal. 1948)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন কোন লেখক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের সহিত দায়িত্বশীল শাসনের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেরা সরাসরিভাবে দেশ শাসন না করিয়া তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন করে। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সর্বদা তাহাদের কার্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট দায়ী নাও থাকিতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনে রাষ্ট্রপতি আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। তাই এই সরকার আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল (responsible) নয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে শাসনকর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রিপরিষদ সর্বদাই আইনসভা অর্থাৎ আইনসভার নিম্ন কক্ষের নিকট তাহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকে। আইনত মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট এবং রাজনৈতিক দিক হইতে নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট দায়ী। সুতরাং বলা যায় এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল।

কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের সহিত দায়িত্বশীল শাসনের এইরূপ পার্থক্য কৃত্রিম। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থাতেও সরকার দায়িত্বশীল হইতে বাধ্য। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদকে (Cabinet) কিছুটা পরিমাণে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয়; যদিও সংবিধানগতভাবে কোন দায়িত্ব নাই। অধিকন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায় নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্ব অবশ্যই বর্তায়। ইহা ছাড়াও জনমতের প্রভাব রহিয়াছে। মোটকথা, প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা মাত্রেই প্রকারান্তরে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা।

Q. 77. Discuss the aims and ideals of totalitarian states. How far do these ideals differ from those of democratic states ? (Cal. 1944)

Or, Discuss the merits and demerits of Dictatorship.
Or, Distinguish between democracy and dictatorship as forms of Government (Cal. '62)

ভূমিকা : রাষ্ট্রের সম্পর্কে আদর্শবাদী মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণ রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান রূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং সমগ্র ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের অপরিমেয় শক্তির কথা বলিয়াছেন। আধুনিককালে এই মতবাদ হইতে সামগ্রিক (Totalitarian) রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের প্রধান ও একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইল একনায়কতন্ত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী, ইতালি ও স্পেনে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও প্রাচ্যের অনেক দেশে গণতন্ত্রের পরাভব ঘটিয়াছে। তবে বর্তমানে একনায়কতন্ত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের শাসন নহে, কোন দল বা শ্রেণীর শাসন। সাম্প্রতিককালে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, পরিচালিত গণতন্ত্র, নব গণতন্ত্র ও বুনিয়াদী গণতন্ত্র ইত্যাদির ছদ্মনামে একনায়কতন্ত্র কোন কোন দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। ইহা ভিন্ন সামরিক একনায়কতন্ত্র তো আছেই। ইহাতে সৈন্যদলের প্রভাব খুব বেশি থাকে। লোকে ভয়ে এই ধরণের শাসনকে মানিয়া লয়। অবশ্য অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অক্ষমতা ও অসাধুতার জন্য যে সামরিক একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয় লোকে তাহা সমর্থন করে। লাতিন আমেরিকা, বর্মা ও পাকিস্তানে এই ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ফরাসীদেশে দ্য' গল যে পঞ্চম রিপাবলিক গঠন করিয়াছেন সেখানে তাঁহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা রাখিয়াছেন। ফলে তাঁহাকে অনেকে ঠাট্টা করিয়া 'মহারাজ দ্যগল' বলে। আধুনিক কালে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রকে সামরিক রাষ্ট্র (Totalitarian State) বলা হয়।

সংজ্ঞা: সামগ্রিক রাষ্ট্র বা একনায়কতান্ত্রিক শাসনে কোন বিশেষ দলীয় নায়ক দলের সাহায্যে সাধারণত শাসনতন্ত্র বিরোধী পন্থায় পাশবশক্তির দ্বারা ক্ষমতা দখল করে এবং বিরোধী দলসমূহকে ধ্বংস করিয়া নিজ দলের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করে। সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এই শাসনকে স্থাপন করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সংঘবদ্ধ কোন দলের সাহায্য ভিন্ন শক্তিশালী একজন ব্যক্তি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা সৈন্যের সাহায্যে শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে নিজস্ব একটি দল অবশ্যই সৃষ্টি করিতে হয়। বর্তমানে একনায়কতন্ত্রের রূপ বলিতে সামগ্রিকভাবে একদলীয় শাসন বুঝায়।

অনেকে রাজতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্রের প্রাচীন রূপ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। ইহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, রাজতন্ত্রে রাজা বংশানুক্রমে শাসন কার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসন বংশানুক্রমে স্থির হয় না। দলের সর্বময় ক্ষমতাশালী নির্ধারিত ব্যক্তিই শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, রাজার পশ্চাতে কোন দলের

সমর্থন থাকে না, কিন্তু দল ভিন্ন বর্তমানে একনায়কতন্ত্র কল্পনাই করা যায় না।

একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য—নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ মতবাদকে দমন করিয়া পাশব শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রশাসন করাই একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

গণতন্ত্রের সহিত পার্থক্যঃ গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। বলিতে গেলে, একের বিনাশে অপরের বিকাশ। (১) গণতন্ত্র ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রই সব—ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব, অধিকার বা মতামতের কোন স্থান নাই। (২) গণতন্ত্র দলপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠরা গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। একনায়কতন্ত্রে একাধিক দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। সরকারের সমালোচনা বা শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য অন্য কাহারও চেষ্টা করিবার কোন উপায় নাই। (৩) গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুর কোন স্থান নাই—সকলেই শাসকের মত অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। (৪) গণতন্ত্রে জনসাধারণের সকলেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ আছে; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে দলীয় নেতা ও দলের সদস্য ভিন্ন কেহ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। (৫) গণতন্ত্র জনমত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, আর একনায়কতন্ত্র জনমতকে ধ্বংস করিয়া সকলকে দলের নির্দেশ মানিতে বাধ্য করে। (৬) গণতন্ত্রে সরকার আইনসভা ও নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সরকার একমাত্র স্বীয় দল ভিন্ন কাহারও নিকট দায়ী থাকে না।

একনায়কতন্ত্রের দোষ ও গুণ—একনায়কতন্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কয়েকটি গুণের কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

দোষ—(১) একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার কোন উপায় নাই। ব্যক্তি-অধিকার বলিয়া এখানে কিছু নাই। (২) স্বাধীনভাবে কাহারও মত প্রকাশের অধিকার নাই ও সকলকেই বিনা দ্বিধায় শাসকের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয় বলিয়া একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের মানসিক মৃত্যু

ঘটে। তাহাদের চিন্তাশক্তি, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। (৩) এই শাসনে সব কিছু পাশবশক্তির দ্বারা করার চেষ্টা হয়। গণতন্ত্রে আলোচনার দ্বারা মতবিরোধের মীমাংসা হয়, কিন্তু এখানে তাহা হয় বল প্রয়োগের দ্বারা। (৪) একজন শাসক বা একটি দলের পক্ষে সমগ্র দেশ ও সকল জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ জানা ও তাহার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। (৫) একনায়কতন্ত্র অনেকক্ষেত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুদ্ধ। (৬) জনসাধারণ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ না করিলে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কার্য কিংবা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তাহারা উৎসাহের সংগে অগ্রসর হয় না। (৭) একজন একনায়ক খুবই কর্মক্ষম ও ভাল শাসক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সেইরূপ আর একজন নেতার আবির্ভাব ঘটিবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

গুণ: (১) একনায়কতন্ত্রে অতি শীঘ্র কোন জরুরী কার্য সম্পাদন করা যায়। গণতন্ত্রে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক, আইনসভার সম্মতি, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিচারালয়ের স্বীকৃতি প্রভৃতির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে দ্বিধাহীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্য সম্পাদন করা যায়। যুদ্ধের ন্যায় আপৎকালীন প্রয়োজনে একনায়কতন্ত্রী শাসন বিশেষ কার্যকরী।

(২) গণতন্ত্রে জনসাধারণ শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু জনসাধারণের অধিকাংশই অজ্ঞ বলিয়া ইহা অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসনে পরিণত হয়। একনায়কতন্ত্রে যাহারা কর্মক্ষম ও উপযুক্ত, তাহাদেরই হাতে শাসনের ভার দেওয়া হয়।

(৩) বিরোধী দলের বাধা দানের ফলে গণতন্ত্রে অনেক সময় কার্য সম্পাদনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে বিরোধী দল না থাকায় এইরূপ বাধাসৃষ্টির কোন আশংকা নাই।

(৪) দীর্ঘকাল অবহেলিত, অনগ্রসর ও সমস্যা প্রপীড়িত দেশে একনায়কতন্ত্রের ফলে অতিদ্রুত উন্নতি হইতে পারে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র' (Dictatorship of the prolatariat) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাশিয়ার অগ্রগতি সত্যই প্রসংশনীয়।

(৫) শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি গণতন্ত্রে উপেক্ষিত হয় বলিয়া হেনরী মেইন প্রভৃতি মত প্রকাশ করিয়াছেন। একনায়কতন্ত্রে ইহার প্রসার সম্ভব।

উপসংহার : একনায়কতন্ত্রের কয়েকটি গুণ থাকিলেও ইহার ত্রুটি এত বেশি যে ইহাকে কোন মতেই কাম্য শাসন ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করা চলে না। গণতন্ত্রের কয়েকটি ত্রুটির জন্যই কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এই ত্রুটিগুলি দূর করিতে পারিলে গণতন্ত্রই সর্বত্র স্বীকৃত হইবে। সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রথমে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমানে তাহার গণতান্ত্রিক রূপ দিবার কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

Q. 78. Do you think that dictatorship is a satisfactory alternative to democracy?

Or, Will democracy survive?

গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যর্থতায় বিভিন্ন দেশে মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একনায়কতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে নাৎসিবাদ ও ইতালীতে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রকে ধ্বংসকরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাশিয়ার জারতন্ত্রের অবসানের পর সাম্যবাদীদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্রে একইরূপ শাসন রহিয়াছে। সম্প্রতি মিশর, ইরাক, সুদান, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। গণতন্ত্র এইসব দেশের বিভিন্ন সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারে নাই, বরং বিকল্প একনায়কতন্ত্রের আমলে তাহাদের অনেকক্ষেত্রে উন্নতি হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমানে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে : একনায়কতন্ত্র কি গণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? গণতন্ত্র কি টিঁকিবে না?

একনায়কতন্ত্র অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ নহে : গণতন্ত্রের যত দোষই থাকুক না কেন, ইহার বিকল্প হিসাবে একনায়কতন্ত্র গ্রহণীয় হইতে পারে না। (১) একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী নয়। জার্মানী ও ইতালীর একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষে টেঁকে নাই। (২) একমাত্র গণতন্ত্রেই মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ রহিয়াছে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ইহার কোন অবকাশ নাই। আর যে শাসনে স্বাধীনতা নষ্ট হয় তাহা কখনও কাম্য হইতে পারে না। (৩) একনায়কতন্ত্রে যে গুণ দেখা যায় তাহা গণতন্ত্রেও সম্ভব। ইহার জন্য গণতন্ত্রকে ত্রুটিমুক্ত করিতে হইবে মাত্র—ইহাকে বর্জন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

(৪) পূর্বে ধারণা ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিংবা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভারতে গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের চেষ্টা এই ধারণার পরিবর্তন করিয়াছে।

(৫) প্রকৃত গণতন্ত্রে পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন গণতন্ত্রের বর্তমান ত্রুটিসমূহ থাকিবে না, এবং মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে ইহা সক্ষম হইবে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র

UNITARY AND FEDERAL FORMS OF GOVERNMENT

ভূমিকা – আইনের চোখে এবং সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (unitary state), যুক্তরাষ্ট্র (federal state), রাষ্ট্র সমবায় (confedaration), প্রকৃত বন্ধক (real union, ব্যক্তিগত বন্ধন (personal union), এবং মৈত্রীবন্ধন (alliance) ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হইলেও সংহতির দিক হইতে দেখিলে ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংহতি দেখা যায়, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। ইহাতে একটি মাত্র প্রাণকেন্দ্র হইতে রাষ্ট্র দেহের সবত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়। এখানে একটি রাষ্ট্র, একটি সরকার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলি একটি মাত্র রাষ্ট্র হইলেও তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সরকার আছে। সংবিধান দ্বারা প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র ও ক্ষমতা নির্ধারিত। রাষ্ট্র সমবায় আবার কয়েকটি রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব সমস্যার উপর এই সহযোগিতার মাত্রা নির্ভর করে। প্রকৃত বন্ধন দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ; একই রাজবংশ দ্বারা শাসনের মাধ্যমে এই বন্ধন গড়িয়া উঠে। তবে কোন রাষ্ট্রেরই পৃথক সত্তা নষ্ট হয় না। ব্যক্তিগত বন্ধন সাময়িক, আকস্মিক কারণে একই রাজা দুই রাষ্ট্রে উত্তরাধিকার লাভ করেন। এ রাজার জীবনকাল পর্যন্তই এই বন্ধন স্থায়ী হয়। মৈত্রীবন্ধন একান্তভাবে সাময়িক প্রয়োজনে উদ্ভূত। প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আর কোন বন্ধন থাকে না। সাধারণতঃ সামরিক প্রয়োজনে এই বন্ধন গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্রশক্তির কথা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মৈত্রীবন্ধন হইতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। নিতান্ত সামরিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হইলেও যদি বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে তবে রাষ্ট্র সমবায় গঠিত হইতে পারে। আবার আমেরিকা এবং সুইজারল্যাণ্ডের মত রাষ্ট্র সমবায় যুক্তরাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গুলির মধ্যে একটি তত্ত্বগত বন্ধন রহিয়াছে।

Q. 79. Discuss critically the unitary form of Government.

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :—এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রের উপর সংন্যস্ত থাকে। কচ্ছপ যেমন ইচ্ছামত তাহার হস্তপদাদি উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তেমনি কোন কোন অংশের কার্যভার অনায়াসে নিজে গ্রহণ করে এবং ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে কোন অংশকে যে কোন কাজের ভার অর্পণ করে। রাষ্ট্র ও সরকার এখানে একটি। তাই অনেকে এই ধরণের ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীকৃত (centralised) সরকার ব্যবস্থাও আখ্যাও দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এককেন্দ্রীক সরকার ও কেন্দ্রীকৃত সরকার ব্যবস্থার একীকরণ বিজ্ঞানসম্মত নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও কেন্দ্রীকৃত সরকার ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। কারণ সমগ্র দেশের প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সংগে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য হইল এই যে, প্রথমটিতে শাসনগত সকল প্রকার চরম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি আঞ্চিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধান অনুসারে বণ্টিত হয়। সুতরাং এককেন্দ্রিক সরকারের মূল কথা হইল সাংবিধানিক নিয়মে সাধারণভাবে স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এককেন্দ্রিক সরকার এবং কেন্দ্রীকৃত সরকার এক নহে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই দুই ধরণের সরকার ব্যবস্থাতেই কেন্দ্রিকরণ ও বিকেন্দ্রিকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রিকরণকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ ফরাসী দেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও সেখানে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করা হইয়াছে। অপরপক্ষে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চরম বিকাশ ঘটিলেও বাস্তব প্রয়োজনে সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রিভূত হইবার একটি বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় দুইটি সরকারও থাকিতে পারে। কেন্দ্রিকরণ বা বিকেন্দ্রিকরণ সম্পূর্ণরূপে বাস্তব প্রয়োজনে অনুসৃত নীতি—তত্ত্বের সহিত ইহাদের কোন যোগ নাই।

ফ্রান্সে স্থানীয় সরকারী সংগঠনগুলির উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক ও গভীর। প্রকৃতপক্ষে সেখানেও একটিমাত্র সরকার আছে, এবং তাহা হইল কেন্দ্রীয় সরকার।

গুণাগুণ—আইন ও শাসন ব্যবস্থার সরলতা এবং অনুসৃত নীতির অখণ্ডতা এককেন্দ্রিক সরকারের প্রধান গুণ। এই সরকার প্রয়োজনবোধে অত্যন্ত দ্রুততার সংগে যে কোন সংস্কার সাধন করিতে পারে। কারণ ইহার পক্ষে অন্য কোন সংগঠনের মতামত বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আইন চালু থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা ও ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরিকায় বিভিন্ন রাজ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিক্রয় করের হার ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল কারণে নানাবিধ প্রশাসনিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, নীতি ও আইনের সরলতা ও অখণ্ডতা থাকায় এখানে শাসন ব্যবস্থার দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এবং সংকটকালে এই দৃঢ়তা বিশেষ উপযোগী।

তৃতীয়ত, এককেন্দ্রিক শাসনের প্রশাসনিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন সরকার থাকায় প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র অধিক সুনিপুণ। যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য আঙ্গিক রাজ্যগুলির ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করা হয়।

পঞ্চমত, এককেন্দ্রিক শাসনের সুপরিবর্তনীয়তা ইহার উৎকর্ষের নির্দেশক। প্রয়োজনানুসারে স্থানীয় সরকার সমূহের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের অবসান ঘটাইয়া এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার সহিত তাল রাখিতে পারে।

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনের প্রধান ত্রুটি হইল বৈচিত্র্যহীনতা। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য ফুটিতে পায় না। বাস্তব প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার সৃষ্টি হইলেও তত্ত্বগতভাবে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার এখানে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। ফলে দূরের লোকদের সকল প্রকার অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা সহজ হয় না। কেন্দ্রীয় শাসন জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসায়

স্থানীয় ব্যক্তিরা নেতৃত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ পান না। আমলাদের ক্ষমতা ও প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের অসাধুতা ও অকর্মণ্যতার জন্য শাসন ব্যবস্থা অচল হইবার জোগাড় হয়। বৃটিশ আমলে আমলাতন্ত্রের প্রভাব এতদূর প্রসারিত হইয়াছিল যে সামান্য একজন চাপরাশী নিয়োগের ব্যাপারেও সুদূর কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্র যাজন হই • । [illegible] কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইত।

উপসংহার—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন শাসন ব্যবস্থাই সকল অবস্থার উপযোগী নহে, কিন্তু প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থাই কোন না কোন বিশেষ অবস্থার উপযোগী। সেই রকম এককেন্দ্রিক শাসন কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রের উপযোগী। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে এককেন্দ্রিক শাসন ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্যসমন্বিত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের উপযোগী। কিন্তু বৃহদায়তন রাষ্ট্রে একান্ত অচল। এমন কি সেই সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলা যাইতে পারে। কারণ সুশাসনই গণতন্ত্রের একমাত্র কথা নহে, স্বায়ত্বশাসনও গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান আদর্শ। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণাংগ রূপায়ণে সুশাসন ও স্বশাসন উভয়ই প্রয়োজন।

Q 80 Describe the nature and characteristics of the Federal Union Illustrate your answer with reference to the United States of America (C. U. 030, 3 , 40, 46, 54)

সংজ্ঞা—পূর্বে স্বাধীন ছিল এমন কতকগুলি রাষ্ট্র নিজেরা মিলিত হইয়া যদি একটি রাষ্ট্র সংঘ গঠন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সাধারণ শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াও নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ও ক্ষমতা বজায় রাখে তবে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রিয় সরকার শাসন পরিচালনা করে আর অপর কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক সরকার কার্য করে। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে সার্বভৌমিকতা সামগ্রিকভাবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের, অংগ রাষ্ট্রগুলির পৃথক সার্বভৌমিকতা নাই। জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ইচ্ছার সমন্বয় রূপেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাতে পররাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধ, ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া বৃহৎ রাষ্ট্রের পত্তন করিলেও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে। অধ্যাপক ডাইসী তাই যুক্তরাষ্ট্রকে "ঐক্যবিহীন সম্মেলন"

("a union without unity" Dicey) বলিয়াছেন। অধ্যাপক কে. সি, হোয়ারের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে একদিকে আঞ্চলিক সরকারসমূহ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র ("By the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional governments are each, written a sphere, co-ordinate and independent," Wheare.)

বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মিলনে এইরূপ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতিকে ডাইসী কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) শক্তিরূপে অভিহিত করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্ররূপে সুইজারল্যাণ্ডের গঠনের পূর্বে ক্যাণ্টনগুলি পরস্পর স্বাধীন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়াতেও এইভাবেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মিশর, সিরিয়ার ও ইয়েমেনের মিলনে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রও এইভাবে স্থাপিত হইয়াছে। অপর আর এক ভাবেও যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অধ্যাপক ডাইসী এই ধরণের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সহিত পরিচিত ছিলেন না। এই পদ্ধতিটি কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তি নামে অভিহিত। অধ্যাপক ডাইসীর ধারণা ছিল যে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করিবে। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রাতিগ শক্তির কার্যকারিতায় তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অধুনা অধিকাংশ বৃহৎ রাষ্ট্রেই সুশাসনের জন্য এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইতেছে। এই সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ শক্তি কার্যকরী হইতেছে। অবশ্য এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির কার্যকারিতার উপর জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবির প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। ভারতে ১৯৩৫ সালের ভারতের শাসন আইনে এইভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটাইয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। ভারতের নূতন সংবিধানেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠন করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে সাইবেরিয়াতেও অনুরূপ ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন করা হইয়াছে। তবে এই ধরণের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনুল্লিখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা (Residuary powers) সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পিত হয়।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পার্থক্য এই যে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে এবং এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীলও নহে। লিখিত

সংবিধান দ্বারা আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা স্থির করা হয় এবং এই ক্ষমতা মৌলিক।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়—

(১) যুক্তরাষ্ট্রে দুইপ্রকার সরকার থাকে—একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকার। সমগ্র রাষ্ট্রটির শাসন পরিচালনার সাধারণ দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, আর মূল অংগ রাজ্যের শাসনের ভার থাকে আঞ্চলিক সরকারের উপর। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন, অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত।

(২) যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকে নিজ নির্দিষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান থাকে। উভয় প্রকার সরকারের নিজ নিজ কার্য নির্ধারণ, ক্ষমতা বণ্টন, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে লিখিত থাকা দরকার। তাই এই শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

(৪) সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। যে সব সর্ত, অধিকার ও ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বা স্বায়ত্বশাসনকামী সম্প্রদায় মিলিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে তাহা সহজে পরিবর্তনযোগ্য হইলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কেন্দ্র এবং আংগিক রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা করিয়া দেওয়া হয়। এই বণ্টননীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম। তবে সাধারণতঃ কেন্দ্রের হস্তে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়, প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা ন্যস্ত থাকে এবং আংগিক রাজ্যগুলি শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, পুলিশ ইত্যাদির ভার পায়। অনুল্লিখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা কোথাও কেন্দ্রে ন্যস্ত, কোথাও বা আংগিক রাজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র ঐ ক্ষমতা আংগিক রাজ্যদের হস্তে আছে; কিন্তু কানাডা ও ভারতে উহা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত।

(৬) দুই প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে

পারে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন সর্বোচ্চ বিচারালয় থাকে। সংবিধানের ভিত্তিতে ঠিকমত সব কাজ হইতেছে কি না, এই বিচারালয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। ভারতের এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এইরূপ বিচারালয়। তবে মাকিন সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র মতভেদের বিচারই করে না। সংবিধানের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকে।

(৭) সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভোটে একটি কক্ষের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন, আর অপর কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অংগ রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় আইনসভা কংগেসের নিম্ন কক্ষ বা প্রতিনিধিসভা (House ot the Representatives) সাধারণভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত, কিন্তু উচ্চ কক্ষ সেনেটে প্রত্যেকটি অংগ রাজ্য হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি রহিয়াছেন।

(৮) অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকতার ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্রের নাগরিক যে অংগ-রাজ্যে বাস করে তাহারাও নাগরিক, আবার সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রেরও নাগরিক। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক রাজ্যের একজন অধিবাসী প্রথমে নিউইয়র্ক রাজ্যের নাগরিক এবং সেই সংগে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক।

(৯) যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের জন্য বিশেষভাবে বণ্টন ব্যবস্থার নির্দেশ থাকে।

(১০) একবার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পর ইহার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রিয় শাসনের প্রতি অনুগত থাকিতে হয় এবং রাজ্যগুলির পৃথক সার্বভৌমিকতার অবসান ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অবশ্য ইহা একমাত্র ব্যতিক্রম, সোবিয়েত ইউনিয়ন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অংগীভূত কোন রাজ্য ইচ্ছা করিলে সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। ইউক্রেন ও বাইলোরাশিয়াকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংগীভূত করিবার জন্য তত্ত্বগত ভাবে এই বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে সমগ্রদেশটি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় কোন অংগরাজ্যের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রশ্ন ওঠে না।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে, ইহা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক। ভারতের কেন্দ্রীয় আইন-সভার উচ্চকক্ষে অংগ-রাজ্যগুলির সমান-সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। এখানে দ্বি-নাগরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নাই—সকলেই এক ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। সাধারণ সময়ে অংগরাজ্যগুলি সংবিধান নির্দিষ্ট অধিকার ভোগ করিলেও বহুক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আছে, এবং সময় বিশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ বহুদূর বিস্তৃত হইতে পারে। এই কারণে, অনেকে ভারতকে ঠিক যুক্তরাষ্ট্রীয় না বলিয়া প্রায় যুক্তরাষ্ট্র (quasi-federal) বলিতে চান। তবে এই মত সর্বজন স্বীকৃত নহে। কারণ যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রিকরণের একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইতেছে সেই হেতু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতাধিক্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী নহে।

Q. 81. What are the conditions necessary for the formation of federation. Explain the necessity of a writter constitution for a fedaral Union.

ভুমিকা—বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অধুনা স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। এই প্রবণতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নহে। ইহার পিছনে আরও এমন কিছু ঘটনা আছে যাহা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাইয়াছে এবং তাহাকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা উভয়ই রাষ্ট্রসমূহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে দুইটি পদ্ধতিতে যথা অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি (integration by absorption) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে (integration by federation) রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়াছে। কতকগুলি রাষ্ট্র প্রথম পদ্ধতিতে একীভূত হইয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার কতকগুলি রাষ্ট্র দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী মিলিত হইলেও একীভূত হইয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সৃষ্ট হইল যুক্তরাষ্ট্র। কতকগুলি সর্ত বর্তমান না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না।

অধ্যাপক ডাইসী এই ভাবে সৃষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের দুইটি প্রধান সর্ত দেখাইয়াছেন : (ক) পাশাপাশি অবস্থিত এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইবে; এবং (খ) এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিবে কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিবে না ("They must desire union but not unity"—Dicey)। অধ্যাপক ডাইসীর পাদপূরণ করিয়া অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র লিখিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা থাকিলেই চলিবে না আঞ্চিক রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার সামর্থ্যও থাকা আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাষ্ট্রগুলি যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের রূপায়ণের জন্য একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যসরকার গঠন না করিতে পারে তবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। কোন কোন অবস্থা বর্তমান থাকিলে এই ইচ্ছার এবং সামর্থ্যের প্রকাশ সম্ভব তাহাই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে যুক্তরাষ্ট্রগঠনের প্রথম সর্ত হইল ভাবগত ঐক্য। তাঁহার মতে ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য ইত্যাদি নানা কারণে এই ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভিন্ন প্রধানতঃ যে কারণে এই ভাবগত ঐক্য দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে তাহা হইল অপরের অত্যাচার প্রতিরোধ করার আকাঙ্খা। কানাডা এবং সুইজারল্যাণ্ডে ভাষা ও ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্বেও প্রধানত: এই একটি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হইয়াছিল। অবশ্য এই প্রসংগে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপযোগী অবস্থা বর্তমান থাকিলেই চলিবে না, উপযুক্ত নেতৃত্বও প্রয়োজন। জর্জ ওয়াশিংটন, হ্যামিলটন, ম্যাডিসন প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইল ভৌগোলিক সান্নিধ্য। ভৌগোলিক সান্নিধ্য ব্যতিরেকে যুক্তরাষ্ট্রের গঠন সহজসাধ্য নহে। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারীদের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ অপর অংশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে আদানপ্রদান সম্ভব হয় না এবং কর্তব্যহীনতা ও কর্মবিমুখতা বৃদ্ধি পায়। গিলক্রাইষ্ট বলিয়াছেন যে আঞ্চিক রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিলে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না। প্রয়োজনকালে কোন আঞ্চিকরাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোনরূপ সামরিক সাহায্য পাইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করা যাইতে

পারে। পূর্ব পাকিস্তান ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় নানাবিধ প্রশাসনিক অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে এবং ক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সর্বাঙ্গীণভাবে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে সামাজিক রীতিনীতির সাদৃশ্য থাকা উচিত। নতুবা বিবাদ-বিসংবাদ বাধিতে পারে যাহা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন রাজ্যে দাসত্বপ্রথার প্রচলন থাকায় এবং উত্তর আমেরিকার রাজ্যগুলি ইহার বিরোধিতা করায় গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সামাজিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

চতুর্থতঃ,' অধ্যাপক হোয়ার বলেন যে কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার মিল থাকিলেই হইবে না রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থারও সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ কোন একটি রাজ্যে যদি স্বেচ্ছাচারতন্ত্র আর কোথাও যদি বা সাধারণতন্ত্র প্রচলিত থাকে তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা অসম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও আঞ্চিক রাজ্যগুলির সর্বত্র একই ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। কারণ অধ্যাপক ডাইসির ভাষায় ইহা হইল "ঐক্যবিহীন সম্মেলন'। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের কোন সুযোগ নাই। সেইহেতু ইহারা যুক্তরাষ্ট্রের পরিপন্থী।

পঞ্চমত, আঞ্চিক রাজ্যগুলির আয়তন যুক্তরাষ্ট্র গঠনকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। কোন একটি রাজ্য যদি আয়তন ও জনবলে অন্যান্য রাজ্যগুলি অপেক্ষা শক্তিশালী হয় তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ ঐ রাজ্যটির একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে অন্যান্য রাজ্য সমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যের আদর্শ ক্ষুন্ন হইয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। যদিও অবশ্য জ্যামিতিক নিয়মে প্রত্যেক রাজ্যগুলির আয়তন সমান হওয়া সম্ভব নহে তবুও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হইল বিভিন্নরাজ্যের মধ্যে যথাসম্ভব ভারসাম্য বজায় রাখা।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্বশেষ প্রধান সর্ত হইল যুক্তরাষ্ট্রগুলির আর্থিক সঙ্গতি। যদি রাষ্ট্রগুলি আথিক অবস্থার দিক হইতে একান্তভাবে হীনবল হয় তবে যুক্ত-রাষ্ট্রের গঠন অসম্ভব। আর্থিক সম্পদ ভিন্ন তীব্র ইচ্ছাসত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি

করা যায় না। যে মুহূর্তে কোন আঙ্গিক রাজ্য আর্থিক সঙ্গতি হারাইয়া ফেলে তখনই তাহাকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্য লইতে হয়। আর অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হওয়ার অর্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থা হইতে ব্যয়সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক হইতে অন্ততঃ কিছুটা সমান সঙ্গতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণাংগ রূপায়ণ সম্ভব নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান অপরিহার্য কেন? এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্র, একটি সরকার। ফলে কেন্দ্রীয় আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র এই ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই প্রাধান্য ভোগ করে সংবিধান। কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক কোন সরকারই এই প্রাধান্যকে উপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ এই সংবিধান অনুসারেই কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন করা হয়। যদি ক্ষমতার বণ্টন বা কর্মক্ষেত্রের কোনরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে এমন একটি পদ্ধতি অনুসৃত হয় যাহাতে কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্য সমূহের আইনসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবলমাত্র সংবিধান থাকিলেই চলিবে না তাহা লিখিতও হওয়া চাই। নতুবা অনির্দিষ্টতা থাকিয়া যাইবে। অনির্দিষ্ট কোন সংবিধানের উপর ভিত্তি করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ এই সংবিধান হইল জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধনের একমাত্র সাক্ষ্য। তাই ইহা দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন। এককভাবে কোন আইনসভা ইহার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ ক্ষুন্ন হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

Q 82 Distinguish a federal union form (a) Unitary State and (b) Confederation. (C. U. 1957)

ভূমিকা—এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে আইনগত ও সাংগঠনিক পার্থক্য থাকিলেও সংহতির দিকে কেবলমাত্র মাত্রাগত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রত্যেকটি ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য জাতীয় ঐক্য। অবশ্য যে ধরণের জাতীয় ঐক্যের কথা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করে

প্রারম্ভিকভাবে রাষ্ট্র সমবায় তা করে না, তবুও আধুনিক কালে আমরা দেখি যে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্র সমবায়ই যুক্তরাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করিতেছে। অবশ্য এই প্রসংগে আমরা অধ্যাপক ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি না যে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেরও চরম পরিণতি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। কারণ অদ্যাবধি ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, বরং বৃহৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া সুশাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

(ক) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য—এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি মাত্র প্রাণকেন্দ্র হইতে রাষ্ট্র-দেহের সর্বত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়। কচ্ছপ যেমন ইচ্ছামত তাহার হস্তপদাদি উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তেমনি কোন কোন অংশের ক্ষমতার নিজে গ্রহণ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে কোন অংশকে যে কোন ক্ষমতার অর্পণ করিতে পারে। এখানে একটি রাষ্ট্র একটি সরকার। শাসন ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় আইনসভাই সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র এই ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ক্ষমতার ব্যাপ্তিকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এক স্থানে বলা হইয়াছে, "British Parliament can make and unmake anything except turning a man into woman and woman into a man"

অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনসভার ক্ষমতা খর্ব করা হইয়াছে। সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল লিখিত সংবিধান। এই সংবিধান কেবলমাত্র লিখিত নহে দুষ্পরিবর্তনীয়ও বটে। কারণ এই সংবিধানের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলিত হইয়া জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যাপক ডাইসি এই জাতীয় রাষ্ট্রকে "ঐক্যবিহীন সম্মেলন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ডাইসি ইহাকে ঐক্যবিহীন সম্মেলন বলিয়াছেন এইজন্য যে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিপরীত ভাবে এখানে একটি রাষ্ট্র কিন্তু বিভিন্ন পৃথক পৃথক সরকার রহিয়াছে। সংবিধান অনুসারে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। আঞ্চলিক স্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষমতাগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অপরদিকে যে সব

বিষয় সকলের স্বার্থ-সম্পর্কিত তাহা পরিচালনার ভার কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলি তাহাদের ক্ষমতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী নহে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার সমূহ উভয়ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং উভয়েই সংবিধানের প্রাধান্য মানিয়া চলে। সংবিধানের কোন অংশের যদি পরিবর্তন করিতে হয় তবে এককভাবে তাহা সম্ভব নহে, উভয় সরকারেরই সম্মতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই অধ্যাপক হোয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার সমূহ একে অন্যের পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র। তথাপি যদি ক্ষমতার প্রয়োগ লইয়া কোন মতভেদ দেখা যায় তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে একটি সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকে। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার পীঠস্থান ইংলণ্ডে যেমন পার্লামেন্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার লীলাভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসংগত প্রাক্তন মার্কিন প্রধান বিচারপতি হিউ-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : "We are under a Constitution but the Constitution is what the judges say it is"

(খ) যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে পার্থক্য—আমরা দেখিলাম যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় যেখানে জাতীয় ঐক্যের সহিত আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধন করা হয়। এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার সংবিধানে হইল এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য।

অপর পক্ষে রাষ্ট্র সমবায় হইল এমনএকটি প্রতিষ্ঠান যাহা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। উদ্ভবের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র সমবায়ের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। (১) আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ওপেনহাইম বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র সদস্যরাষ্ট্র এবং নাগরিক উভয়ের উপরই কোন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ে এই ক্ষমতা কেবলমাত্র সদস্য রাষ্ট্রদের উপরই প্রযোজ্য, নাগরিকগণের উপর ইহা প্রযোজ্য হয় না। (২) যুক্তরাষ্ট্রে

যোগদানকারী অঙ্গরাজ্যগুলির আঞ্চলিকস্বাতন্ত্র্য থাকিলেও তাহাদিগকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয় না। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি কোন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে না—ইহারা প্রত্যেকে নিজেদের পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলন গঠন করে মাত্র। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শাসনযন্ত্র, আইনসভা, বিচারালয় প্রভৃতি থাকে; রাষ্ট্র সমবায়ে এসব কিছুই থাকে না। সেখানে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করে ও নীতি নির্ধারণ করে। কিন্তু কোন প্রতিনিধিই নিজের ইচ্ছামত মত দিতে পারেন না: সেই রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অনুসারে তাঁহাকে মত দিতে হয়। (৪) যুক্তরাষ্ট্রে এক বা দ্বিনাগরিকতা বর্তমান থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়মাবলী অর্থাৎ বিভিন্ন আইন কানুন এই সকল নাগরিক মানিয়া চলিতে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের কোন প্রকার নাগরিকতা নাই। রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ নাগরিক আছে এবং এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হন। তাই রাষ্ট্র সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মত নাগরিকদের জন্য কোন নির্দেশ দিতে পারে না। (৫) যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য-গুলির নিজ নিজ পৃথক আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের পৃথক আন্তর্জাতিক সত্তা বজায় রাখে। অবশ্য এই প্রসংগে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক সত্তা রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলিও বজায় রাখিতে পারে না। যেহেতু আন্তর্জাতিক কারণে অর্থাৎ বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া, সুদৃঢ় বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হয়, সেইহেতু সদস্য রাষ্ট্রগুলির অন্ততঃ বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও একটি যৌথ আন্তর্জাতিক সত্তা সৃষ্টি হয়। নতুবা রাষ্ট্র সমবায়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। (৬) কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তখন তাহারা উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার অধিকার চিরতরে ত্যাগ করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে স্বিরীকৃত হইয়াছে যে, কোন আঙ্গিক রাজ্যই ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্রের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে না। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই সাধারণভাবে এই নীতি অনুসৃত হয়। তবে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধানে এই বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য ইহার বাস্তব-মূল্য বিশেষ কিছুই নাই—কেন না সমগ্র রাশিয়ায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল

আছে এবং সেই দলই শাসন পরিচালনা করে। সুতরাং দলীয় নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন আঞ্চিক রাজ্যের পক্ষে বাহির হইয়া আসা সম্ভব নয়। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের যে কোন সদস্য রাষ্ট্র যে কোন সময় ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসিতে পারে। (৭) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান উদ্ভবগত ভাবে কিছু পরিমাণে চুক্তিপত্রের মত হইলেও ইহার প্রাধান্য কোন আঞ্চিক রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রসমবায় সম্পূর্ণরূপে চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয়; এবং এই চুক্তিতে যাহারা আবদ্ধ হন তাঁহারা যে কোন সময় ইহা ভঙ্গ করিতে পারেন। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের কোন অংশের পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে সাধারণতঃ আঞ্চিক রাজ্যসমূহের নির্দিষ্ট সংখ্যার মাত্র সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের চুক্তির কোন অংশের পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি অবশ্য গ্রহণীয়। (৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুসারে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন করিলে প্রত্যেক রাজ্য তাহা মানিতে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের যে কোন সদস্য Doctrine of Nullification নীতি প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারে যে চুক্তির সর্তের মধ্যে ঐরূপ বিষয়ের উল্লেখ ছিল না, সুতরাং উহা মানিতে বাধ্য নহে।

উপসংহার—অতএব দেখা যাইতেছে যে সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় একটি জিনিস বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও রাষ্ট্র সমবায়ের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র সমবায় গঠিত হয় সেই সকল উদ্দেশ্যের পূর্ণাংগ রূপায়ন রাষ্ট্র সমবায়ের দ্বারা সম্ভব নহে। ফলে বাধ্য হইয়া সদস্য রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

Q 83. "The difference between a federation and a confederation arieas wholly from the difference in respect of the location of sovereignty in the grouping" Examine the statement.

[উত্তরের জন্য ৮২নং প্রশ্নের ভূমিকা, (খ) অংশ এবং উপসংহার দেখ।]

Q. 84. What are the conditions for the success of a federal union? How far do they exist in India?

(C. U. 1958)

ভূমিকা—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উভয়ই বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। প্রধানতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পরিবর্তনশীলতায় এবং একটির জন্ম অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতিতে আর একটি একীভূত হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। অন্তর্ভুক্তির সংগে সংগে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। পদ্ধতিটি এখানে সহজ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিটি বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়াও এক না হইবার, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও পরস্পরের সহিত যুক্ত হইবার নীতি স্বীকৃত হয়। পরস্পর বিরোধী এই দুই নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তব ক্ষেত্রে সহজসাধ্য নহে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কয়েকটি সর্ত পালিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রথম সোপান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক। যে সব রাষ্ট্র বা অঞ্চলের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে আদান প্রদানের জন্য ভৌগোলিক সান্নিধ্য অপরিহার্য। বিভিন্ন অঞ্চল একে অপরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরবর্তী স্থানে থাকিলে তাহাদের সংযোগে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা কষ্টকর হয়। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ হইতে পশ্চিম অংশ ভারতীয় এলাকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী বিভিন্ন আঞ্চিক রাজ্যসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে পার্থক্য থাকিলেও এক জাতীয়তার ভাব তাহাদের মধ্যে থাকা আবশ্যক। সমজাতীয়তার ভাব না থাকিলে একটি রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। নাগরিকগণ যদি কেবলমাত্র নিজ নিজ রাজ্যের নাগরিক বলিয়া মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজদিগকে ভাবিতে না শিখেন, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব বৃদ্ধি পাইবে এবং শাসন সম্বন্ধীয় ঐক্য সত্ত্বেও একতার ভাব জন্মিবে না। গিলক্রাইষ্টের ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ হইবে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা এবং সম্পূর্ণ ঐক্যের জন্য রাষ্ট্র ও জাতীয়তার মধ্যে সীমানা সমান হওয়া প্রয়োজন।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে একতা বৃদ্ধির জন্য অধিবাসিগণের মধ্যে ভাষাগত ও ধর্মীয় ঐক্যের আবশ্যকতা নাই। কেননা কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডের আঙ্গিক রাজ্য সমূহের ভাষা ও ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় নাই।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজ্যগুলির মধ্যে একই ধরণের শাসন প্রণালী বর্তমান থাকা প্রয়োজন। কোন রাজ্যে একনায়কতন্ত্র আবার কোথাও বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ বাধিবার আশংকা থাকে। তাই ভারতে নূতন সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের পূর্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসান ঘটানো হইয়াছে।

চতুর্থত, আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনের পার্থক্য খানিকটা থাকিলেও ধনবল ও জনবলের পার্থক্য খুব বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কোন একটি রাজ্য যদি অন্যান্য রাজ্যগুলি অপেক্ষা ধনবল ও জনবলে শক্তিশালী হয় তাহা হইলে ছোট ছোট রাজ্যগুলি বড় রাজ্যটির মুখাপেক্ষী হইয়া কোনমতে টিঁকিয়া থাকে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সাম্রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলেও প্রুশিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার R. S. F. S. R. নামক আঙ্গিক রাজ্য বা সাধারণতন্ত্রেই দুই-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। ফলে তাহার প্রাধান্য না মানিয়া উপায় নাই। ভারতেও আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য জনবল ও আর্থিক সম্পদে অপেক্ষাকৃত হীনবল বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী।

পঞ্চমত, আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে সামাজিক রীতিনীতি-গত ঐক্য থাকা আবশ্যক। নচেৎ বিবাদ বিসম্বাদের আশংকা থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলিতে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত থাকায় এবং উত্তর আমেরিকার রাজ্যগুলি উহার বিপক্ষতা করায় আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল। ইহা অবশ্য ঠিক যে রোলার দিয়া পিষিয়া বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যের মধ্যে ঐক্যের ভাব বজায় রাখা যায় না। তথাপি বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্যভাব ফুটানো যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের ব্যবহারিক সর্ত হইল মন্ত্রিপরিষদে বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব। কোন রাজ্য হইতে যদি বহু মন্ত্রী বা অনুরূপ

ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে লওয়া হয় তবে অন্যান্য রাজ্যগুলি ক্ষুব্ধ হইতে পারে। অবশ্য আঞ্চলিকতা রক্ষা করিতে গিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই কর্তৃত্বভার দেওয়া হইবে না। তবুও জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়া আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন।

সর্বশেষে, অধ্যাপক ডাইসির মতটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য মানিয়া চলা প্রয়োজন। নচেৎ যুক্তরাষ্ট্র ভাঙিয়া পড়িবে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের সর্তাবলী ভারতে বর্তমান কিনা। বাস্তব নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের অবতারণা করা খুবই স্বাভাবিক। তবে এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সকল চিন্তানায়কগণ এই সকল ঘটনার পটভূমিকায় ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যথোপযুক্ত হয় নাই বলিয়া রায় দিতেছেন তাঁহারা অভ্রান্ত নহেন। কারণ আমরা যদি উপরোক্ত সর্তাবলীর আলোকে ভারতীয় অবস্থার আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের উপযোগী পরিবেশ এখানে আছে। ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি অখণ্ড দেশ। ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির নানা পার্থক্য থাকা সত্বেও ভারতীয় জনগণের মধ্যে তীব্র জাতীয়তা বোধ বিদ্যমান। আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর মিলন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত নিজেকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া চলিয়াছে এবং যুগপৎ অন্যের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হইয়া আঙ্গিক রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিবার জন্য পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি বংশানুক্রমিক স্বেচ্ছাতন্ত্র বিসর্জন দিয়া নিজেদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিয়াছে। জনবল ও ধনবলে বলীয়ান হইয়া কোন রাজ্য অন্যকে তাঁবেদার করে নাই এবং এখানে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতিরও খুববেশী প্রভেদ নাই। প্রত্যেক আঙ্গিক রাজ্যই সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টের রায় বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লয়। মন্ত্রিপরিষদ গঠনেও এখানে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এইসব সুবিধা থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে ভাষা ও বংশগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সব ঘটনার উদ্ভব হয় তাহা মোটেই যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল নহে। তবে আশা করা যায়, শিক্ষার প্রসার এবং পরস্পর একত্র উন্নয়ন কর্মে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের ভিত্তি ক্রমেই আরও দৃঢ় হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার অনুকূল অবস্থা ভারতে থাকিলেও, সংবিধানের দিক হইতে ভারতকে পুরাপুরি যুক্তরাষ্ট্র করা হয় নাই। রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা বলে কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, রাজ্যসভা কর্তৃক রাজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদকে আইন প্রণয়নের অধিকার প্রদান, রাজ্যের সম্মতি ছাড়াই তাহার সীমানা, নাম প্রভৃতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। অবশ্য এইরূপ এককেন্দ্রিকতা ভারতের স্বার্থে সংবিধান প্রণেতারা ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছেন।

Q. 85. Discuss the strength and weakness of Federation. (Cal. 1954)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন সাম্প্রতিককালের শাসন ব্যবস্থা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগ হইতে ইহার কয়েকটি গুণ ও ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

গুণঃ প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে একই সংগে মিলন ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা সাধারণ কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলি একত্র সমাধান করিতে পারে এবং সংগে সংগে নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখিয়া স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতে পারে। এখানে বৃহৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সুবিধাগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার অসুবিধাগুলি বর্জন করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ভিন্ন প্রকারের হইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, স্থানীয় শাসনের অধিকার স্থানীয় অধিবাসীদের উপর থাকার ফলে রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। বহুলোক শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। ইহা ভিন্ন স্থানীয় সমস্যা স্থানীয় ব্যক্তিরা যত ভাল বুঝিতে পারে দূরবর্তী কেন্দ্রীয় শাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা বোঝা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নানারূপ শাসনমূলক পরীক্ষা চালান যায়। কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলে একটি আইন

প্রণয়ন করিয়া তাহার সুবিধা-অসুবিধা পরীক্ষা করিয়া অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রেও তাহা বিবেচনা করা যায়। কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রের ভিত্তিতে এইরূপ পরীক্ষা চালান অনেক বেশি অসুবিধাজনক।

পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় শাসনের হাতে কয়েকটি বিষয় দিয়া বাকি বিষয় অংগরাজ্যগুলির হাতে রাখার ফলে কেন্দ্রে কোন স্বেচ্ছাচারী জবরদস্ত শাসনের উদ্ভব হইতে পারে না।

ষষ্ঠত, অর্থনৈতিক দিক হইতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিশেষ সুবিধাজনক। সাধারণ বিষয়সমূহ কেন্দ্রের হাতে থাকায় এই সব বিষয়ে অংগরাজ্যগুলিকে পৃথক দায়িত্ব বহন ও তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। ইহা ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র গঠন না করিয়া প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব রক্ষা করিলে পারস্পরিক সীমানা, শুল্ক বিরোধ প্রভৃতিতেও বহু অর্থ ব্যয় হইত।

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা পাশাপাশি অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া ঐক্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছে।

ত্রুটি : প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকার সরকার থাকায় এবং উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ায় সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন দুর্বল হইয়াছে। সকল বিষয়ে অংগরাজ্যগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী হইতে পারে নাই। পররাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত থাকার ফলে পরস্পর-বিরোধী আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার আশংকা থাকে। একই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, ক্ষমতা বিভাগের ফলে কোন একটি কার্যের দায়িত্ব কেন্দ্র বা রাজ্য কাহার, ইহা লইয়া বিবাদের সৃষ্টি হইতে পারে এবং কার্য সম্পাদনে অনর্থক বিলম্ব হয়।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি রাজ্য নিজেদের মধ্যে জোট বা উপ-দল সৃষ্টি করিয়া অন্যদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারে।

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সাধারণতঃ দুষ্পরিবর্তনীয় হয় বলিয়া ইহা

জনমতের প্রতি সর্বসময় মর্যাদা প্রদর্শন করিতে পারে না এবং জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করে।

উপসংহার—উপরোক্ত ত্রুটিগুলি থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রের গুণ বা সুবিধার তুলনায় ইহা নগণ্য। আর এই সব ত্রুটিগুলি সহজেই দূর করা যায়। একদিকে ভাষা, সংস্কৃতি, নিজস্ব জীবন ধারা প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছা এবং অপরদিকে প্রতিরক্ষা, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রের কলহ নিষ্পত্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির জন্য বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন—এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তিকে মিলিত করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বিশ্বরাষ্ট্রের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

Q. 86 What are the chief reasons for the present tendency towards federation ?

ভূমিকা—এককেন্দ্রিক শাসনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা অতি অল্পদিনের। কিন্তু ইহারই মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইহার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক ও সাবা কর্তৃক মালেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং আফ্রিকায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আগ্রহের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ রহিয়াছে।

কারণ সমূহ : (১) প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজেরা মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে এক জোট হইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু মিলিত হইয়াও প্রত্যেকে নিজেদের পৃথক পৃথক সত্তা বজায় রাখিতে চায়। ইহা কেবল যুক্তরাষ্ট্রেরই সম্ভব।

(২) একজাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়। কিন্তু জাতীয়তাবোধের সমতা থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের বিশিষ্ট সত্তা রক্ষা করিতে চায়। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রও তাই বর্তমানে এককেন্দ্রিক শাসনের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন গ্রহণ করিতেছে।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ইহার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্রে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। বিশেষ করিয়া

আফ্রিকা ও প্রাচ্যের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইহার প্রয়োজন খুবই বেশি। এই কারণেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে মিলনের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হইতেছে।

(৪) সমগ্র বিশ্ব আজ গণতন্ত্র গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট গোষ্ঠীকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী আত্ম নয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া গণতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে ভাঙিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করিলে ইহাদেরও উন্নতি হইবে না, আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদও থামিবে না। কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অঞ্চল সমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলে সহজেই এই সমস্যার সমাধান হয়।

উপসংহার—বহিঃরাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধ, ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয়তাবোধের বিকাশ, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন, সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা। সমগ্র বিশ্ব ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, বহু মনীষী এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

Q 87. Explain principles on which powers are distributed in Federations and account for the general tendency towards the increase of powers of federal governments.
(Cal. 1942)

ক্ষমতা বণ্টনের নীতি—যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগরাজ্যগুলির আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের দ্বারা ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু এই ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কে সকল যুক্তরাষ্ট্র একইরূপ নীতি গ্রহণ করে নাই। তথাপি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মোটামুটি সকল যুক্তরাষ্ট্রই এক নীতি অনুসরণ করিয়াছে।

(১) সমগ্র রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হয় এবং স্থানীয় বিষয়গুলির ভার আঞ্চলিক সরকারের উপর অর্পণ করা হয়। যে সব বিষয়ে প্রত্যেকটি রাজ্যে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক সে সম্পর্কে আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

(২) যে সব বিষয়ে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, যেমন—দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আদায়ের দ্বারা কিছু অর্থের সংস্থান, এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।

(৩) মুদ্রা প্রচলন, যোগাযোগ ও পরিবহন, ব্যাংক পরিচালনা, কপিরাইট,

পেটেণ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বত্র একইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয় বলিয়া সাধারণতঃ এইগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।

(৪) বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার হইলেও মোটামুটি সমতা রক্ষার জন্য অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে এইসব বর্তমানে যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। অর্থাৎ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইন কার্যকরী হইবে এবং রাজ্য আইন বাতিল হইবে।

(৫) সংবিধানে নির্দিষ্ট অধিকার ভিন্ন অবশিষ্ট বিষয়গুলি (Residuary powers) সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার নীতি অনুসরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই ক্ষমতাগুলি অংগরাজ্যকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ক্যানাডা ও ভারতে ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ—তত্ত্বের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইলেও, বর্তমানে অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা কোন অংশে কম নহে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

(১) নব্য ব্যবহারের আইন (New Deal Legislation)—মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এক আইন প্রণয়ন করাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। সুপ্রীম কোর্ট ও ইহার সপক্ষে রায় দেয়। এই আইন প্রণয়নের কারণ হইল জাতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কট। লেসলী লিপসন বলিয়াছেন যে এই আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছে। ইহার ফলে কেবলমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নহে, কেন্দ্র ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকারকে বিভিন্ন খাতে আর্থিক সাহায্য করে। কিন্তু ইহার সর্ত হইল এই যে সেই অর্থ কোন কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

(২) অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মতবাদ (doctrine of implied powers) অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মত অনুসারে একটি বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে এই কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সব বিষয়েই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে সংবিধানে লিখিত না থাকিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংক পরিচালনা, নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, কাগজী মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

(৩) বহু বিষয়ে আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারকেও যুগ্মাধিকার (concurrent powers) দেওয়া হইতেছে। এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী আইন প্রণয়ন করিলে কেন্দ্রীয় আইনই বজায় থাকিবে। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে অংগরাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বেশি ক্ষমতা দিয়াছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার একান্ত আবশ্যক।

(৫) বাণিজ্যিক প্রয়োজনেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বসতি যত ঘনত্ব লাভ করিতেছে জীবনধারণের সমস্যাও সেই পরিমাণ গভীর হইয়া উঠিতেছে। ফলে বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব নহে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের কোন হাত নাই। আজ কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যাপারে তৎপর হইতে হইয়াছে।

(৬) বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার ক্রমোন্নয়ন কেন্দ্রীয়সরকারকে শক্তিশালী করিয়াছে। বর্তমানে মার্কিন বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে যে বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইতেছে তাহা কিছুতেই রাজ্যসরকারের নেতৃত্বে সম্ভব হইত না।

(৭) অনেকে মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একে অন্যের পরিপূরক নয়। মতটিতে বোধহয় খানিকটা সত্যতা আছে। তথাপি এই যুক্তরাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করিতেছে। ইহার কারণ হইল এই যে পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য কেন্দ্রীয়

সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং আংশিক রাজ্যগুলির ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখযোগ্য। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

নানা কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য এবং এইজন্য অনেক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মনে করিতেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ভাঙিয়া এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ অধ্যাপক সেইট এর কথা বলা যাইতে পারে। তিনি মনে করেন যে ইহাই জৈবিক নিয়ম। কিন্তু তাঁহার মতটি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ আজ পর্যন্ত কোন যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই, বিপরীতটিই ঘটিয়াছে। ইহা ভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরিশেষে বরং বলা যাইতে পারে যে ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার

CABINET AND PRESIDENTIAL FORMS OF GOVERNMENT

Q. 88. What are the distinguishing marks of the Cabinet or Parliamentary type of government? Discuss its merits and demerits. (Cal. 1962)

Or What are the essential features of the cabinet form of government? How does the legislature exercise control over the executive in such a form of government?

(Cal .1956 Cal. Degree Part I 1963)

ভূমিকা—মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার জন্মভূমি ইংলণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন পার্লামেণ্ট সহ রাজা। একশত বৎসর পূর্বে আইন প্রণয়নে নেতৃত্বে দান করিত এই সার্বভৌমের অন্যতম অংশ পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদ। কিন্তু বর্তমানে এই ক্ষমতার অধিকারী হইল নিম্নপরিষদের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ পরিষদ। এই-মন্ত্রীপরিষদ প্রশাসনিক রীতিনীতিও নির্ধারণ করে। গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চিত্র ছিল পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার মন্ত্রীপরিষদ ব্যবস্থায় পরিণত হইবার দৃশ্য; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এই ব্যবস্থার কেবলমাত্র প্রবর্তনই হয় নাই মন্ত্রীপরিষদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছে।

মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেন না। তিনি আইনের দৃষ্টিতে ও প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রধান শাসনকর্তা মাত্র। আসলে শাসনের দায়িত্ব থাকে একটি মন্ত্রীপরিষদের হাতে। এই মন্ত্রীপরিষদ আইনসভার সদস্যের মধ্য হইতে গঠিত হয়। মন্ত্রীপরিষদ আইনসভা বা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার অধিকাংশের আস্থা হারাইলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। অপর দিকে মন্ত্রীসভা নিজেরাও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ভারতেও এইরূপ মন্ত্রীপরিষদ শাসিত বা পার্লামেণ্টারী সরকার প্রবর্তিত হইয়াছে।

গুণ—মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত বা পার্লামেণ্টারী সরকারে নিম্নলিখিত গুণগুলি দেখা যায়—

(১) আইনসভা ও মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে সুষম সহযোগিতার ভিত্তিতে সুশাসন সম্ভব হয়। প্রয়োজনীয় আইনসমূহ সহজে পাশ করা যায়। শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রীদের নিকট হইতে জানিতে পারেন।

(২) শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা জনস্বার্থ-বিরোধী কার্য করিলে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইনসভা তাহাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া এই শাসনের অবসান ঘটাইতে পারে।

(৩) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লইয়াই মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। ইহার ফলে মন্ত্রীরা নিজেদের সমর্থকদের সমর্থনের উপর ভরসা করিয়া আইন প্রণয়নের ও শাসন পরিচালনার কাজে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারেন। মন্ত্রীপরিষদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

(৪) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তিদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ত্রুটি—(১) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের প্রধান ত্রুটি, ইহাতে সরকারের স্থায়িত্ব সম্ভব হয় না। আইন সভায় দল পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব ঘটিলেই সরকারের পতন ঘটে।

(২) এই শাসন সাধারণত দলগত শাসন। দল ব্যবস্থার কুফল, অর্থাৎ, দলাদলি, ব্যক্তিগত মতের বিনাশ, যোগ্য ব্যক্তির উপেক্ষা প্রভৃতি এই শাসনকে কলুষিত করে।

(৩) আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন দল অনেক সময় অন্যায় পন্থা গ্রহণ করে এবং দলের মধ্যে একাধিক উপদল সৃষ্টি হয়,—স্বজন পোষণ, দুর্নীতি প্রভৃতি প্রশ্রয় পায়।

(৪) অনেক সময় কোন একটি দল আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না, ফলে একাধিক দলের মিলিত সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এইরূপ সরকার সর্বদাই দুর্বল হয়।

(৫) মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে মতভেদের ফলে অনেক সময় কার্য সম্পাদনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা খুবই অসুবিধাজনক।

(৬) এই শাসন-ব্যবস্থায় সকল বিষয়ে আইনসভার প্রাধান্য থাকায়, অনেক বিষয়ই আলোচনাসর্বস্ব হইয়া পড়ে। কাজ অপেক্ষা আলোচনাই এখানে বেশী হয়।

(৭) এক ব্যক্তির কর্তৃত্বের পরিবর্তে বহুসংখ্যক জনপ্রতিনিধির হাতে শাসন নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়ার জন্যই এই শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারের আদর্শ গ্রেট বৃটেনের দিকে তাকাইলে দেখা যায় সেখানেও প্রকৃতপক্ষে এক ব্যক্তি —অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর "স্বেচ্ছাচার" চলিতেছে।

কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নহে। মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য, কিন্তু সেই সংগে ইহাও সত্য যে এই ধরণের শাসন ব্যবস্থায় যে সকল ত্রুটির কথা বলা হইয়াছে তাহার সবকয়টিই সংশোধন যোগ্য। প্রথমতঃ, আইনসভায় দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্তনের ফলে যে প্রশাসনিক গোলযোগের আশংকা করা হইয়াছে তাহা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মোটেই প্রযুক্ত নহে। আর এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই পার্লামেণ্টারী সরকারের ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের সম্ভাবনা বরং মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত ব্যবস্থাতেই কম। কারণ মন্ত্রীপরিষদকে সকল প্রকার কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা আদৌ আলোচনা সর্বস্ব নহে। কারণ আলোচনার সময় সীমাবদ্ধ। চতুর্থতঃ, যুদ্ধ বা অনুরূপ আপৎকালীন সময়ে এই ব্যবস্থা অসুবিধাজনক বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাও সত্য নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কয়েকজন মাত্র সদস্য লইয়া যে 'যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন তাহাই এই সমালোচনাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়াছে। পঞ্চমতঃ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ খুবই কম। কারণ তিনি জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। মিশর আক্রমণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী এণ্টনী ইডেন যে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলে জনমতের চাপে তাহাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অধিকাংশ সমালোচনাই ভিত্তিহীন।

মন্ত্রীপরিষদের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ—মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদ সর্বতোভাবে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রথমত, আইনসভার সদস্য না হইলে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, আইনসভার সদস্যগণ যে কোন বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন করিতে পারেন এবং মন্ত্রীরা তাহার উত্তর দেন। তৃতীয়ত, আইনসভার অধিবেশন

চলাকালে শাসন-সংক্রান্ত কোন প্রধান নীতি সাধারণতঃ আইনসভাতেই প্রথম প্রকাশ করিতে হয়। চতুর্থত, সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব আইন-সভা অনুমোদন করে। পঞ্চমত, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মন্ত্রীপরিষদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। আস্থা হারাইলেই মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়।

তত্ত্বের দিক হইতে উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান। কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ পার্থক্য বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড বা ভারতে প্রবর্তিত মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। কেবলমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই নহে, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এবং ব্যবস্থাও এই কেন্দ্রী-করণকে সমর্থন করে। একটি উদাহরণ দিলেই অবস্থাটি সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীপরিষদ আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা হারাইলেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীপরিষদ সেই আস্থা হারায় না। কারণ বর্তমানে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের একমাত্র কাজ হইল আইনসভায় মন্ত্রীপরিষদকে সমর্থন করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দলীয় শাসন মন্ত্রীপরিষদকে অত্যধিকভাবে শক্তিশালী করিয়াছে। বিরোধীদল কেবলমাত্র সমালোচনাই করিতে পারে কিন্তু মন্ত্রীপরিষদকে পরাস্ত করিতে পারে না। আবার কোন সম্মিলিত মন্ত্রীসভা (coalition ministry) যদি আইনসভার আস্থা হারায় তখন মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দেন। উপরন্তু বর্তমান সময়াভাবের জন্য অনেক বিল আইনসভায় বিনা আলোচনায় কেবলমাত্র ভোটদ্বারা গৃহীত হয়। অতএব দেখা যায় যে জনমতের বিরোধিতা না করিলে মন্ত্রীপরিষদ অনায়াসে ক্ষমতায় আসীন থাকিতে পারে।

Q. 89. What are the distinguishing marks of the Presidential system of Government? In what respects it differs from the cabinet system? Discuss its merits and demerits? (Cal. 1940, 46.)

ভূমিকা—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার পিতৃভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন, "The President of the United States is more or less than a King, he is also both more or less than a Prime Minister." সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমিত হইলেও প্রশাসনিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া তাঁহার ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার হইল যৌথ শাসন আর রাষ্ট্রপতির শাসন হইল জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির একক শাসন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই ব্যবস্থার এবং ইহার রূপায়ণের মধ্যেই ইহার স্বকীয়তা বর্তমান।

সংজ্ঞা—রাষ্ট্রপতি পরিচালিত (Presidential) অথবা আইনসভার নিয়ন্ত্রণমুক্ত (non-parliamentary) শাসন-ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ আইন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। শাসন বিভাগের প্রধান বা অন্যান্য মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য নন এবং তাঁহাদের কার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ীও থাকেন না। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নাম-সর্বস্ব ক্ষমতাহীন শাসক নন, তিনি আইনগত ও বাস্তব উভয় দিক হইতেই প্রকৃতপক্ষে শাসক। তিনি জাতিরও প্রধান, সরকারেরও প্রধান।

রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকে। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত—তাঁহারা আইনসভার সদস্য নন, আইনসভার আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ করেন না। মন্ত্রীরা তাঁহাদের কাজের জন্য একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট দায়ী থাকেন। প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অর্পণ করা হয়।

দৃষ্টান্ত—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসন কার্য পরিচালনা করেন; তাঁহার অধীনে কয়েকজন মন্ত্রী বা সচিব (Secretary) থাকেন। তিনি বা তাঁহার কোন সচিব রাষ্ট্রের আইনসভা —অর্থাৎ কংগ্রেসের কোন কক্ষের নিকট দায়ী নন।

মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত সরকারের সহিত পার্থক্য—(১) মন্ত্রীপরিষদ

পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নামে মাত্র শাসক, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা আইন সভার নিকট দায়ীত্বশীল মন্ত্রীসভা ভোগ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনে রাষ্ট্রপ্রধান কেবল নামমাত্র শাসক নন, তিনি স্বয়ং শাসন বিভাগের প্রধানরূপে শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেন। (২) মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসনে মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য, কিন্তু এখানে মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য নন—আইনসভায় আইন প্রণয়ন বা আলোচনায় তাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন না। (৩) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের মন্ত্রীরা আইন সভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন এবং আইন সভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এখানে মন্ত্রীরা আইন সভার নিকট দায়ী নন, তাঁহাদের কার্যকাল আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর নির্ভর করে না। মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁহার নিকট দায়ী থাকেন। (৪) মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনে মন্ত্রীরা আইন-সভার নেতৃত্ব করেন এবং প্রধান আইনসমূহের খসড়া তাঁহারাই উত্থাপন করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনে মন্ত্রীরা এই কার্য করেন না। (৫) মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারে মন্ত্রীপরিষদ ও আইনসভা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একে অপরকে ভাঙিয়া দিতে পারে। আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং মন্ত্রীপরিষদ ইচ্ছা করিলে আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনে এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের গুণ—(১) সরকারের স্থায়িত্ব এই শাসন ব্যবস্থার প্রধান গুণ। সরকারের কার্যকাল আইন সভার আস্থা-অনাস্থার উপর নির্ভরশীল নয় বলিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার পরিবর্তনের কোন আশঙ্কা থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি একবার নির্বাচিত হইলে পুনর্নির্বাচন পর্যন্ত, অর্থাৎ চার বৎসর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া দেশ শাসন করিতে পারেন।

(২) একজনের হাতে সকল ক্ষমতা থাকে বলিয়া তিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সমূহ দ্রুত গ্রহণ করিতে পারেন। যুদ্ধ প্রভৃতি জাতীয় সংকটের সময় এইরূপ শাসন বিশেষ উপযোগী।

(৩) প্রধান শাসককে তাঁহার ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য আইনসভার

সংখ্যাধিক দলের সমর্থনের অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহাতে তাঁহার পক্ষে দলাদলির উর্ধ্বে থাকিয়া দেশ শাসন করা সম্ভব হয়।

(৪) আইন সভার কার্যে মন্ত্রী পরিষদের হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা না থাকায় আইন সভা নির্বিঘ্নে আইন প্রণয়নের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে।

ত্রুটি—(১) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন ও বিপজ্জনক সরকাররূপে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে থাকে বলিয়া এইরূপ শাসনে শাসন বিভাগীয় স্বেচ্ছাচারিতার সৃষ্টি হইতে পারে।

(২) পুনর্নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া অনেক সময় অযোগ্য শাসককে অপসারিত করা যায় না। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসনে আইনসভা উচিত মনে করিলে যে কোন সময় মন্ত্রীপরিষদের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারে।

(৩) শাসন ও আইন বিভাগকে পরস্পর পৃথক রাখার ফলে কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি এক দলের মনোনীত ব্যক্তি এবং আইনসভায় অপর দলের সংখ্যাধিক্য থাকিলে এই অবস্থার সৃষ্টি হইবার বিশেষ আশংকা থাকে।

(৪) শাসন ও আইন বিভাগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া রাখিলে সুশাসন হইতে পারে না। পরস্পর যোগাযোগের অভাবে শাসন পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন, উভয় কার্যই খারাপ হয়।

মন্তব্য—(১) মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় জরুরী অবস্থা ও সংকটকালে মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসন অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসনই ভাল।

(২) রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কথা ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আইনসভায় তাঁহার দলভুক্ত সদস্য ও আইনসভায় বাণী প্রেরণ প্রভৃতির দ্বারা আইনসভার কার্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। আবার বিপরীতদিকে আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন নীতির সমালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ অনুমোদন,

অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর প্রভৃতি ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রপতির কার্যকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও প্রশাসনের বাস্তব অবস্থাকে মানিয়া লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে 'ভারসাম্যের নীতি'ও গৃহীত হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে আইনসভা ও শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রীম কোর্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সজ্ঞা ভিন্ন জনমতের চাপও শাসনযন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাচারকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য তত্ত্বের দিক ছাড়িয়া দিয়া বাস্তব অবস্থার কথা আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে বর্তমানে সরকারের কোন অংশেরই স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ নাই। কারণ একটি অংশ অপর অংশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অবশ্য উপসংহারে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর তুলনায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। কারণ আইনগত ক্ষমতা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বেশী হইলেও তাঁহার কোন বিচার বিষয়ক ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডের রাজা যে সকল বিচার বিষয়ক ক্ষমতা লাভ করে তাহার প্রায় সকল ক্ষমতাই মার্কিন রাষ্ট্রপতির করতলগত। তাই আধুনিক বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করা হয়।

Q. 90. Critically examine the respective merits and defects of bureaucratic and popular governments.

ভূমিকা—আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থার অধিকাংশ ত্রুটিবিচ্যুতিই আমলাতন্ত্রের ফল। আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যাহার ফলে অনেকে ইহাকে গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের অনুরূপ তৃতীয় কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রায় সেই ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান প্রশ্নের অবতারণা। কিন্তু প্রথমেই এই প্রসংগে বলিয়া রাখা উচিত যে আমলাতন্ত্র গণতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রের মত নূতন কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব নহে।

সংজ্ঞা—আমলাতন্ত্র বা রাষ্ট্র-কৃত্য শাসন বলিতে এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝায় যেথানে প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্যতঃ একদল স্থায়ী সরকারী

কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং মনোনয়নের ভিত্তিতে এই সকল কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে তাঁহারা নির্ধারিত বয়সকাল পর্যন্ত সরকারী কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। আংশিকভাবে জ্যেষ্ঠত্ব ও আংশিকভাবে যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া এই কর্মচারীদের পদোন্নতি হইয়া থাকে। এই ধরণের সরকারী কার্য বৃত্তিমূলক। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব অথবা জনমত অনুসারে কাজ করার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ভারতে ইংরেজ শাসনের সময়ে আই. সি. এস. (I. C. S.) কর্মচারীদের শাসন এইরূপ আমলাতন্ত্রী শাসনের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

গুণ—(১) আমলাতন্ত্রী শাসনের প্রধান গুণ হইল যে কর্মচারী উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশ শাসনের কাজ ভালভাবে পরিচালিত হয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি বিশেষ রীতির উদ্ভব ঘটে। (২) সাধারণতঃ কর্মচারীরা দীর্ঘকাল নিজেদের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া কর্মে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, "bureaucracy accumulates experience, acquires well-tried and well-considered traditional maxims, and provisions for appropriate practical knowledge in those who have the actual conduct of affairs." (৩) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় ইহা অনেক বেশী সুনিপুণ। (৪) একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মচারীরা কাজ করেন বলিয়া আমলাতন্ত্রে সেনাবিভাগের ন্যায় নিয়মানুবর্তিতা পরিলক্ষিত হয়। (৫) কর্মচারীরা কোন দলের সহিত যুক্ত নন বলিয়া দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিয়া দেশ শাসন করিতে পারেন।

ত্রুটি—কয়েকটি গুণ থাকিলেও আমলাতন্ত্রের বহুবিধ ত্রুটি রহিয়াছে। (১) বার্ক বলিয়াছেন, আসল জিনিসের পরিবর্তে বাইরের আবরণের দিকেই আমলাতন্ত্রের ঝোঁক বেশী। ইহারা বড় বেশী রুটিন-মাফিক কাজ করিতে চান। মিলও বলিয়াছেন, এই শাসন অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠার রোগে ভোগে ("the disease which affects bureaucratic government and of which they die, is routine" (২) আমলাতন্ত্র কাজের পরিবর্তে আড়ম্বর ও ঠাঁট বজায় রাখিবার দিকে বেশী নজর দেয়। ফলে তাঁহাদের পক্ষে কোন নূতন কাজে ব্রতী হওয়া বা কাজের সুবিধার জন্য কোনরূপ

পরীক্ষা করাও সম্ভব হয় না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন "They become afraid of initiative and experiment and they tend to think that immunity from attack is the proof of a well-ordered department." অর্থাৎ নূতন কোন কাজে ব্রতী না হওয়ার অর্থ সুশাসক। (৩) রুটিনমাফিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হওয়ায় কর্মচারিগণ শাসনক্ষেত্রে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন না এবং তাঁহারা সাধারণতঃ প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার বিরোধী হন। (৪) জনসাধারণের সংগে এই কর্মচারীদের বিশেষ কোন যোগাযোগ না থাকায় জনসাধারণের অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালিত হয় না। আর রুটিন মানিয়া চলিলে ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের পক্ষে গণঅভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। আমলাতন্ত্রের ফলে ইঁহারা 'নিয়মের দাস' রূপে পরিগণিত হন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৃটিশ আমলে একজন সামান্য চাপরাশী নিয়োগ করিতে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইত। যতদিন না পাওয়া যাইত কাজ বন্ধ থাকিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র মোটেই ফলবতী নহে।

গণতান্ত্রিক শাসনের সহিত আমলাতন্ত্রের পার্থক্য—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে গণতন্ত্রের সহিত আমলাতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার কোন সুযোগ নাই। গণতন্ত্র হইল একটি সামাজিক ব্যবস্থা আর আমলাতন্ত্র হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুফল। তথাপি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায় আলোচনার খানিকটা সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

আমলাতন্ত্রে শিক্ষিত কর্মচারীর দল শাসন কার্যের নীতি নির্ধারক ও তাহার প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনে এই ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের নির্ধারিত প্রতিনিধিদের হাতে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ না হইলেও জনসাধারণের সমস্যা তাঁহারা ভাল জানেন এবং জনসাধারণের আশা-আকাংখার প্রতিনিধি-রূপে নূতন নূতন কর্মনীতি তাঁহারা উদ্ভাবন করিতে পারেন। সুতরাং, আমলাতান্ত্রিক শাসন অপেক্ষা গণতান্ত্রিক শাসন শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও আমলাতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং ইহার প্রতিফলন

ঘটিয়াছে প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। বিজ্ঞান ও কারিগরী ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আর জটিল অবস্থায় বিশেষিকৃত শিক্ষায় অনভিজ্ঞ জনসাধারণের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনায় অক্ষম। সকল সময়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞ কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটে নাই। যদি কর্মচারীরা প্রকৃত শিক্ষিত হন তবে উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তাঁহারা সেই শিক্ষালাভ করেন না, আর দেশের উন্নতিও ব্যাহত হয়। বর্তমান ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই মহাত্মা গান্ধী কেবল বৃটিশশাসনেরই অবসান চাহেন নাই তাহাদের সৃষ্ট শাসন ব্যবস্থারও অবসান চাহিয়াছিলেন।

তবে গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের প্রকৃত সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে শাসন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের অধিকার থাকিবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে, কিন্তু এই নীতি কার্যে প্রয়োগের ভার থাকিবে একদল শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের উপর। অধ্যাপক ল্যাস্কি আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে এইসকল কর্মচারীরা যদি জনমতকে গ্রাহ্য করিয়া কাজ করেন তবেই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

[SEPARATION OF POWERS]

Q. 91 Explain the theory of separation of powers. In what sense and with what limitations is the theory true? Is it necessary to secure the true liberty of the individual?

(Cal. 1932, 41, 43)

"The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle of government, but it is not one to be desired in practice"—Discuss. (Cal. 1932, 41, 43)

How far is it possible and desirable to carry out the principle of separation of powers in the governmental organisation of a state? (Cal 1959)

Discuss the value and limitations of the doctrine of separation of powers. (Cal. 1959)

ভূমিকা—ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ইতিহাস খুব বেশী দিনের না হইলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পৃথক করিবার কথা অ্যারিষ্টলের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অ্যারিষ্টটল, সিসেরো, পলিবিয়াস প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং মধ্যযুগের ইতালীস্থ পাডুয়ার মারসিগলিয়ো সরকারের তিনটি বিভাগরূপে আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা কেহই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেন নাই, কাজের সুবিধা ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তাঁহারা কর্মবণ্টনের পক্ষপাতী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম ফরাসী লেখক বোঁদা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে একই ব্যক্তি যদি আইন প্রণয়ন করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাহা হইলে নিষ্ঠুর আইন তৈয়ারী করিয়া তিনি নির্দয়ভাবে উহা প্রয়োগ করিতে পারেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে রক্তহীন বিপ্লবের পর জন লকও মোটামুটিভাবে বোঁদার মত সমর্থন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্ক্যু ইহাকে পূর্ণাংগ রূপ দেন। ইংরেজ লেখক ব্ল্যাকষ্টোন ও মার্কিন লেখক হ্যামিলটনও এই মতের বিশেষ সমর্থক।

সংজ্ঞা—এই মতবাদ অনুসারে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ লইয়া সরকার গঠিত। এই তিনটি বিভাগকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত না করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং ইহাদের কর্তৃত্বও ভিন্ন হইবে।

একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির হাতে সরকারের তিনটি বিভাগ থাকিলে কোন বিভাগের কাজই ঠিকমত পরিচালিত হইবে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দিক হইতে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মন্তেস্ক্যু বলিয়াছেন, একই ব্যক্তি আইন প্রণয়ন, উক্ত আইনের প্রয়োগ ও তাহার বিচারের অধিকারী হইলে সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবে এবং দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পাইবে। মন্তেস্ক্যুর মতে কোন ব্যক্তির হাতে অধিক ক্ষমতা দান করিলেই সে সেই ক্ষমতার অপ্রয়োগ করে ("constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it, and to carry his authority until he is confronted with limits." The spirit of the Laws.) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম সমর্থক ব্ল্যাকষ্টোন বলেন যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে আইনতৈয়ারী ও প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। ক্ষমতার নিয়মই তাই। ক্ষমতার আলোচনা প্রসংগে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ম্যাকাইভ্যার প্রমুখ চিন্তানায়কগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই মন্তেস্ক্যু ও ব্ল্যাকষ্টোন সুশাসন ও স্বাধীনতার জন্য সরকারের ক্ষমতা সমূহকে স্বতন্ত্র করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

উৎস—মন্তেস্ক্যু ছিলেন ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর সময়কার দার্শনিক। চতুর্দশ লুই-এর স্বেচ্ছাচারিতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে তিনি নিজেকেই রাষ্ট্র হিসাবে পরিচয় দেন ("I am the state.")। এই সময় মন্তেস্ক্যু একবার ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার চরম বিকাশ দেখিয়া তিনি মনে করেন যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই মন্তেস্ক্যু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রচার করেন।

প্রয়োগ—মন্তেস্ক্যু, ব্ল্যাকষ্টোন প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদ প্রচার করিবার পর বিভিন্ন দেশ ইহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই নীতিতে গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণাটি সুস্পষ্ট হওয়ায় ইহা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে পরিণত হয়। এই মতবাদটি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে সজীবতা দান করে।

কেবলমাত্র তাহাই নহে বিপ্লবকালীন প্রত্যেক শাসনব্যবস্থাতেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। নেপোলিয়ানের সময় সাময়িকভাবে এই নীতি ব্যাহত হইলেও জনসাধারণের মনে ইহার বীজ নিহিত ছিল। এমন কি আজও জনগণ ইহাকে অন্যতম শাসনতান্ত্রিক নীতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির চরম বিকাশ ঘটে মার্কিন সংবিধানে।

সমালোচনা—সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই নীতি অনেক পণ্ডিত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা অবৈজ্ঞানিক নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক রবসন স্পষ্টভাষায় এই মতবাদকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নীতির গজরথে চড়াইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাংবিধানিক আইনের লেখকগণ কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন।

(১) সরকারকে তিনভাগে বিভক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকের মতে, সরকারকে তিনটির পরিবর্তে দুইটিভাগে বিভক্ত করা উচিত—আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা একটি বিভাগ আর বিচার ব্যবস্থা অপর একটি বিভাগ। আবার কেহ কেহ চারটি বিভাগের কথা বলিয়াছেন—আইন, শাসন, বিচার এই তিনটি বিভাগের সহিত তাঁহারা চতুর্থ বিভাগরূপে নির্বাচকমণ্ডলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ চরম স্বতন্ত্রীকরণ নহে। অধ্যাপক বার্কারের মতে স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ বিশেষীকরণ। অর্থাৎ সরকারের তিনটি বিভাগ এক একটি কাজ করিবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে কোনটির সহিত কোনটির সম্বন্ধ থাকিবে না। কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি মানবদেহের মত। দেহের অংগপ্রত্যংগসমূহের মত সরকারের বিভাগগুলিও একটি অপরটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহাদের পৃথক সত্তার কথা বিবেচনা করা যায় না। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন যে এই পৃথকীকরণের ফলে কর্মক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৩) সরকারের বিভাগগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। একের সহযোগিতা ভিন্ন অপরের কাজ ভালভাবে চলিতে পারে না। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্যই আইনের প্রয়োজন, কিন্তু শাসন সম্পর্কে শাসন বিভাগের পরামর্শ ভিন্ন আইন বিভাগ সেই আইন কিরূপে প্রণয়ন করিবে? আইনসভার অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে, তখন কোন কারণে জরুরী কোন আইন

প্রস্তুত করিতে হইলে শাসন বিভাগকেই তাহা করিতে হয়। বিচারকালে আদালতের নূতন ব্যাখ্যার মধ্য হইতে নূতন নূতন আইনের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(৪) সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলেও তিনটিই সমান ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণতন্ত্রের বিকাশের সংগে সংগে শাসনবিভাগ আইনবিভাগের অনুজ হিসাবে বিবেচিত হয়। আইন বিভাগই এখন প্রশাসনিক নীতির নির্ধারক। প্রশাসনিক আয়ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য আইনসভাও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য।

(৫) স্বাধীনতার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন, এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাধীনতার বিকাশের জন্য সরকারের ক্ষমতা পৃথক করিবার প্রয়োজন হয় না, ইহার জন্য দরকার নাগরিকদের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা রক্ষার ইচ্ছা। ইংলণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কোন চেষ্টা না করিয়াও নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

(৬) বাস্তব ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি কার্যকরী হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নামে 'কর্মবণ্টন নীতি' গৃহীত হইয়াছে। তবুও সেখানে আইন বিভাগ, কংগ্রেস সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, অনুমোদন, বাজেট পাশ প্রভৃতির দ্বারা শাসনবিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করে, শাসন বিভাগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ ও দলীয় সমর্থকদের সাহায্য প্রভৃতির দ্বারা আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করেন, আর বিচারবিভাগ অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিচারের রায় প্রদানের দ্বারা নূতন নূতন আইন সৃষ্টি করে।

(৭) সামগ্রিক (Totalitarian) বা গণতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থাতেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কারণ এই নীতি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করে। সোভিয়েত লেখক ভিসিনস্কি বলেন, "...from top to bottom the Soviet social order is penetrated by the single general spirit of the oneness of authority of the toilers. The programme of the All-Union Communist Party rejects the bourgeois principle of separation of powers."

অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে নাই। কারণ বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা এবং কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সরকারী কর্মোদ্যমের ব্যাপ্তিকে উৎসাহিত করে।

(৮) পুরাতন মতকে স্বীকার করিয়াও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে গ্রহণ করা যায় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে তবে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী।

(৯) মন্তেস্ক্যু নিজেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ চাহেন নাই। গ্রেট বৃটেনের শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি আদর্শ শাসন-ব্যবস্থারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তিনি ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় কোনদিনই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি কার্যকরী হয় নাই।

গুরুত্ব—ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে এবং কোন রাষ্ট্রেই ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয় নাই। স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এবং ইহার কোন প্রয়োজনও নাই, ইহাই সমালোচকদের বক্তব্য। কিন্তু সকল সমালোচনাই 'ক্ষমতা' কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছে। ইহার আদর্শকে কিন্তু কেহ বিশেষ সমালোচনা করেন নাই। সকল সমালোচকই মোটামুটিভাবে এই কথা বলিয়াছেন যে 'ক্ষমতা'র বণ্টনে 'ক্ষমতা'র দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য সরকারকে কতকগুলি কাজ করিতে হয়। কিন্তু সেই কাজকে যদি আমরা 'ক্ষমতা' আখ্যা দিই তাহা হইলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। কারণ ক্ষমতা কথাটির সহিত বলপ্রয়োগের একটি ভাব বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। তাই আমরা যদি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যবহার করি তবে মোটামুটিভাবে ইহার আদর্শকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর মন্তেস্ক্যুও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলিতে কর্মবণ্টন নীতিই বুঝাইয়াছেন। তথাপি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হিসাবেও ইহার গুরুত্ব একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। এই মতবাদ একদিন ইউরোপের শাসকদের হাত হইতে আইন প্রণয়ন ও বিচারের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ না হইলেও অর্থনীতির শ্রমবিভাগের ন্যায় কর্ম-বিভাগেরও প্রয়োজন আছে। পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিবে। তৃতীয়ত, অন্তত বিচার বিভাগকে অন্য দুইটি বিভাগ হইতে যথাসম্ভব পৃথক করিবার স্বপক্ষে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম প্রধান রক্ষা কবচ।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

ORGANS OF THE GOVERNMENT

Q. 92. Describe the functions of a modern legislature.

ভূমিকা—সাধারণ নিয়মে আইনসভা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একই ধরণের কাজ করে না। এই কাজের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে সরকারের রূপের উপর নির্ভর করে। যদি দেশে চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে বাস্তবিকভাবে আইনসভার কোন অস্তিত্বই থাকে না অথবা আইনসভাকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া কাজ করিতে হয়। সামগ্রিক রাষ্ট্রেও আইনসভার খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষতঃ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে আইনসভার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসনবিভাগের সমান ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ যেখানে পারস্পরিকভাবে একটির উপর আরেকটির নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে। স্নুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন দেশে আইনসভা বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। তথাপি মোটামুটি-ভাবে আইনসভার কাজগুলি প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) আইনসভার প্রথম কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। বর্তমানে আইন হইল জনমতের প্রতিফলন। সুতরাং জনমত অনুসারে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে জনপ্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। এই আলোচনার মধ্য দিয়াই আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজন বোধে আইনসভা কোন আইনের সংশোধন কার্যও করিয়া থাকে। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং তাহার উপর আলাপ-আলোচনা হইয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার ব্যবস্থায় আইনের খসড়া তৈয়ারীর ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ বা শাসন বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই।

(২) আইনসভার প্রকৃত কাজ হইল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা এবং কোন দেশেই আইনসভা প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে না।

কিন্তু পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় ইহার কিছু ব্যতিক্রম আছে। এখানে আইনসভা শাসন বিভাগকে প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রীরা আইন-সভার সদস্য; তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। বিভিন্ন কার্যের জন্য মন্ত্রীদের আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চতর পরিষদ সিনেটের অনুমোদন ভিন্ন উচ্চতর সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপর রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সেনেটের অনুমোদন লাভ না করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তন 'লীগ অব নেশন্‌সে' যোগদান করিতে পারে নাই।

(৩) আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইল আইনসভার অন্যতম প্রধান কাজ। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সহিত পার্লামেন্টের বিরোধ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণের জোরে পার্লামেন্ট সেই বিরোধে জয়লাভ করে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের মূলকথা হইল এই যে, জাতীয় অর্থ ও সম্পদের উপর জনসাধারণ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। সেই সংগে আরও একটি কথা স্বীকৃত হইয়াছে যে কোন দেশে প্রতিনিধিদের সম্মতি ভিন্ন কর ধার্য করা যাইবে না। ইহা ভিন্ন রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট অনুমোদন আইনসভার অন্যতম প্রধান কার্য। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে আইনসভা আসলে শাসনের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(৪) আইনসভার অর্থনৈতিক ক্ষমতার আলোচনা প্রসংগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখযোগ্য। আইনসভার শাসনবিষয়ক ক্ষমতার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে আইনসভার অনুমোদন ভিন্ন যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি সম্ভব নহে। এই ব্যবস্থার প্রধান কারণটি অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত জড়িত। যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য যে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হইবে সে সম্বন্ধে যদি আইনসভা দায়িত্ব গ্রহণ না করে তবে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই দেশের অর্থনৈতিক সঙ্গতি এই সকল কাজকে সমর্থন করে কিনা জানার জন্যই আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

(ঙ) আইনসভা অনেক সময় বিচারালয়ের কার্যও করিয়া থাকে। গ্রেট বৃটেনে পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ লর্ড সভা হইল সর্বোচ্চ আপীল আদালত। অনেক ক্ষেত্রে আইনসভা বিভিন্ন কমিটি গঠন করিয়া রাষ্ট্র শাসনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারীদের (যেমন রাষ্ট্রপতি) সম্পর্কে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে আইনসভা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ও বিচারের ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ আদালতের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

এই সকল প্রধান কার্য ভিন্নও আইনসভা আরও কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে—

(ক) আইনসভার হাতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাও রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানেও আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন।

(খ) আইনসভা নির্বাচক মণ্ডলী হিসাবেও কাজ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভারতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচকমণ্ডলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতি ৪ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ভোট গণনার জন্য কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যদি কোন প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া নির্বাচিত না হন তখন কংগ্রেসের নিম্নপরিষদ প্রতিনিধি সভা সমসংখ্যক ভোট প্রাপ্ত তিনজন প্রার্থীর মধ্য হইতে একজনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে। উপ-রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেও এরূপ দুই জনের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি সভা কর্তৃক মনোনীত হন।

(গ) ভারতীয় পার্লামেন্ট সুপ্রীম কোর্ট বা কোন হাইকোর্টের বিচারপতিকে দুইটি পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অকর্মণ্যতা, সংবিধান বিরোধী কার্য বা অনুরূপ অভিযোগের দায়ে বরখাস্ত করিতে পারে।

আইনসভা উপরোক্ত কার্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আইনসভার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এই বিভাগের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অধিক।

Q. 93. What are the advantages and disadvantages of a bicameral system of legislature ? **(Cal. 1938, 43, 44, 62)**

Give the case for and against a single chamber legislature.

Is a second chamber indispensable in a federal constitution. **(Cal. 1944)**

ভূমিকা—বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত—একটিকে বলা হয় উচ্চ পরিষদ, অপরটি নিম্ন পরিষদ। পার্লা মেণ্টারী ব্যবস্থার স্রষ্টা গ্রেট বৃটেনের অনুসরণে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করায় পরবর্তী যুগে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র এই পথ অনুসরণ করিয়াছে। অনেক রাষ্ট্র আবার এক পরিষদীয় আইনসভার কার্যে অসুবিধা বোধ করায় দ্বি-পরিষদীয় আইনসভা গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য ইহাতে এই কথা প্রমাণিত হয় না যে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই একমত বা বর্তমান ও আগামীদিনের প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া দরকার। বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধ মত দেখা যাইতেছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতপার্থক্য অত্যন্ত বেশী। এই ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা আমাদের বর্তমানে আলোচনার বিষয়বস্তু হইলেও আলোচনার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

উৎস—বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে ইংলণ্ডে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিরা একত্রে বসায় নিম্নপরিষদ, কমন্স সভার উদ্ভব হয় এবং উচ্চস্তরের পাদরিরা ও বিশপেরা বংশানুক্রমিক অভিজাতবর্গের সহিত মিলিত হইয়া লর্ড সভা গঠন করে। এইরূপ না হইলে স্পেন, পর্তুগাল ও প্রাচীন ফরাসী দেশের মত তিন চারটি করিয়া আইনসভার কক্ষ সৃষ্টি হইত। সুতরাং দ্বিপরিষদযুক্ত আইনসভা অনেকটা আকস্মিক ঘটনার ফল। যুক্তি বিচার করিয়া পরিকল্পনা সহকারে কেহ দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে নাই। কিন্তু একবার স্থাপিত হইবার পর অন্যান্য দেশে ইহাকেই স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

সুবিধা—(১) এক পরিষদ বিশিষ্ট আইনসভা অনেক সময় দায়িত্বজ্ঞান-হীন হয়। লীকক বলিয়াছেন, সাময়িক উত্তেজনা ও জনমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এক পরিষদ অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অপর একটি পরিষদে ইহার পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকিলে তখন এই উত্তেজনার প্রভাব নাও থাকিতে পারে।

(২) লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, সকল আইনসভার স্বেচ্ছাচারী হইবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এক পরিষদের হাতে সকল ক্ষমতা থাকিলে

দেশে স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অপর একটি পরিষদ থাকিলে এই আশঙ্কা থাকে না।

(৩) আইনের বিভিন্ন বিষয় ও তাহার খুঁটিনাটি ব্যাপার একটি পরিষদে আলোচনার পরিবর্তে দুইটি পরিষদে আলোচনা করিলে এই আলোচনা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়।

(৪) আইনসভার উচ্চপরিষদে মনোনয়ন ও পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা গুণী, জ্ঞানী ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা যায়। সাধারণ নির্বাচনে ইঁহারা সাধারণতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন না। কিন্তু আইনসভায় ইঁহাদের উপস্থিতি ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা আইন প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করে।

(৫) দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সমর্থকরা মনে করেন যে, প্রধানতঃ দুইটি কারণে যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভায় দুইটি পরিষদ থাকা আবশ্যক। প্রথমত, এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলি সমান প্রতিনিধিত্ব পাইবে; দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে যে সকল অধিকার অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় দ্বিতীয় পরিষদ উহা সংরক্ষণ করিবে।

অসুবিধা—উপরে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই খণ্ডন করা যায়। (১) আইন প্রণয়নের কাজ একটি পরিষদের হাতে থাকিলে তাড়াহুড়ার পরিবর্তে ধীরেসুস্থে আইন প্রণীত হয় বলিয়া যে দাবী করা হয় তাহা ঠিক নহে। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন, বর্তমানে এমনিতেই একটি আইন প্রণয়নকালে আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে নানা আলোচনা হয় এবং ফলে প্রয়োজনীয় বিলম্ব হয়। ইহার পর আর দ্বিতীয় পরিষদে আলোচনার দ্বারা বিলম্ব ঘটাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

(২) বলা হইয়াছে যে, একপরিষদীয় আইনসভা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। কিন্তু উচ্চ পরিষদ থাকিলেই নিম্নপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না। ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে ইংলণ্ডের লর্ডসভা বা ক্যানাডার সেনেটের ন্যায় মনোনীত পরিষদের পক্ষে গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচিত নিম্নপরিষদকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এই পরিষদ যদি নিম্নপরিষদের ন্যায় একইভাবে নির্বাচিত হয় তবে অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। আবার যদি অন্য কোন ভাবে গঠিত হয় তবে সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি

হয়। তৃতীয়ত, বৃত্তিগতভাবে উচ্চপরিষদ গঠিত হইলেও কোন সুবিধা হয় না। কোন ব্যক্তি খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বা অধ্যাপক বা শিল্পী হইলেই যে যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। উপরন্তু দলব্যবস্থার কার্যকারিতায় ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বও ফলপ্রসূ হইবে না। খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহাকে দলীয় নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। আর এই একই দল নিম্নপরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকে। সুতরাং দুই পরিষদের মধ্যে কোন পার্থক্য সম্ভব নয়।

(৩) দ্বিপারিষদ ব্যবস্থার সমর্থকগণ মনে করেন যে, এই ব্যবস্থায় আইনের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র বিশেষজ্ঞগণই আইনের খুঁটিনাটি বিচার করিতে পারেন। এইজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে 'কমিটি ব্যবস্থা'র প্রবর্তন করা হইয়াছে। উচ্চ পরিষদ এই ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারে না।

(৪) উচ্চ পরিষদে বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী। সকল মানুষই সমান, সুতরাং কাহারও বিশেষ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নাই। পরোক্ষভাবে ও বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া উচ্চপরিষদ গঠনের দ্বারা জনমতের গতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা হয় বলিয়া ইহা সমর্থনযোগ্য নহে।

(৫) আইনসভা জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে। কোন বিষয়ে দুই পরিষদ ভিন্নমত প্রকাশ করিলে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে বলিয়াছেন "উচ্চপরিষদ যদি নিম্নপরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা অনাবশ্যক, আর যদি উহার সহিত উচ্চপরিষদের মতভেদ হয়, তবে ইহা ক্ষতিকর।" ("If the second chamber agrees with the first it is superfluous ; if it disagrees, it is pernicious.")

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের জন্য উচ্চপরিষদ একান্ত প্রয়োজনীয়, এই যুক্তিও আধুনিক লেখকগণ স্বীকার করেন না। কারণ দলীয় ব্যবস্থার প্রভাবে উচ্চপরিষদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, উচ্চপরিষদে সমান প্রতিনিধিত্ব নহে, লিখিত সংবিধান, আদালতের বিচার প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির অধিকার বিশেষভাবে রক্ষা করে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উচ্চপরিষদ হিসাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এত বেশী ক্ষমতাশালী নহে। ইহার আকারগত ক্ষুদ্রতা, সভ্যসংখ্যার

স্বল্পতাই ইহাকে এতবেশী ক্ষমতাশালী করিয়াছে। উপরন্তু সেনেটের নির্বাচন পদ্ধতি ও কার্যবিধিও ইহার ক্ষমতাশালী হইবার অন্যতম কারণ।

উপসংহার—এত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা বর্তমান রহিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মাতৃভূমিও বাদ পড়ে নাই। যুগ যুগ ধরিয়া যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যে কিছুমাত্র গুণ নাই, একথা স্বীকার করা যায় না। এই ব্যবস্থার বয়স্কালই ইহার সাক্ষ্য। তত্ত্বগত আলোচনায় আমরা দ্বিতীয় পরিষদ থাকিবার কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাইতেছি না কিন্তু বাস্তব জীবনের জাতীয় চেতনার কোন এক কোণে নিশ্চয়ই ইহার উপকারিতা লুকাইয়া আছে। যুক্তি যেখানে সীমাবদ্ধ অবচেতন মনের সমর্থন সেখানে সীমাহীন। এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁহারা বলেন যে দ্বিতীয় পরিষদ ধনী ও পুঁজিপতিদের কায়েমীস্বার্থের সংরক্ষক। ইংলণ্ডের লর্ডসভার ক্ষেত্রে উক্তিটি কিছুটা সত্য। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াতেও দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। মোটকথা, শ্রেণীস্বার্থ, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সম-স্বার্থ, শিক্ষিত শ্রেণীর বিশেষ মর্যাদার অনুভূতি প্রভৃতি নানা কারণে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা টিঁকিয়া আছে এবং আরও অনেকদিন থাকিবে।

Q. 94. Describe the process of law-making in a modern democracy.

ভূমিকা—আইন প্রণয়নের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রকার। তথাপি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি মোটামুটি একরূপ। সাধারণতঃ আইনসভা এই বিষয়ে চরম ক্ষমতার অধিকারী।

আইন প্রণয়নের পদ্ধতি—আইন সভার কোন পরিষদে যখন আইনের খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, তখন তাহাকে বিল (Bill) বলে। ইহা পাশ হইবার পর সাধারণতঃ রাষ্ট্রের প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করা হয় এবং তাহার পর ইহা আইনে পরিণত হইয়া কার্যকরী হয়।

আইনসভার দুই পরিষদ থাকিলে উভয় পরিষদেই বিলটি আলোচনা করিয়া পাশ করা দরকার। এক পরিষদ থাকিলে এক জায়গায় পাশ করিলেই চলে। সাধারণতঃ বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত অন্য কোন বিল প্রথমে (দ্বি-পরিষদ আইনসভার ক্ষেত্রে) নিম্ন পরিষদে উত্থাপন করিতে হয়। ইহা ভিন্ন অন্য যে কোন বিল যে-কোন পরিষদে উপস্থিত করা যায়। অর্থ সংক্রান্ত বিল উচ্চ

পরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিম্ন পরিষদের সম্মতিতেই পাশ হইতে পারে।

প্রত্যেক পরিষদেই বিলটি পাশ করিতে গেলে কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করিতে হয়, যথা (১) প্রথম পাঠ, (২) দ্বিতীয় পাঠ, (৩) কমিটিতে প্রেরণ, (৪) রিপোর্ট প্রদান, (৫) তৃতীয় পাঠ, ইত্যাদি।

প্রথম একদিন যিনি বিল উত্থাপন করিবেন, তিনি বিল উত্থাপনের অনুমতি চাহিয়া উহা প্রথমবার পাঠ করিবেন। সাধারণতঃ এইদিন বিলের নামটি পাঠ করা হয়। বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী এবং বেসরকারী সাধারণ সদস্যের জন্য ভিন্ন নিয়ম রহিয়াছে। প্রথম পাঠের পর অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি থাকিলে ইহার দ্বিতীয় পাঠের জন্য সুপারিশ করা হয়।

দ্বিতীয় পাঠের সময় সদস্যরা বিলের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা না করিয়া সাধারণভাবে ইহার গুণাগুণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ইহার পর অনেক সময় বিলটি একটি নির্দিষ্ট কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। আবার সভা ইচ্ছা করিলে ইহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারে; তাহা ছাড়া সরাসরি তৃতীয় পাঠের ব্যবস্থাও হইতে পারে। সিলেক্ট কমিটি বিলটি সম্পর্কে কোন পরিবর্তনের সুপারিশ করিলে অথবা জনমত গ্রহণের পর তাহার ভিত্তিতে প্রস্তাবক কোন পরিবর্তন আনিতে চাহিলে সেই সম্পর্কে পরিষদে রিপোর্ট করা হয় এবং তাহার উপর আলোচনা হয়।

ইহার পর তৃতীয় পাঠে বিলটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের সমর্থন থাকিলে ইহা গৃহীত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পাঠের সময়ে সাধারণ আলোচনা, দ্বিতীয় পাঠে বিলের প্রতিটি ধারার উপর পৃথক আলোচনা ও ভোট গ্রহণ এবং তৃতীয় পাঠে সাধারণ আলোচনা ও সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

মোটামুটি উপরোক্ত পদ্ধতিতে এক পরিষদে বিল পাশ হইবার পর দ্বি-পরিষদ আইনসভার ক্ষেত্রে ইহা দ্বিতীয় পরিষদে প্রেরণ করা হয় এবং এই একই পদ্ধতিতে ইহা সেখানে পাশ হইলে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষরের পর ইহা আইনে পরিণত হয়।

দ্বি-পরিষদ আইনসভার ক্ষেত্রে উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি, রাষ্ট্রপ্রধান সম্মতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে তাহার মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে।

কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার সভাপতির স্বাক্ষরেই বিল আইনে পরিণত হয়।

Q. 95, Describe the extent to which the Referendum, the Initiative and the Recall are used in different countries. What are their respective merits and demerits?

Or, Describe the various forms of direct legislation.

ভূমিকা—প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের নগররাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে সব গণতান্ত্রিক দেশেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্থানে পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের পরেও বিভিন্ন স্থানে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতি কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ইহার কারণ মোটামুটি দুইটি—প্রথমত, গণতন্ত্র যখন জনসাধারণের শাসন তখন আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজ কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ইহাতে জনসাধারণকেও কিছু অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রতিনিধিদের কার্যে জনসাধারণ মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাই তাহারা নিজেরাই কিছু কিছু কাজ করিতে চাহিয়াছে।

বিবৃতি—প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের মোটামুটি তিনটি রূপ বর্তমানে দেখা যায়।

গণভোট (Referendum): গণভোট পদ্ধতি অনুসারে আইনসভা কোন আইনের খসড়া পাশ করিবার পরেও তাহাকে আইনরূপে গণ্য করিতে হইলে জনসাধারণের অর্থাৎ ভোটদাতাদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। অধিকাংশ ভোটদাতা ইহার পক্ষে মত প্রকাশ করিলে তবে ইহা আইন বলিয়া স্বীকৃত হয়, আর ভোটাধিক্যে ইহা অগ্রাহ্য হইলে আইনসভার অনুমোদন

সত্ত্বেও ইহা আইন হয় না। এই গণভোট ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক—দুই-ই হইতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে সকল আইনের ক্ষেত্রেই গণভোট গ্রহণ করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে সংবিধান সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন আনিতে হইলে অবশ্যই তাহা গণভোটের মাধ্যমে করিতে হয়। ইহা আবশ্যিক গণভোট। অপরদিকে কোন কোন আইনের ক্ষেত্রে বলা আছে, নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা কোন বিশেষ আইন সম্পর্কে গণভোটের দাবী জানাইলে তবে ইহার ব্যবস্থা করা হইবে। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

(২) **গণ-উদ্যোগ (Initiative)**ঃ গণ-উদ্যোগ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা নিজেরাই একটি আইনের খসড়া অথবা তাহার মূলনীতি সংবলিত দলিল আইনসভার নিকট উত্থাপন করিয়া ইহাকে আইনরূপে গ্রহণের দাবী জানাইতে পারে। সাধারণত আইনসভায় বিবেচনার পর এই আইন পুনরায় গণভোটের সম্মুখে আসে। সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডে ৫০ হাজারের বেশি নাগরিক সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট সুইজারল্যাণ্ডকে ‘আণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল’রূপে রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দাবী জানাইয়াছিল।

( ) **পদচ্যুতি (Recall)**ঃ এই প্রথা অনুসারে আইন বা শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তিকে জনসাধারণ তাহার নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই উক্ত পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি এই পদচ্যুতির দাবী জানাইলে উক্ত পদ হইতে তাহাকে অপসারণ করিয়া পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নেও এই পদচ্যুতির ব্যবস্থা আছে।

ইহা ভিন্ন **জনমত গ্রহণ (Plebiscite)** ও **নগর-সভা (Town meeting)** পদ্ধতিও কোন কোন স্থানে দেখা যায়। কোন একটি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জনসাধারণের অভিমত জানিবার জন্য জনমত গ্রহণ করা হয়; গণভোটের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে—গণভোটে জনসাধারণের ব্যক্ত মতকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু জনমত গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণের মত জানা যায়, ইহার কোন আইনগত স্বীকৃতি নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইংল্যাণ্ডের শহরগুলিতে এবং সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে

নগর-সভার ব্যবস্থা আছে—এখানে ভোটদাতাগণ একত্র সভায় মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গুণ: (১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা জনসাধারণ কর্তৃক আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণের ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রের কার্যে বেশি উৎসাহ বোধ করে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে।

(২) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে কাজ না করিলে জনসাধারণ নিজেরাই তাহার প্রতিকার করিতে পারে। কোন বিষয়ে জনস্বার্থবিরোধী আইন পাশ করিবার চেষ্টা করিলে গণভোটের দ্বারা তাহা বন্ধ করা হয়, আবার প্রতিনিধিরা কোন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে আগ্রহ প্রকাশ না করিলে গণউদ্যোগের দ্বারা দূর করা সম্ভব।

ত্রুটি: এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে, যথা:

(১) শাসন পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয় সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে সর্বদা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই তাহারা গণভোট, গণউদ্যোগ প্রভৃতিতে বিশেষ কোন উৎসাহবোধ করে না। সুইজারল্যাণ্ডে বহুক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগেরও কম ভোটদাতা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

(২) শাসন পরিচালনা ও আইন প্রণয়নে বিশেষ জ্ঞানের দরকার। সাধারণ ভোটদাতাগণের ইহা না থাকায় তাহাদের দ্বারা আইন রচনার ফলে এইরূপ আইন অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত হইতে পারে।

(৩) আইন প্রণয়নে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া এই ব্যবস্থায় আইনসভার কোন গুরুত্ব থাকে না। আইনসভা কোন কার্যে উৎসাহ বোধ করে না।

উপসংহার—সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির ন্যায় ক্ষুদ্র শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সম্ভব হইলেও কোন বড় রাষ্ট্রে ইহা সম্ভব নহে। গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক হইতেও ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। সুস্থ ও শক্তিশালী জনমত সৃষ্টির দ্বারা জনসাধারণ আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

Q. 96. Explain what do you understand by non-sovereign law making bodies. Distinguish between sovereign and non-sovereign law-making bodies.

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ যে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপরে রাষ্ট্রের অপর কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই, তাহাকে সার্বভৌম আইনসভা (sovereign law-making body) বলে। গ্রেট বৃটেনে রাজা-সহ-পার্লামেন্ট (King-in-Parliament) এইরূপ সার্বভৌম আইনসভা। এই আইনসভা আইন প্রণয়ন বিষয়ে চরম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। ইহার রচিত আইন সকলে মানিতে বাধ্য। ইহার বৈধতা সম্পর্কে কেহ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে না। এমন কি সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাও এই আইনসভার হস্তে ন্যস্ত।

কিন্তু যে আইনসভা সাধারণভাবে আইন প্রণয়নের কাজ করিলেও এই কার্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে, তাহাকে অ-সার্বভৌম আইনসভা (non-sovereign law-making body) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে আইনসভার ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোন আইন সংবিধানবিরোধী বলিয়া মনে করিলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ভেটো' প্রয়োগ করিতে পারেন। ভারতের রাজ্যগুলির সভায় (State Legislatures) প্রকৃত পক্ষে কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা কোন কোন বিষয়ে সার্বভৌম, এবং কোন কোন বিষয়ে অসার্বভৌম। যে-সব ক্ষেত্রে আইনসভা এককভাবে সংবিধান সংশোধন করিতে পারে, সেখানে ভারতীয় আইনসভা সার্বভৌম, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সংবিধান সংশোধন করিবার জন্য রাজ্যের আইনসভা সমূহের অর্ধেকের বেশী সম্মতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা অসার্বভৌম। সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণলাভের পূর্বে ডোমিনিয়ান আইনসভাগুলি অসার্বভৌমিক আইনসভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল।

Q. 97. What are the political, administrative and legislative functions of the executive? (Cal. 1954)

রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ বলিতে আমরা ব্যাপক অর্থে একজন রাষ্ট্রপ্রধান একটি মন্ত্রিসভা এবং কিছুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী বুঝি। সংকীর্ণ অর্থে কেবল মন্ত্রীসভাকেও শাসন বিভাগরূপে মনে করা হয়। আইনসভার বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায়; শাসন বিভাগের কাজ হইল এইসব আইনকে কার্যে পরিণত করা। কিন্তু বর্তমানকালে শাসন বিভাগ

কেবলমাত্র আইনগুলিকে কার্যে প্রয়োগ করিয়াই ইহার কর্তব্য শেষ করে না—আইন প্রণয়ন, বিচার কার্য সম্পাদন প্রভৃতি অন্যান্য কাজও ইহাকে করিতে হয়।

অধ্যাপক গার্ণার শাসন বিভাগের কার্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন (১) কূটনৈতিক কার্য, (২) শাসন পরিচালনার কার্য, (৩) সামরিক কার্য, (৪) আইন প্রণয়নের কার্য ও (৫) বিচার বিভাগীয় কার্য। এই কাজগুলিকে মোটামুটি রাজনৈতিক, শাসনগত ও বিচার সংক্রান্ত -এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

রাজনৈতিক কার্য—দলপ্রথার জন্য সাধারণতঃ প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা শাসন বিভাগের পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। উক্ত দলের কর্মপন্থা অনুসারে শাসন বিভাগ কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহাদের মন্ত্রীরা জনসাধারণকে রাষ্ট্রের কার্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের আচরণের দ্বারা জনসাধারণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করেন। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের কাজ এই বিভাগের রাজনৈতিক কার্যের মধ্যে পড়ে। অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যবস্থাও শাসন বিভাগ করিয়া থাকে।

শাসন সংক্রান্ত কার্য -আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথ-ভাবে কার্যে প্রয়োগ করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রে শান্তি-শৃংখলা অব্যাহত রাখা ও বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা শাসন বিভাগের প্রধান কার্য। ইহার জন্য প্রয়োজনমত সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ রাখিতে হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যাহাতে সকলে আইন মান্য করিয়া চলে তাহা দেখা শাসন বিভাগের কার্য। কেহ আইন ভংগ করিলে এই বিভাগ তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বও এই বিভাগের। শাসন সংক্রান্ত কার্য ঠিকমত সম্পাদিত করার জন্য অনেক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগকে কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও দেওয়া হইয়া থাকে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা—সাধারণভাবে আইনসভা রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিলেও শাসন বিভাগের হাতেও আইন প্রণয়নের কিছুটা ক্ষমতা রহিয়াছে। শাসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে এবং ইহা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দেয়। আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন

নির্বাচনের নির্দেশ দিবার অধিকারও কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের আছে। আইনসভার অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে তখন হঠাৎ জরুরী কোন আইনের প্রয়োজন হইলে শাসন বিভাগ অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করিয়া সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পরে আইনসভার অধিবেশনে ইহা অনুমোদন করিয়া লইতে হয়। অনেকক্ষেত্রে আইনের মূলনীতিগুলি আইন সভায় গৃহীত হয়, বিস্তৃতভাবে ইহা প্রণয়নের ভার শাসন বিভাগের হাতে দেওয়া হয়। বর্তমানে গ্রেট বৃটেনে এইরূপ আইন প্রণয়নের প্রচলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইনসভার অংশরূপে আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব করে।

[**ইংগিত**—শাসন বিভাগের বিচারকার্য সম্পাদন সংক্রান্ত কার্য বলিতে বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা, নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বিভিন্ন কার্যের দোষ-গুণ বিচার ও বিভাগীয় তদন্ত প্রভৃতি পরিচালনা এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ক্ষমা করিবার ক্ষমতা প্রভৃতিকে বোঝায়।]

Q. 98. State the characteristics of the parliamentary executive and the non-parliamentary executive.

[**ইংগিত**—যে শাসনবিভাগে মন্ত্রিসভা আইনসভা অর্থাৎ আইনসভার নিম্ন কক্ষের নিকট সকল কার্যের জন্য দায়ী থাকে, তাহাকে আইনসভা-নির্ভর শাসনবিভাগ (parliamentary executive) বলে। গ্রেট বৃটেনের শাসনবিভাগ এইরূপ। ইহাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনও বলে।

অপরদিকে যে শাসনবিভাগে শাসনবিভাগের প্রধান ও তাঁহার মন্ত্রিসভা আইনসভার অংশ নহে এবং আইনসভার নিকট কার্যাবলীর জন্য দায়ী নহে, তাহাকে আইনসভা-নিরপেক্ষ শাসনবিভাগ (non parliamentary executive) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ ইহার উদাহরণ। ইহাকে আমরা রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনও বলিতে পারি।

সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর অবলম্বনে লিখিতে হইবে।]

Q, 99. What part does the Civil Service play in the government of a democracy? Discuss their positions and functions.

[**ইংগিত**—একজন রাষ্ট্রপ্রধান (নির্বাচিত অথবা বংশানুক্রমে স্থিরীকৃত), একটি মন্ত্রিসভা ও কিছুসংখ্যক কর্মচারী লইয়া রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ গঠিত। এই কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা প্রধান ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাহাদের 'সিভিল সার্ভিসের' অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। এই কর্মচারীদের কার্য ও রাষ্ট্রশাসনে ইহাদের ভূমিকা আমলাতন্ত্র এই প্রসংগে ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর উক্ত উত্তর অবলম্বনে লিখিতে হইবে।]

Q. 100. What do you understand by the term "independence of the Judiciary"? Indicate the factors upon which the independence of the judiciary depends. (1961)

ভূমিকা—সরকার পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারতন্ত্রেই নহে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্য হইল স্বেচ্ছাচারী শাসনের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করা আর গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থায় ইহার উদ্দেশ্য হইল সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা করা। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা খর্ব না করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে মন্তেস্ক্যুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্যই মন্তেস্ক্যু এই মতবাদের প্রচার করেন। বিচারবিভাগ যদি তাহার কার্যের জন্য আইনবিভাগ বা শাসন বিভাগের মুখাপেক্ষী হয় তবে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের আশা অবশ্যই বিপন্ন হইবে। আমরা জানি যে মানবদেহের সারা অংগপ্রত্যংগের মত সরকারী বিভাগগুলির একটি অপরটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তথাপি বিচার বিভাগকে এমনভাবে গঠন করা প্রয়োজন যাহার ফলে আইনবিভাগ বা শাসনবিভাগের কোন প্রভাব এই বিভাগের উপর না পড়ে। প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রত্যেকেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সমর্থন করিয়াছেন।

বিবৃতি—বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলিতে বুঝায়, বিচারকদের কার্য-কলাপের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করা চলিবে না এবং বিচারালয়ের আদেশ সকলকে চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রের সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা আইনসভার কাজ। আইনসভা নিজ সীমা লংঘন করিয়া সংবিধান-বিরোধী আইন প্রণয়ন করিতেছে কিনা তাহা দেখা বিচার-

বিভাগের কাজ। অবশ্য, গ্রেট বৃটেনে বিচার বিভাগের এই অধিকার নাই। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ ঠিকমত কার্য করিতেছে কিনা অথবা সংবিধান-স্বীকৃত নাগরিক অধিকারের উপর শাসনবিভাগ হস্তক্ষেপ করিতেছে কিনা বিচারবিভাগ তাহার দিকে নজর রাখে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিচারবিভাগকেই তাহার নিষ্পত্তি করিতে হয়। বিচারবিভাগের পক্ষে এই সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হইলে আইনবিভাগও শাসনবিভাগের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিতে হইবে। স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি বিচারবিভাগ ভিন্ন নাগরিক অধিকার রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়—সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা যায়।

প্রথমত, বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিযুক্ত করার পর আইন বা শাসনবিভাগ সহজে তাঁহাদের পদচ্যুত বা কর্মোন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়ত, গুরুতর দুর্নীতি বা অযোগ্যতা প্রমাণিত না হইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে বিচারকদের পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

তৃতীয়ত, যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন এবং যাহাতে দুর্নীতি বিচারকদের স্পর্শ করিতে না পারে তাহার জন্য তাঁহাদের উপযুক্ত পরিমাণ বেতন, ভাতা প্রভৃতি দেওয়া উচিত।

চতুর্থত, অবসর গ্রহণের পর অথবা কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে বিচারকদের অন্য কোন সরকারী কার্যে নিয়োগ করা উচিত নহে। অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ পাইবার আশা থাকিলে বিচারকগণ শাসনবিভাগকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে নিরপেক্ষ বিচার ব্যাহত হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের কার্য করিতে পারেন।

নির্বাচকমণ্ডলী

ELECTORATE

Q. 101. Describe the functions performed by the electorate in a modern state. (Cal. 1932)

ভূমিকা—গণতন্ত্রে জনসাধারণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা শাসন পরিচালিত হয়। যাহারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকারী সমষ্টিগতভাবে তাহাদের নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। সাধারণত সকল নাগরিকই নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রম করিলেও অন্য কোন কারণে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রশাসনে এই নির্বাচকমণ্ডলী নিছক প্রতিনিধি নির্বাচন ছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে।

নির্বাচকমণ্ডলীর কার্য-প্রথমত, এই নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনে শাসনবিভাগের প্রধানকেও নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করে। এইভাবে রাষ্ট্রের শাসনভার প্রধানত যাহাদের উপর অর্পণ করা হইবে নির্বাচকমণ্ডলী তাহাদের নির্বাচন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, সরকার যাহাতে স্বেচ্ছাচারী না হইয়া পড়ে সেইদিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য আলোচনা করা নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন, পদচ্যুতি, গণভোট, গণউদ্যোগ, এমন কি বিপ্লব প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র মুখ্যত দলীয় শাসন-ব্যবস্থা। বিভিন্ন দল নিজ নিজ কর্মপন্থা অনুসারে সরকার পরিচালনা করিতে চায়। নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য বিভিন্ন দলের কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেষ্ঠ দলকে নির্বাচনকালে জয়ী করিয়া তাহার হাতে শাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করা।

মোট কথা, সকল বিষয়ে উৎসাহী ও সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলী গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

Q. 102. State the merits and demerits of direct and indirect methods of election. (Cal. 1936)

ভূমিকা—গণতন্ত্রে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রের

শাসন পরিচালিত হয়। সাধারণত আইনসভার সভ্যগণ (কোন কোন স্থানে শাসনবিভাগের প্রধান) প্রাপ্তবয়স্ক সকল নরনারীর ভোটে নির্বাচিত হয়। কিন্তু এইরূপ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনেকে পরোক্ষ নির্বাচনের কথা বলিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অর্থাৎ ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত না হইয়া ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি নির্বাচকসভা (Electoral College) কর্তৃক নির্বাচিত হয়। জনসাধারণ নিজেরা সরাসরি আইনসভা ও শাসন-বিভাগের পরিচালকদের নির্বাচন না করিয়া তাহাদের নির্বাচিত করার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা উক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন করে। ইহাই পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা: অধিকাংশ দেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। গ্রেট বৃটেনের সকল নির্বাচন, ভারতে আইনসভাসমূহের নির্বাচন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা প্রভৃতির নির্বাচন এই ব্যবস্থায় হইয়া থাকে। ইহার সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, গণতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের শাসন, সুতরাং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচনের ভার জনসাধারণের হাতেই থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার প্রসার ঘটে।

ইহার বিপক্ষে বলা হয়, জনসাধারণের অধিকাংশ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলিয়া উপযুক্ত প্রার্থীদের তাহারা নির্বাচিত করিতে পারে না। সুতরাং চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব জনসাধারণের হাতে থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, লক্ষ লক্ষ ভোটদাতাগণ কর্তৃক একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলে জনসাধারণ দলীয় নেতাদের বক্তৃতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলিয়া অনেক সময়ে ঠিকমত প্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচনা করা হয় না।

পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা: প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় অজ্ঞ জনসাধারণ ধীর স্থির ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভোট দিতে পারে না বলিয়া কোন কোন রাষ্ট্রে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি এইভাবে নির্বাচিত হন।

ইহার প্রধান সুবিধা হইল, সকল জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার সম্ভব না হইলেও তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিদের

পক্ষে ইহা করা সম্ভব। ধীর স্থির ভাবে সব দিক বিবেচনা করিয়া এই প্রতিনিধিরা প্রকৃত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, অল্প কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনের ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি ও দলীয় কলহের আশংকা কম থাকে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার এই সুবিধাগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। ইহার অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। প্রথমত, ইহার দ্বারা জনসাধারণের চূড়ান্ত নির্বাচনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় বলিয়া ইহা গণতান্ত্রিক নীতির দিক হইতে বাঞ্ছনীয় নহে। দ্বিতীয়ত, দলপ্রথার ফলে পরোক্ষ নির্বাচনও প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচকসভায় যাহাদের নির্বাচিত করা হয় তাহারা বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থী হইবার ফলে জনসাধারণ তাহাদের ভোট দিবার সময় কার্যত রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সংশ্লিষ্ট দলের প্রার্থীকেই ভোট দেয়। তৃতীয়ত, নির্বাচক সভার সভ্য বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম হওয়ায় ভোট প্রদান এবং ইহা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রভৃতি অধিক পরিমাণে প্রশ্রয় পায়।

উপসংহার : উভয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচন অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। ভোটদাতাদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার করিলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ত্রুটিগুলি সহজেই দূর করা সম্ভব।

Q. 103. Do you advocate universal franchise? What, in your opinion, should be the qualifications for the exercise of franchise?

ভূমিকা : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের শাসন বলিয়া অভিহিত হইলেও নির্বাচনে সকলের ভোটদানের অধিকার থাকিবে কিনা এই প্রশ্নে রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে, প্রত্যেকটি সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ সমালোচকগণ এই অধিকারকে সংকুচিত করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই অধিকার দিতে চান।

সংজ্ঞা : সার্বজনীন ভোটাধিকার (universal suffrage) বলিতে বুঝায়, কোনরূপ বৈষম্য না করিয়া সকল নাগরিককেই ভোটের অধিকার দেওয়া। কিন্তু সকল নাগরিকের ভোটের অধিকার বলিলেও প্রত্যেক

রাষ্ট্রেই কিছু কিছু লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখার নীচে কাহাকেও ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দেশে এই সীমারেখা বিভিন্ন। ভারতে ইহা ২১ বৎসর করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন উন্মাদ, দেউলিয়া ও বিশেষ অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় না। বৈদেশিকদের এই অধিকার নাই। এই সব ব্যক্তি ভিন্ন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে যখন ভোটের অধিকার দেওয়া হয় তখন তাহাকে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

স্বপক্ষে যুক্তি : (১) গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনায় বলা হয় প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকে, সুতরাং প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত।

(২) কোন কারণে বিশেষ কোন একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায় কিংবা জনসাধারণের একাংশকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাষ্ট্রে অন্য নাগরিকদের তুলনায় তাহাদের মর্যাদা কমিয়া যাইবে ; গণতন্ত্রের দিক হইতে এইরূপ বিভেদ সৃষ্টি ও বৈষম্যমূলক আচরণ কাম্য নহে।

(৩) ভোটের জন্য দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া সরকার ভোটাধিকার বঞ্চিত জনগণের স্বার্থের দিকে কোন দৃষ্টি দিবে না।

(৪) জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,—'যাহা সকলকে স্পর্শ করে তাহা সকলের দ্বারা স্থির হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রশাসন জনসাধারণের সকল অংশকে সমানভাবে স্পর্শ করে, সুতরাং ইহার পরিচালনায় সকলের সমান অধিকার থাকা আবশ্যক।

(৫) সকলকে ভোটের অধিকার দিলে ইহা যথাযথভাবে প্রয়োগের তাগিদে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়, এবং রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

বিপক্ষে যুক্তি— (১) জনসাধারণের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনে সকলের অধিকার থাকা উচিত নয়। কারণ তাহারা উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না।

(২) ভোটদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ; এই দায়িত্ব পালনে যাহাদের যোগ্যতা আছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই ভোটের অধিকার থাকা উচিত। যোগ্যতার দিক হইতে সাধারণত শিক্ষা, সম্পত্তি ও করপ্রদানের প্রতি গুরুত্ব

আরোপ করা হইয়া থাকে। মিল বলিয়াছেন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যাহাদের কিছু সম্পত্তি আছে অথবা সরকারকে কর দেয় তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। যাহাদের অর্থ নাই বা সরকারের অর্থে যাহাদের অংশ নাই তাহারা বে-হিসাবীভাবে সরকারী অর্থ ব্যয় করিবে, সুতরাং তাহাদের সরকার পরিচালনায় কোন অধিকার থাকা উচিত নয়।

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্ত্রীলোক, অন্য বর্ণের নরনারী এমন কি ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার নানাভাবে সংকুচিত করা হইয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং অধিকাংশ ক্যাণ্টনে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার নাই। স্ত্রীলোকের কর্মক্ষেত্র গৃহ, রাষ্ট্রশাসন নয়—প্রধানত এই যুক্তিতে তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নয়, শারীরিক দিক হইতে দুর্বল, এইসব কথাও বলা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীরা শ্বেতবর্ণের ব্যক্তিদের সহিত সমান ভোটাধিকার পায় না। এই বৈষম্যের পক্ষে বলা হয়, কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য।

পাকিস্তানের সংবিধানে (বর্তমানে বাতিল) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কোন হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না বলিয়া ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, সুতরাং ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হইতে পারিবে না।

সমালোচনা : সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, জনসাধারণ অজ্ঞ ও রাষ্ট্রকার্যে দক্ষ নহে বলিয়া তাহাদের ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। ভোটাধিকার তথা রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবে। দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিত বলিয়াও ভোটাধিকার অগ্রাহ্য করা যায় না। জনসাধারণ শিক্ষিত হইতে পারে নাই, ইহা জনসাধারণের দোষ নহে। রাষ্ট্রের কর্তব্য সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রের অক্ষমতার জন্য নাগরিকদের শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। ইহা ভিন্ন সাধারণ শিক্ষালাভ করিলেই যে সব সময় রাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্যে অভিজ্ঞ হওয়া যায় ইহাও ঠিক নহে। অনেক সময় সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনা বেশী দেখা যায়। তৃতীয়ত, যাহাদের সম্পত্তি নাই

বা যাহারা সরকারকে করদান করে না, এইরূপ দরিদ্র ব্যক্তিদের ভোটাধিকার অগ্রাহ্য করার পক্ষেও কোন যুক্তি নাই। কেবলমাত্র বিত্তশালী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রকার্যে অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। চতুর্থত, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার অস্বীকার করাও অন্যায়। রাষ্ট্রশাসনে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে কম পারদর্শী নহে। বর্ণ ও ধর্মভেদে ভোটের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যও ঠিক নহে।

উপসংহার: সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি আজ সর্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। তবে ভোটদাতারা যাহাতে উপযুক্তভাবে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের শিক্ষাপ্রদান ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

Q. 104. What should be the proper relation between the representative and his constituency in a democratic state? Should he be bound by the instructions of his constituents? (Cal. 1934)

নির্বাচিত ব্যক্তিগণ জনসাধারণের প্রতিনিধি, সুতরাং প্রতিনিধিদের সর্বদাই তাহাদের নির্বাচকদের নির্দেশমত কাজ করা উচিত। কিন্তু অনেকে এই মতের সমালোচনা করিয়া বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে সকল সময় তাহার নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশ মানিয়া চলা সম্ভব নহে, উচিতও নহে। এই বক্তব্যের পক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়:

প্রথমত, অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার অধিকারী বলিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্বাচনকালে সকলে ভোট দিয়া নির্বাচিত করে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সাধারণ নির্বাচকদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত কাজ করিবেন, ইহাই উচিত।

দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিদের পক্ষে সর্বদা নির্বাচকমণ্ডলীর মত জানা সম্ভব নয়। একটি বিষয়ে পঞ্চাশ ষাট হাজার মানুষের প্রকৃত মত কি তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে নির্বাচকদের মতামতের দিকে দৃষ্টি না দিয়া নিজের বিবেচনা অনুসারে কাজ করা উচিত।

তৃতীয়ত, নির্বাচনকালে রাষ্ট্রসংক্রান্ত কয়েকটি মূল বিষয়ে প্রার্থীরা আলোচনা করেন এবং নির্বাচকরা তাহার উপরেই তাহাদের পছন্দমত নীতি ও প্রার্থীকে সমর্থন করে। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সকল নির্বাচকের

মতামত লওয়া হয় না। কার্যকালে এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নির্বাচকদের মতামত অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচনের সময় এক একটি ক্ষুদ্র নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনের পর তিনি কেবল তাহার পক্ষভুক্ত ভোটদাতা কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হন না, তাহাকে সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে মনে করা হয়। আইন-প্রণয়ন ও শাসন-পরিচালনার সময় কেবলমাত্র নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের কথা না ভাবিয়া তাহাকে সমগ্র রাষ্ট্রের মংগলের কথা চিন্তা করিতে হয়। এই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে নিজ নির্বাচক-মণ্ডলীর নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয়।

অনেক লেখক মোটামুটি এইসব যুক্তি মানিয়া লইয়াও বলিয়াছেন, প্রতিনিধিদের পক্ষে সর্বদা নির্বাচকদের নিদেশ মানিয়া চলা সম্ভব না হইলেও অন্ততঃ নিজ রাজনৈতিক দলের নির্দেশ অনুসারে চলা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ে দলগুলি নীতিনির্ধারণ করে এবং নির্বাচনকালে জনসাধারণ সাধারণত দলকেই সমর্থন করে। সুতরাং কোন দলের নীতি জনসাধারণের পছন্দ না হইলে নির্বাচনে এই দলের প্রার্থীরা পরাজিত হইবে। কিন্তু ল্যাস্কি বলিয়াছেন, প্রতিনিধির পক্ষে কখনও নিজ দলের ভৃত্য হওয়া উচিত নহে। আইনসভার কার্যে তাহাকে দলের ঊর্ধ্বে থাকিয়া নিজ বিবেক অনুসারে কাজ করিতে হইবে।

মোটকথা, নির্বাচকমণ্ডলী তথা সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ করা উচিত। প্রতিনিধির কার্য পছন্দ না হইলে তাহার কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার নির্বাচকদের আছে। নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থা হারাইলে পরবর্তী নির্বাচনে তাহাকে পরাজিত করেও সম্ভব। তথাপি নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে সর্বদা নির্বাচনকেন্দ্রের মত অনুসারে কাজ করা সম্ভব নহে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে অবশ্যই নির্বাচকদের মতের বিরুদ্ধেও যাইতে হইবে।

Q. 105. Explain briefly the claims of functional and territorial representation in a modern state. (Cal. 1931)

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব: জনসাধারণ কর্তৃক তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং

প্রত্যেকটি অঞ্চল হইতে আইন সভায় এক বা একাধিক সদস্য নির্বাচিত হয়। নির্বাচনে এই অঞ্চলের সকল ভোটদাতা একত্র ভোট প্রদান করে। এইরূপ নির্বাচন ব্যবস্থাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব (territorial representation) বলা হয়। অঞ্চলগুলিকে নির্বাচনকেন্দ্র (constituency) বলা হয়। সমগ্র দেশের জনসাধারণের পক্ষে একই সংগে সকল প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব হয় না বলিয়া এইভাবে কয়েকটি নির্বাচনকেন্দ্র গঠন করিয়া আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। একই নির্বাচনকেন্দ্রের অধিবাসীদের সকলের স্বার্থ মোটামুটি এক, এই ধারণায় তাহাদের সকলকে একযোগে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে বলা হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সকলে একইভাবে মত প্রকাশ করিলে ও একইভাবে কাজ করিলে জনমত সৃষ্টি করা ও নির্বাচিত প্রতিনিধির উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ হয়।

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব : কিন্তু অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, এইরূপ আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রসম্মত নহে। একই অঞ্চলে বাস করিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ সমান নহে। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক—প্রত্যেকের স্বার্থ ভিন্ন প্রকার। ইহাদের সকলকে একত্র প্রার্থী নির্বাচন করিতে দিলে প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব হইবে না এবং আইনসভায় ইহাদের বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ পাইবে না। এই কারণে কোল (G. D. H. , ol.) প্রভৃতি আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনের পরিবর্তে বৃত্তি বা পেশাগত প্রতিনিধিত্বের (functional representation) সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ না করিয়া কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক নির্বাচনকেন্দ্র গঠন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়। বৃত্তিগতভাবে এইরূপ প্রতিনিধিত্বের ফলে প্রত্যেকেই তাহার শ্রেণীর বক্তব্য আইনসভায় উপস্থিত করিতে পারিবে।

কিন্তু বৃত্তিগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্বের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি আছে। ইহাতে প্রতিনিধিরা নিজেদের সমগ্র দেশ বা আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে না করিয়া নিজ নিজ বৃত্তির প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে। ইহাতে জাতিস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। উপরন্তু, ইহার ফলে কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের আশংকা থাকে। এই ব্যবস্থায় শ্রেণীবিদ্বেষও প্রশ্রয় পায়।

Q. 106. Discuss the arguments for and against minority representation. (Cal. 1959, '63)

গণতান্ত্রিক শাসন মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। নির্বাচনে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহারাই সরকার গঠন করিয়া শাসনকার্য চালায়। কিন্তু যাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, শাসন পরিচালনায় তাহাদের কি কোন ভূমিকা থাকিবে না? ভোটদাতাদের অধিকাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠরাও সংখ্যায় একেবারে নগণ্য নহে। তাহাদের বক্তব্য ঠিকভাবে উপস্থাপিত না হইলে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। এই কারণে আইনসভায় যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। মিল বলিয়াছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ হইবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংখ্যালঘিষ্ঠের বক্তব্যও শোনা উচিত।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিতে কি বুঝায়? ভারতে ইংরেজ শাসনের আমলে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘিষ্ঠতা স্থির করা হইত। ইউরোপে বংশ ও ভাষার দিক হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথা চিন্তা করা হয়। আধুনিক লেখকগণ কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের দিক হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠতা স্থির করার পক্ষপাতী। রাষ্ট্র শাসনের মূল নীতিতে অধিকাংশ একটি মতের পক্ষে হইলে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর যে অল্প সংখ্যক এই মতের সমর্থন না করিয়া ভিন্ন মত অনুসরণ করে, তাহারা এক বা একাধিক দলভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ। মোটকথা, যাহারা দেশের অধিকাংশের সহিত একমত নহে, আইনসভায় যাহাতে তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত হয় তাহার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবার সংখ্যালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতির বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে, প্রথমত, ইহা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। ইহার ফলে প্রত্যেকে সমগ্র দেশের স্বার্থ বিবেচনা না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়া সব কিছু বিবেচনা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং নির্বাচনে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় আইনসভায় সর্বদা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিবে। ইহা আইন প্রণয়ন কিংবা জাতীয় স্বার্থ কোনদিক হইতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের দাবী অস্বীকার করা যায় না। ইহার ব্যবস্থা না করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকিবে। তবে ধর্ম, বংশ বা ভাষার ভিত্তিতে এই সংখ্যালঘিষ্ঠ স্থির না করিয়া রাজনৈতিক মতামতের দিক হইতে করা উচিত।

Q. 107. Summarise and discuss the methods adopted in different states to protect the interests of the minorities.

সংখ্যালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। **সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** (Proportional Representation) : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায় প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠের সমর্থক সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচকদের মধ্যে যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদের এক-তৃতীয়াংশ সমর্থক থাকে তবে হয়ত সরাসরি নিবাচনে তাহারা একটি আসনও পাইবে না, দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যায় বেশি হওয়ায় সবগুলি দখল করিবে। কিন্তু সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাইবে ও সংখ্যালঘিষ্ঠরা এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করিবে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দুই প্রকার। প্রথম পদ্ধতিকে হেয়ারের নিয়ম (the Hare System) বলা হয়। টমাস হেয়ার প্রবর্তিত এই পদ্ধতিকে 'একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব'ও (Proportional representation by means of single transferable vote) বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে মোট ভোটসংখ্যার সহিত ১ যোগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে মোট আসন সংখ্যার সহিত ১ যোগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহা দিয়া ভাগ করিতে হয়। ইহার দ্বারা যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে কোটা বলে। একজনকে নির্বাচিত হইতে হইলে এই 'কোটা' বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট অবশ্যই পাইতে হইবে।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক, কোন নির্বাচনে মোট ৫৯ জন ভোট দেয় এবং মোট আসন সংখ্যা ৫টি। তাহা

হইলে ৫৯+১, অর্থাৎ ৬০ কে ৫+১, অর্থাৎ ৬ দিয়া ভাগ করিলে যে ১০ পাওয়া যায় তাহাই কোটা। যে ১০টি ভোট পাইবে সেই নির্বাচিত হইবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা মোট নির্বাচক সংখ্যার সহিত এইরূপ অতিরিক্ত ১ যোগ না করিয়াও 'কোটা' নির্ধারণ করা হয়।

প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর নামের পাশে ভোটদাতারা ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তাহার প্রথম মনোনয়ন (preference), দ্বিতীয় মনোনয়ন, তৃতীয় মনোনয়ন, চতুর্থ মনোনয়ন ইত্যাদি ব্যক্ত করে। যে প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক প্রথম মনোনয়ন লাভ করে তাহাকে প্রথমে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থী কোটা অপেক্ষা বেশি প্রথম মনোনয়ন ভোট পাইলে কোটার অতিরিক্ত ভোট যে প্রার্থীরা দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছে তাহাদের হিসাবে জমা করা হয়। প্রথম মনোনয়নের দ্বারা সব কয়টি আসন পূর্ণ না হইলে দ্বিতীয় মনোনয়ন, এবং ইহাতেও না হইলে তৃতীয় মনোনয়ন, এমন কি তাহার পরেও অন্যান্য মনোনয়ন হিসাব করিয়া আসনগুলি পূর্ণ করা হয়।

সমানুপাতিক পদ্ধতির অপর নিয়মটিকে তালিকা পদ্ধতি (List System) বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট নিবাচন-কেন্দ্রের জন্য তাহাদের প্রার্থীদের একটি করিয়া তালিকা প্রস্তুত করে। নির্বাচকগণ তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন একটি তালিকাকে সামগ্রিক-ভাবে বা তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের সংখ্যার দ্বারা ক্রমিক পছন্দ অনুসারে ভোট দিতে পারে। নির্বাচনের পরে দলগুলি তাহাদের তালিকাতে প্রাপ্ত মোট ভোটসংখ্যা অনুসারে আসন লাভ করে।

২। **স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি** (Cumulative Vote System): এই পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে ভোটদাতারা ততগুলি ভোট প্রদান করিতে পারে। ভোটদাতারা ইচ্ছা করিলে এই ভোট বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে পৃথকভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পারে, অথবা একজন প্রার্থীকেই সব কয়টি স্তূপীকৃতভাবে প্রদান করিতে পারে। যদি কোনও কেন্দ্রে ৩টি আসন থাকে, তবে এক-তৃতীয়াংশের সমর্থক সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তিরা নিজেদের প্রার্থীকে সকলে ৩টি করিয়া ভোট দিয়া একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে পারে।

৩। **সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি** (Limited Vote System): এই পদ্ধতিতে নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে ভোটদাতারা তাহা অপেক্ষা একটি কম

ভোট দিতে পারে। যদি মোট ৩টি আসন থাকে তবে কোন ভোটদাতা ২টির বেশী ভোট দিতে পারিবে না। ইহার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠরা অন্তত ১টি আসন লাভ করিতে পারে।

৪। **দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি** (Second Ballot System) : এই পদ্ধতিতে কোন নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে তাহার জন্য দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হয়। দুইজনের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে কেহ যদি মোট ভোটদাতার অর্ধেকের বেশি ভোট না পায় তবে নিম্নস্থান অধিকারীকে বাদ দিয়া দুইজনের পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

রাজনৈতিক দল

POLITICAL PARTY

Q. 108. What is a party? Discuss the use, abuse and the true role of party system in Democracy. (Cal. 1951, '53.)

Define a Political Party. What are the functions of a Political Party. (Cal. 1955.)

ভূমিকা : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব খুবই বেশি। গণতন্ত্রের বিকাশের সংগে সংগে দলপ্রথাও গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাদি অনেকাংশে দলের উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন পরিচালনা করে। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠকে জনমত অনুসারে কাজ করিতে হয়। আর জনমত সৃষ্টি ও জনমত প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হইল রাজনৈতিক দল। দল-ব্যবস্থা ভিন্ন গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

বিবৃত্তি : কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কয়েকটি মূল বিষয়ে একমত হইয়া জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্য একত্রিত হইলে, এই ব্যক্তি-সমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। বার্কের মতে, কোন নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের জন্য সম্মিলিত হইয়াছে এইরূপ জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা যায়। বার্কারের মতে, যদিও রাজনৈতিক দল বিশেষ মতবাদের দ্বারা পরিচালিত, তথাপি ইহা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদের অনুমোদন পাইতে চেষ্টা করে।" প্রত্যেক দল মনে করে জাতির উন্নতির জন্য তাহাদের প্রস্তাবিত কর্মপন্থা শ্রেষ্ঠ, তাই সরকার গঠন করিয়া এই কর্মপন্থাকে তাহারা কার্যকরী করার জন্য প্রয়াসী হয়। গেটেল বলিয়াছেন, যে সব বিভিন্ন জনসমষ্টি নিজেদের জন্য অথবা কয়েকটি নীতি কার্যকরী করার জন্য সরকারী ক্ষমতা লাভ করিতে চায় রাজনৈতিক দল তাহাদের মাধ্যমস্বরূপ।

সাধারণত রাজনৈতিক দলের সহিত চক্রীদলের (faction) পার্থক্য করা হয়। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের

ব্যক্তিগত বা দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কয়েকটি বিষয়ে একমত হইয়া মিলিত হয় তখন তাহাকে দল না বলিয়া চক্রীদল বলা হয়। কিন্তু দল সর্বদাই জাতীয় স্বার্থের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিবে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল আদর্শচ্যুত হইয়া চক্রীদলে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

প্রথমত, যাহাদের মিলনে রাজনৈতিক দল গঠিত হইবে কোন কোন বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকিলেও রাষ্ট্রসংক্রান্ত মূল বিষয়গুলিতে তাহাদের সম্পূর্ণ একমত হইতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, দলের সদস্যগণকে সর্বদা নিজেদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এইরূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে 'ঐক্যই শক্তি'।

তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত কর্মপন্থাকে কার্যে পরিণত করার জন্য দলকে নিয়মতান্ত্রিক পথে চলিতে হইবে। নিয়মতন্ত্র বহির্ভূত পথে চলিলে তাহাদের প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যে সব দল নিয়মতন্ত্রবিরোধী পন্থায় বিপ্লব সাধন করিয়াছে, তাহাদেরও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দল বলিয়াই ধরা হয়। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সর্বদা নিয়মতন্ত্র মানিয়া চলে নাই।

চতুর্থত, জাতীয় স্বার্থের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক দলই সরকার গঠন করিতে চেষ্টা করে এবং এই জন্য নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায় ও নির্বাচকদের নিকট নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থিত করে।

দলপ্রথার গুণ : রাজনৈতিক দলে নিম্নলিখিত গুণগুলি দেখা যায়। এইগুলিকে দলের প্রধান কার্যও বলা চলে।

(১) কোন্ কর্মপন্থা গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ হইবে এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাহাদের নিজ নিজ কর্মপন্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করে। এই সব আদর্শ ও কর্মপন্থার পরস্পর আলোচনা-সমালোচনার মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কর্মপন্থার উদ্ভব হয়।

(২) নির্বাচনের সময় দল নীতি-নির্ধারণ ও প্রার্থী-নির্বাচনে নির্বাচককে সাহায্য করে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ প্রার্থী ও কর্মপন্থার অনুকূলে প্রচার

কার্য চালায়। ইহাতে ভোটদাতাদের পক্ষে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন সম্ভব হয়।

(৩) বিভিন্ন দলের প্রচার কার্যের ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানিতে পারে এবং ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

(৪) নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের ঘোষিত কর্মপন্থা অনুসারে দেশ শাসন করে। নির্বাচনে দাঁড়াইবার সময় বহু বিবেচনা করিয়া কর্মপন্থা ঘোষণা করিবার ফলে নূতন করিয়া এই বিষয়ে ভাবিতে হয় না, পূর্বনির্দিষ্ট কর্মপন্থাকেই কার্যে পরিণত করার জন্য তাহারা চেষ্টা করে। আইনসভায় উক্ত দলের পশ্চাতে অধিকাংশের সমর্থন আছে জানিতে পারায় নিঃশংকচিত্তে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ইহা দল ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

(৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ দল আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দলের কার্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে এবং ইহার ফলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

(৬) দলসমূহ বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনমত সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে।

(৭) দল ব্যবস্থা আছে বলিয়াই শান্তিপূর্ণ পন্থায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। জনসাধারণ সরকারী দলের কর্মপন্থাকে অপছন্দ করিলে পরবর্তী নির্বাচনে ইহাকে পরাজিত করিয়া অপর দল ও তাহার কর্মপন্থার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতে পারে।

দলপ্রথার ত্রুটি: রাজনৈতিক দলের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি দেখা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, এই সবই হইল রাজনৈতিক দলের অনাচার।

(১) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানের ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। দলের সভ্য ও সমর্থকগণ দলীয় ভিত্তিতে চিন্তা করিতে শেখে এবং প্রয়োজনের সময় দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া সকলে এক জাতিভুক্ত মনে করিয়া কাজ করিতে পারে না।

(২) নিজ দলের মধ্যে যে ঐক্যের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহাও কৃত্রিম। ইহা অনেক সময় উপর হইতে জোর করিয়া চাপান হয়।

(৩) জাতীয় স্বার্থের নাম করিয়া দলের কর্মসূচী প্রণয়ন করিলেও প্রায়ই

দেখা যায়, ইহা বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায় অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে।

(৪) দলসমূহ গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় একথা বলা হইলেও কার্যত ইহা ব্যক্তিত্বশালী এক বা একাধিক নেতার ইচ্ছানুসারে চলে।

(৫) দল ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে। দলের কঠোর নিয়ম-শৃংখলা মানিয়া চলিতে হয় ও সব বিষয়ে দলের নীতিকে সমর্থন করিতে হয় বলিয়া দলের সাধারণ সদস্যরা নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে কিংবা মত প্রকাশ করিতে পারে না।

(৬) নির্বাচনে জয়লাভের প্রলোভনে অনেক সময় দলগুলি মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে।

(৭) অনেক জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি দলের অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারেন না বলিয়া দলীয় গণতন্ত্রে তাঁহারা নির্বাচিত হইতে পারেন না। ইহাতে যোগ্য ব্যক্তিদের সেবা হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

(৮) বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা, মনোমালিন্য ও রেষারেষি অনেক সময় এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে ইহাতে সমগ্র সমাজ-জীবন দূষিত হইয়া পড়ে।

উপসংহার: দল ব্যবস্থার অনেক কুফল থাকিলেও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন, শাসন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন, জনমত সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে দল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও দলের অন্যায় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দলীয় ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

Q. 109. Can democracy function in a one-party state?
(Cal. 1953, 1961)

সোবিয়েত ইউনিয়নে কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে—কমিউনিষ্ট পার্টি। অন্য কোন দল সেখানে স্থাপন করা চলে না। রুশ বিপ্লবের পর হইতেই তাই এই প্রশ্নে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়াছে: এক দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কি সম্ভব? এই প্রশ্নে স্পষ্টতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এক শ্রেণীর মত ঃ একদলীয় শাসন গণতন্ত্রের বিরোধী। সাধারণতঃ যাহারা কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী নহেন, তাহারা প্রায় সকলেই এই কথা বলেন। রাষ্ট্রশাসনের জন্য নিদিষ্ট কর্মপন্থা উপস্থিত করিয়া রাজনৈতিক দল নির্বাচকদের সমর্থন প্রার্থনা করিবে। নির্বাচকগণের অধিকাংশ এই কর্মপন্থা সমর্থন করিলে উক্ত দল শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত এই দল যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে তাহার জন্য তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য অপর দলের প্রয়োজন। সরকারী দল যাহাতে শাসনক্ষমতার সাহায্যে অন্যায় কার্য না করে তাহা দেখিবার জন্য ও প্রয়োজনবোধে অন্যায়ের সমালোচনা করিবার জন্য অপর দলের অস্তিত্ব প্রয়োজন। শাসনকালে যদি জনসাধারণের মনে হয় সরকারী দলের কর্মপন্থা ভাল নয়, তবে এই কর্মপন্থাকে বর্জন করিয়া ভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। অন্য দল থাকিলে তবেই অন্য কর্মপন্থা সম্ভব। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সকল মানুষের মতামত একইরূপ হইতে পারে না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন দল গঠনের অধিকার থাকা উচিত। নির্বাচকগণ যে কর্মপন্থার পক্ষে মত প্রকাশ করিবে, শাসন পরিচালনায় তাহা প্রয়োগ করা হইবে। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য বহুদলের প্রয়োজন। একদল ব্যবস্থায় একটি মাত্র কর্মপন্থা থাকিবে এবং সকলকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাতে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়।

অপর শ্রেণীর মত ঃ একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের প্রতিকূল নয়। সোবিয়েত ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ভ্রান্ত ধারণা হইতে একদলীয় শাসনকে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দল হইল বিশেষ শ্রেণী বা শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধি। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিবাদী, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী আছে বলিয়া বিভিন্ন দল রহিয়াছে। অর্থনৈতিক শোষণের কর্তৃত্ব যে শ্রেণীর হাতে সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদলই রাষ্ট্রশাসন করে। কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর শ্রেণীবৈষম্যের বিলোপ ঘটিয়াছে। এখন সেখানে মাত্র একটি শ্রেণী, সর্বহারা শ্রেণী রহিয়াছে—যাহার মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত। একাধিক শ্রেণী যখন নাই, একাধিক দলও তখন থাকিতে পারে না। সোবিয়েত ইউনিয়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই, সুতরাং পরস্পর স্বার্থবিরোধী একাধিক কর্মপন্থা কিংবা তাহাদের সমর্থনকারী বিভিন্ন দলের

অস্তিত্বও সম্ভব নয়। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একাই কাজ করিবে।

উপসংহার : পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন দলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা সত্য। তথাপি শ্রেণীবৈষম্য বিলোপের পর একাধিক দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রবিরোধী, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। রাষ্ট্র-কল্যাণের প্রশ্নে শোষণস্বার্থমুক্ত সৎ ব্যক্তিদের মধ্যেও মতভেদ থাকিতে পারে। এই মতভেদ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে না দিলে বা দলের মাধ্যমে ইহা সংগঠিত হইবার সুযোগ না থাকিলে স্বাধীন মত প্রকাশের যে মূল গণতান্ত্রিক আদর্শ তাহা ব্যাহত হয় ও নানা নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ প্রশ্রয় পায়।

Q 110. Compare the advantages and drawbacks of the two party system with those of the multiple-party system.

ভূমিকা : গণতন্ত্রের বিকাশের সহিত বিভিন্ন দেশে দলপ্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে বিভিন্ন দেশে ইহার রূপ বিভিন্ন প্রকার। গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত দুইটি দল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গ্রেট বৃটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) ও রক্ষণশীল দল (Conservative Party)। উদারনৈতিক দল, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি অন্যান্য দল থাকিলেও ইহাদের বিশেষ কোন প্রভাব নাই। প্রধান দুই দলের মধ্যে একটি শাসন পরিচালনা করে ও অপর দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। আবার হয়ত বিরোধী দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকারী দলের মর্যাদা লাভ করে ও পূর্বতন সরকারী দল বিরোধী দলের স্থান গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এইরূপ প্রধান দুই দল—গণতান্ত্রিক দল (Democratic Party) ও সাধারণতন্ত্রী দল (Republican Party)। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি আরও কয়েকটি দল থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্ব নামমাত্র। গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থাকে **দ্বি-দলীয় প্রথা** (two party or bi-party system) বলা হয়।

কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা মাত্র দুই-এর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া অনেকগুলি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ফ্রান্স ও ভারত এইরূপ দল ব্যবস্থার উদাহরণ। ইহাকে **বহু-দলীয় প্রথা** (multiple

party system) বলা হয়। [আবার সোবিয়েত ইউনিয়নে মাত্র একটি দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে—ইহাকে একদলীয় প্রথা (one party system) বলা হয়।]

দ্বি-দলীয় প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা : দ্বি-দলীয় প্রথা পার্লামেন্টারী শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। ইহার পশ্চাতে আইনসভার অধিকাংশের সমর্থন আছে জানিয়া নিশ্চিতভাবে সরকার কাজ করিতে পারে। ইহাতে সরকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়িত্বলাভ করে। আবার একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকায় তাহার সমালোচনার ভয়ে সরকার জনস্বার্থবিরোধী কাজ করিতে সাহসী হয় না। কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর আইনসভার অধিকাংশ সদস্য কিংবা নির্বাচনকালে নির্বাচকমণ্ডলী অনাস্থা প্রকাশ করিলে বিরোধী দল সংগে সংগে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল, মাত্র দুইটি দল থাকিবার ফলে এই দুইটি দলের কোনটিই মতের সমর্থক নহে এমন ব্যক্তিদের মত প্রকাশিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, দ্বি-দলীয় প্রথায় মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছাচারী হইবার আশংকা থাকে। স্বপক্ষীয় সভ্যগণ বিরোধী দলের হাতে ক্ষমতা যাইবার সময় মন্ত্রীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি বা অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করিতে পারে না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দলের নিয়ম শৃংখলা অত্যন্ত কঠোর হয় এবং ইহাতে সাধারণ সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়।

বহু-দল প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা : বহু-দল প্রথার প্রধান গুণ হইল, জনমতের সকল দিকই ইহাতে সহজভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মতই নিজ দলের মাধ্যমে তাহাদের প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা বা সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারী হইবার আশংকা বিশেষ থাকে না। তৃতীয়ত, বহুদলের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হইলে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে সকল কাজ করা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে এইরূপ শাসন বিশেষ কার্যকরী হয় ও ইহাতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহু-দল প্রথার কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় সরকার প্রায়ই অস্থায়ী ও দুর্বল হয়। প্রতিনিধিগণ বহু দলে বিভক্ত হইবার ফলে আইনসভায় অনেক সময় কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ করিতে পারে না। ইহাতে দুই বা তিনটি দলের মিলিত সরকার (coalition

government) গঠন করিতে হয়। কিন্তু পরস্পর বিরোধিতার জন্য এইরূপ সরকার দুর্বল হয়। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থক ও সভ্যগণ দল ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দল গঠন করিতে পারে, সর্বদাই এই ভয় থাকে এবং ইহাতে সরকার অস্থায়ী হয়। বহু দল থাকিলে নির্বাচকগণ অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক দলের অস্তিত্বের ফলে দেশে দলাদলিও বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার—বহু-দলীয় প্রথার তুলনায় দ্বি-দলীয় প্রথা নিঃসন্দেহে ভাল। তবে দ্বি-দলীয় প্রথার কঠোরতাও (rigidity) গণতন্ত্রের দিক হইতে বাঞ্ছনীয় নহে। তাই অনেকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতি। একেবারে গোণাগুণতি দুইটি দলও নয়, আবার অসংখ্য দলও নয়, পাঁচ-ছয় বা সাতটি দল থাকিলে ভাল হয়। মোটামুটি যে কয়টি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মত দেখা যাইবে তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ এক একটি দল থাকিতে পারে।

জনমত

PUBLIC OPINION

Q. 111. What do you mean by Public Opinion? How is it formulated and moulded? **(Cal. 1953)**

বিবৃতি—জনমত কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা কি হইবে, এই বিষয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইহার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তথাপি ইহার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি। রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন বিষয়ে বেশ কিছু-সংখ্যক লোক স্পষ্টভাবে কোন অভিমত প্রকাশ করিলে এবং অন্যান্য লোক সেই মতের গুরুত্ব অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে তাহাকে আমরা জনমত বলিতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের যে মত ব্যক্ত হয়, তাহাই জনমত। কিন্তু জনসাধারণ সে মত প্রকাশ করিবে কি প্রকারে? জনসাধারণের সকলে কোন বিষয়ে একমত না হইলে তাহা কি জনমত হইতে পারে? রাষ্ট্রকল্যাণের বিরোধী কোন মত যদি ব্যক্ত হয় তাহা কি জনমত নামের যোগ্য? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রয়োজন।

ফরাসী লেখক লাওয়েল বলিয়াছেন, জনমত 'জনসাধারণের' নয়, এবং ইহা 'মত'ও নয়। জনমত হইবার জন্য সকল জনসাধারণের একমত হইবার দরকার নাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থনেরও প্রয়োজন নাই। সমাজের পক্ষে কল্যাণকর এইরূপ কোন অভিমত একদল ব্যক্তি যদি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে ও তাঁহার স্বপক্ষে অন্যান্য ব্যক্তির সমর্থন আদায়ের জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করে তবেই তাহা জনমত আখ্যা লাভ করিতে পারে। সুতরাং জনমতের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়:

(১) ইহা সমাজের কল্যাণের জন্য হওয়া চাই। দেশের অধিকাংশ মানুষ কোন অন্যায় কার্যের স্বপক্ষে সমবেতভাবে মত প্রকাশ করিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাকে জনমত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

(২) একদল ব্যক্তিকে (তাহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ বা অতি অল্পসংখ্যক যেরূপেই হউক না কেন) দৃঢ়তার সহিত মতটিকে সমর্থন করিতে হইবে এবং ইহার প্রচারের জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মতের উদ্যোক্তা ভিন্ন অন্যান্য যে ব্যক্তিরা রহিয়াছে তাহাদের এই মতের গুরুত্বকে স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসংগে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বিবাহে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বর্তমানে ভারতে বেশ জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মত প্রচারের ক্ষেত্রে দেশের সকল নর-নারী কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই প্রথা বিলোপের মত সমর্থন করে কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। একদল আদর্শবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত ইহার পক্ষে সংঘবদ্ধ প্রচার চালাইতে থাকে। অন্যান্য ব্যক্তিরাও ইহার যুক্তির সারবত্তা অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। ফলে বর্তমানে ইহা শক্তিশালী জনমতে পরিণত হইয়াছে।

জনমতের গুরুত্ব : গণতন্ত্রে জনমতের গুরত্ব অসীম নির্বাচনে বিভিন্ন বিষয়ে যে জনমত গড়িয়া উঠে তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে জনসাধারণ ভোট দিয়া থাকে। নির্বাচিত ব্যক্তিরা জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। তাহারা জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শাসনকার্য চালায়। জনসাধারণ জনমত সৃষ্টির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করে। কোন সরকারের পক্ষেই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া চলা সম্ভব নয়। জনমতের বিরুদ্ধে গেলে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং সরকারের পক্ষে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয় না।

জনমত গঠনের উপাদানসমূহ : (১) রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মপন্থা ও জনসাধারণের নানারূপ সমস্যা লইয়া আলোচনা করে এবং নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে জনসাধারণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। জনসাধারণ নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন দলের বক্তব্য সমর্থন করে এবং ইহাতে বিভিন্ন মত প্রকাশ ও গঠনের কাজ সম্ভব হয়।

(২) মুদ্রাযন্ত্র—জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংবাদপত্রে যে সব সংবাদ, মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় জনসাধারণের মতকে তাহা যথেষ্ট প্রভাবিত করে। দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়াও সাময়িকপত্র, পুস্তক ও নানাপ্রকার ইস্তাহার জনমত গঠনে সাহায্য করে।

(৩) বেতার—আধুনিককালে বেতার সংবাদ ও অভিমত প্রচারের অন্যতম বাহন। ইহার সাহায্যেও জনসাধারণ নিজেদের মত গঠন করে।

(৪) চলচ্চিত্র—চলচ্চিত্রও জনমতকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ইহার দ্বারা জনসাধারণের মত গড়িয়া উঠে।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পাঠ গ্রহণের সময় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। পরস্পর মেলামেশার দ্বারাও তাহারা অনেক কিছু জানিতে পারে। ছাত্র ও পরবর্তী জীবনে নাগরিকরূপকে এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জনমত সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

(৬) সভা সমিতি—বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাগণ সভাসমিতিতে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন ও জনসাধারণকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেন। জনমত সৃষ্টিতে ইহার গুরুত্ব অনেক।

(৭) আইনসভা—আইনসভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে নানা মত ব্যক্ত করে। প্রতিনিধিরা অনেক সময় জনসাধারণের নির্দিষ্ট মতকে প্রকাশ করে, এবং আইনসভার বাহিরে জনসাধারণ সভাসমিতি, সংবাদপত্র প্রভৃতি মারফত এই সব বক্তব্যের আলোচনা করে। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ পায়। সুতরাং জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকাও অনেকখানি।

উপসংহার—গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও সুচিন্তিত জনমত একান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই ইহা গঠনের উপাদানগুলি ত্রুটিপূর্ণ ও জনমত গঠনের পথ বাধাসংকুল। বেতার প্রভৃতি সরকার পরিচালিত, মুদ্রাযন্ত্র বিত্তশালীদের করায়ত্ত, সভাসমিতির অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের উপর নানারূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা প্রভৃতির জন্য সুষ্ঠুভাবে জনমত প্রকাশ সব সময় সম্ভব হয় না। ইহার বাধাগুলি দূর করা অবশ্য প্রয়োজন। একদিকে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও অপরদিকে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত বেতার, চলচ্চিত্র, মুদ্রাযন্ত্র, সভাসমিতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে জনমত গঠন ও ইহার প্রকাশ সম্ভব হইবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

LOCAL SELE-GOVERNMENT

Q. 112. Define Local Government and distinguish it from Central Government. (Cal. 1944)

ভূমিকা—আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন বড় হইবার ফলে কোন রাষ্ট্রেই আজ আর একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের সকল কাজ করা সম্ভব হয় না। ইহার জন্য স্থানীয়ভাবে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংগঠন গড়িয়া তাহাদের হাতে শাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শাসনকার্যের সুবিধা ও গণতন্ত্রের প্রসার, দুই দিক হইতেই এইরূপ শাসন-সংগঠনের গুরুত্ব খুব বেশি।

বিবৃতি—প্রত্যেক রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য জেলা, শহর, গ্রাম প্রভৃতির ভিত্তিতে যে বিভিন্ন-সংগঠন গড়িয়া তোলা হয় তাহাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্থানীয় সরকার বলা হয়। গ্রেট বৃটেনের কাউন্টি, বরো ও পারিস্ কাউন্সিল প্রভৃতি, ফ্র্যান্সের কমিউন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিটি কাউন্সিল এবং ভারতের মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রীক বোর্ড, পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি এই জাতীয় সংগঠন।

অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের অংগ-রাজ্যগুলিকেও স্থানীয় সরকার বলা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্থানীয় সরকার (Local Government) বলিতে এইরূপ ক্ষুদ্র অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকেই বোঝায়।

সাধারণতঃ এই সব সংগঠনের হাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল ও আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পার্থক্য—রাষ্ট্রশাসন নীতির দিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় সরকারের নীতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। লীককের মতে এই পার্থক্য দুই দিক হইতে বিবেচনা করা উচিত—প্রথম, সংবিধানের দিক হইতে; দ্বিতীয়, ইহাদের সম্পাদিত কার্যের দিক হইতে।

সংবিধানের দিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় সরকার নিজ কার্যের ক্ষেত্রে ইচ্ছামত কার্য সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু স্থানীয় সরকারগুলি সংবিধানের ধারা

অনুসারে সৃষ্টি হয় নাই, কিংবা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে না।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারের কার্য নিয়ন্ত্রণ গ্রেট বৃটেন বা ফ্রান্সের ন্যায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে যেমন হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহা হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অংগ-রাজ্যগুলির সংবিধানে ইহাদের নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং ইহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে মোটামুটি স্বাধীন।

দ্বিতীয়ত, কার্যের দিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত দেশরক্ষা, শান্তি-শৃংখলা স্থাপন, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য সম্পাদক করিয়া থাকে। কোন একটি অঞ্চলের পরিবর্তে সমগ্র দেশের সাধারণ সমস্যাগুলি ইহার বিবেচনার বিষয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার রাস্তায় আলো প্রদান, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিতান্তই স্থানীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

[এই প্রশ্নের পূর্ণাংগ উত্তরের জন্য ইহার সহিত ১১৪নং প্রশ্নের উত্তরও যোগ দিতে হইবে।]

Q. 113. What are the distinctive functions of local Government in a modern state ? (Cal. 1944)

নির্দিষ্ট অঞ্চলের নাগরিকদের সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা স্থানীয় সরকারের কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকারের কাজগুলিকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) **সংরক্ষণের কাজ**—(Protective Work): পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, সঠিক ওজন-পদ্ধতি অনুসরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের দ্বারা তদারক করিবার কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) **বৈষয়িক কাজ** (Communal Work): রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, ড্রেন পরিষ্কার প্রভৃতি ইহার মধ্যে পড়ে।

(৩) **সমাজসেবার কাজ** (Social Service Work): শিক্ষা, গৃহ-নির্মাণ, শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অক্ষম, অনাথ ও বৃদ্ধের সংস্থান, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, পার্ক ও খেলার ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের প্রধান সমাজসেবামূলক কাজ।

(৪) **ব্যবসামূলক কাজ** (Trading Work): গৃহে জল ও আলো সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা, বাজার পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ স্থানীয় সরকার ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করিতে পারে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই স্থানীয় সরকারকে অধিক পরিমাণে জনকল্যাণের কাজ গ্রহণ করিতে হইতেছে।

Q 114. Discuss the proposition that democratic Government can succeed only on his basis of a Local Self-Government. What is the importance of Local Government in democracy ?

বিরাট রাষ্ট্রের সকল খুঁটিনাটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়, প্রধানত এই কারণে এবং সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র কেন্দ্রে সরকারের হাতে না রাখিয়া স্থানীয় জনসাধারণকেও কিছু ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হোক, এই যুক্তিতে প্রায় সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই স্থানীয় সরকার গঠিত হইয়াছে।

গণতন্ত্রের আদর্শের দিক হইতে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। জনসাধারণের সকলের পক্ষে কেন্দ্রের (এমন কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অংগরাজ্যেও) আইনসভা প্রভৃতির সদস্য হওয়া সম্ভব নহে। অথচ কোন কোন বিষয়ে তাহারাও শাসন-পরিচালনার কাজ করিতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে ইহা সম্ভব হইয়াছে। স্থানীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় পরিচালনার ভার স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতেই দেওয়া হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে আইনত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকিলেও সাধারণত স্থানীয় সরকারের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় না।

রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেবল একটি কেন্দ্রীয় সরকার বা কয়েকটি রাজ্য সরকারের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বহুসংখ্যক স্থানীয় সরকারের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে সরকারের স্বেচ্ছাচারী হইবার আশংকা কম থাকে। এইরূপ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের দিক হইতে বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

স্থানীয় ভিত্তিতে যাহারা শাসন-পরিচালনা কার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কার্যে অংশ গ্রহণে এই অভিজ্ঞতা তাহাদের বিশেষ সাহায্য করে।

স্থানীয় সরকারের কার্যের মধ্য দিয়া জনসাধারণ বিভিন্ন ব্যক্তির সততা, চরিত্র, দক্ষতা ও মতবাদের পরিচয় লাভ করে এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনে তাহাদের সুবিধা হয়।

দূরবর্তী রাজধানী-শহর হইতে দেশের সকল স্থানের সমস্যা ঠিকমত জানা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকারের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

রাষ্ট্রের কর্মপরিধি

THE SPHERE OF THE STATE

Q. 115. What in your opinion is the proper end of the State? (Cal. 1937,' 38, '50)

Or, Discuss various theories of the end and purpose of the State. (Cal. 1952)

ভূমিকা—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি, ইহার কর্মপরিধি কতদূর বিস্তৃত, অর্থাৎ কোন কাজ রাষ্ট্রের করণীয়, আর কোন কাজ রাষ্ট্রের করা উচিত নয়, এই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখকগণ একমত নহেন। বলিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সুরু হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই সম্পর্কে মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। গেটেল বলিয়াছেন, সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ কি, সে সম্বন্ধে মানুষ যেমন একমত হইতে পারে নাই সেইরূপ রাষ্ট্র কোন কোন কার্য সম্পাদন করিয়া তাহার উদ্দেশ্যসাধন করিবে সেই বিষয়ে আজ পর্যন্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বিবৃতি—প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল, জার্মান লেখক হেগেল ইংরেজ আদর্শবাদিগণ, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ, এবং নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী লেখকগণ রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উর্ধে স্থান দিয়াছেন। এই সব লেখকদের মতে রাষ্ট্র সর্বব্যাপক। রাষ্ট্রই লক্ষ্য; রাষ্ট্রের জন্যই নাগরিক। নাগরিকদের রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নাই। নাগরিকদের নিজেদের ভাল মন্দ বুঝিবার বা স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং রাষ্ট্রকে নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করিতে হইবে। এইরূপ মত অনুসারে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নাগরিকদের কল্যাণসাধন করা, এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সীমাহীন।

অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, মানুষের প্রকৃত সুখের ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সুবিবেচনা প্রসূত কার্যের দ্বারাই কেবলমাত্র সুখ সম্ভব। রাষ্ট্র শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা এই উদ্দেশ্যকে সফল করে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যবাদী ও বহুত্ববাদী প্রভৃতি লেখকদের মতে রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। বাস্তব কারণে ইহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয় বলিয়া ইহাকে তাঁহারা একটি প্রয়োজনীয়

খারাপ জিনিস' (a necessary evil) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যক্তি এখানে রাষ্ট্রের উর্ধ্বে। রাষ্ট্র লক্ষ্য নহে, পন্থা মাত্র। এই মত অনুসারে রাষ্ট্রের কাজ হইবে যৎসামান্য যাহা না করিলেই নয়। পররাজ্যের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা ভিন্ন রাষ্ট্রের অপর কোন কাজ থাকিবে না। অন্য সব কাজ ব্যক্তিরা করিবে। নৈরাজ্যবাদীরা আবার রাষ্ট্রের প্রয়োজনকেই স্বীকার করেন না।

মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি কমিউনিষ্ট লেখকগণের মতে, রাষ্ট্র সমাজের শ্রেণীশাসনের যন্ত্র মাত্র। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রেণীশাসনকে অব্যাহত রাখা। যেদিন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে, সেইদিন রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

এইরূপ বিপরীতমুখী চরম মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে; অনেকে আবার ইহাদের মধ্যে মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বে যখন রাষ্ট্রকে শাসকদলের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত তখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে গণতন্ত্রের প্রসার ও উদারনৈতিক মতবাদের আবির্ভাবের সময় হইতে ইহা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।

ব্লুন্‌ৎস্লি সাধারণের কল্যাণসাধনকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেন্থাম প্রভৃতি হিতবাদী লেখকগণ বলিয়াছেন, 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণসাধনই' (greatest good for the greatest number) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা নহে, সুন্দর জীবনযাপনের পথে যে সব বাধা রহিয়াছে, তাহার অপসারণ করাই রাষ্ট্রের কাজ। আধুনিক লেখকগণের মতে, রাষ্ট্র কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। সুতরাং নাগরিকদের কল্যাণ হইতে পারে এমন সকল কাজ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কয়েকজন লেখক তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে উইলোবি, গার্ণার ও বার্জেসের শ্রেণীবিভাগ আমরা আলোচনা করিতে পারি।

উইলোবির মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চরম—এই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা; মাধ্যমিক উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যবস্থা করা; আর চরম

উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক ও আর্থিক কল্যাণ সাধন করা।

গার্ণার তিন ভাগে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমত, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয়ত, মানবসভ্যতার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা।

বার্জেসের মতে, রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; মাধ্যমিক উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনের উন্নয়ন; এবং চরম উদ্দেশ্য হইল সর্ব মানব-সমাজের কল্যাণসাধন।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ল্যাস্কির অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্র হইল জনসাধারণের সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সংগঠন। ইহার কার্যাবলী মানুষের আচরণের ঐক্যসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে এই সীমার সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটিবে। সুতরাং মানুষের সমগ্র কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্ভূত হয় নাই। ইহা সমাজজীবনের পরিধি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নহে।

উপসংহার—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সবদেশ ও সবকালের জন্য একইরূপ হইতে পারে না, বিভিন্ন লেখকের মতামত হইতে এইরূপ ধারণাই হয়। দেশ ও কাল ভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পৃথক হইয়া থাকে। তথাপি সাধারণভাবে বলা যায়, শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা নাগরিক জীবনের পূর্ণবিকাশ এবং সংগে সংগে মানবসভ্যতার উন্নয়নসাধন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

Q. 116 What in your opinion is the proper sphere of the State? (Cal. 1955, 1961)

Can any limit be put to the proper sphere of the State in modern times? Give reasons for your answer.

ভূমিকা—রাষ্ট্রের কর্মপরিধি কতদূর বিস্তৃত, এই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মোটামুটি দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, রাষ্ট্র যে কোন কাজ করিতে পারে—ইহার কর্মপরিধির কোন সীমারেখা টানা যায় না। অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, রাষ্ট্রের কাজ হইবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন কাজ রাষ্ট্র করিবে না।

কিন্তু আসলে এই দুই মতবাদের কোনটির দ্বারাই রাষ্ট্রের কার্যের প্রকৃত সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতানুসারে, রাষ্ট্রের কাজ কেবলমাত্র পুলিশের কাজ নহে, আবার সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণামতে, ইহার হাতে কোনরূপ সীমা নির্দেশ না করিয়া সকল কাজের ক্ষমতাও দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্মপরিধি স্থির করিতে হইলে এই দুই মতের মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে।

বিবৃতি—বর্তমানে রাষ্ট্রকে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করা হয়। নাগরিকদের কল্যাণের দ্বারা জাতির উন্নয়নের জন্য যাহা কিছু করণীয় রাষ্ট্র তাহা করিতে পারে। জাতির উন্নতির সংগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দিকেও রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূর্বে অনেক কাজ একান্তভাবে ব্যক্তির করণীয় বলিয়া মনে করা হইত, যেমন শিল্প পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্যের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সর্বত্র এই সব কাজ রাষ্ট্রের অবশ্য-করণীয় বলিয়া গৃহীত হইতেছে। ব্যক্তির পক্ষে এইগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়, এবং ইহা না করিলে সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে, সুতরাং রাষ্ট্রকে ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মোট কথা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তাহার কার্যাবলীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্র যে কাজ করিবে তাহার দ্বারা যদি নাগরিকদের কল্যাণ হয় তবে সেই কাজ নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। বিশাল জনসমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। রাষ্ট্রের কাজকে সাধারণত আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ঐচ্ছিক কার্যাবলীও প্রায় আবশ্যিক কার্যে পরিণত হইতেছে। এই কারণে অনেকেই মনে করেন, রাষ্ট্রের কর্মপরিধির কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

সমালোচনা—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নাগরিকদের কল্যাণসাধন করা। সুতরাং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কার্য রাষ্ট্র অবশ্যই করিতে পারিবে। তাই বলিয়া রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাহীন, ইহা ঠিক নহে। ম্যাকাইভার বলিয়াছেন, নাগরিকদের শিশুর ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতিটি কর্ম নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কতকগুলি বিষয়কে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের সীমারেখার বাহিরে রাখা একান্ত প্রয়োজন। নাগরিকের

স্বাধীন মত প্রকাশে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য ব্যক্ত মতের দ্বারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নষ্ট হইলে, কিংবা প্রতিবেশী নাগরিকদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইলে এই মত নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

সাধারণত মানুষের নৈতিক জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, আহার ও পোশাক, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। রাষ্ট্র এইসব বিষয়ে তাহার কর্মসীমা বিস্তৃত করার চেষ্টা করিলে অনর্থের সৃষ্টি হয়। একনায়কতন্ত্রী শাসনে এইরূপ চেষ্টা হওয়ার ফলে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এইদিকে নূতন করিয়া দৃষ্টি পড়িয়াছে।

উপসংহার—মূল কথা হইলে, রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহা প্রায় নাগরিকজীবনের সকল দিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করিয়াছে। তবে নাগরিকদের স্বাধীন কার্যকলাপ যতক্ষণ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হয় ততক্ষণ নাগরিকদের কোন কার্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যে সব কাজ ব্যক্তির পক্ষে একা বেশ ভালভাবেই করা সম্ভব, তাহা রাষ্ট্রের করা উচিত নহে, বরং ব্যক্তি যাহাতে তাহা ঠিকভাবে করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত। কিন্তু যদি কোন কাজ ব্যক্তির দ্বারা ঠিকভাবে করা সম্ভব না হয়, তবে তাহা রাষ্ট্রের নিজ হস্তে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

INDIVIDUALISM & SOCIALISM

Q. 117. Compare and contrast the various forms of Socialism as regards aims, methods and programmes of action.

ভূমিকা—বর্তমান যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বরূপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Laissez Faire) মতবাদ আজ সর্বত্র পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে এবং ইহার স্থলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইল: উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির কোন কর্তৃক থাকিবে না, ইহার উপর সমগ্র সমাজের মালিকানা থাকিবে। রাষ্ট্র কর্তৃক সব কিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে। সমাজতন্ত্রী সমাজে কেহ কাহারও উপর অন্যায় আধিপত্য করিতে পারিবে না, সকলের জন্য কাজ, বিশ্রাম ও উপযুক্ত মজুরীর ব্যবস্থা হইবে এবং এখানে এমন ব্যবস্থা করা হইবে যে প্রত্যেকে তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজনের জিনিস পাইবে।

এই মূল বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রায় একমত হইলেও লক্ষ্য, পদ্ধতি ও কার্যক্রমের দিক হইতে সমাজতন্ত্রবাদীরা বহু দলে বিভক্ত। সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাই বিভিন্নপ্রকার মতবাদ দেখা যায়।

বিভিন্নপ্রকার সমাজতন্ত্র—বর্তমানকালে আমরা প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচপ্রকার সমাজতন্ত্রের পরিচয় পাই—

(১) **রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র** (State Socialism): ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সর্বপ্রকার উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের মুনাফার দ্বারা রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণের ব্যবস্থা করিবে। এই ধরণের সমাজতন্ত্রে বেকার ভাতা, বার্ধক্যভাতা বা পেনসন, শ্রমিকদের জীবনবীমা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

নির্বাচিত পদ্ধতির সাহায্যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া আইন প্রণয়নের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে, এইরূপ আশা করা হয়। গ্রেট বৃটেনে লেবার পার্টির আমলে কিছু

পরিমাণে এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতেও অনুরূপ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গড়ার চেষ্টা চলিতেছে।

(২) **ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র** (Fabian Socialism): গ্রেট বৃটেনে জর্জ বার্ণার্ড শ, এইচ্, জি, ওয়েলস্ প্রভৃতি লেখক রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের মতই একপ্রকারের সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের সমিতি 'ফেবিয়ান সোসাইটি'র নামানুসারে ইহাকে সাধারণত ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র বলা হয়। এই মত অনুসারে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে অনুকূল জনমত সৃষ্টি হইবে এবং তখন সমাজতন্ত্র এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে যে সমাজতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া উঠিবে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মতবাদের আসল বক্তব্য হইল, জোরজবরদস্তি করিয়া কখনও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা মানুষকে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

(৩) **যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্র** (Syndicalism): এই মতবাদে বলা হয়, রাষ্ট্র শিল্পগুলির মালিক হইবে না, শ্রমিক-সংঘগুলি ইহার মালিক হইবে। ফরাসী শব্দ সিণ্ডিকেট (Syndicate) কথাটির অর্থ হইল শ্রমিক সংঘ। সিণ্ডিকালিষ্টদের মতে, রাষ্ট্র ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং ইহা সর্বদাই শ্রমিকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাইতে চায়। সুতরাং ইহারাও রাষ্ট্রের বিলোপ কামনা করে। ধর্মঘট, কারখানায় অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকরা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চায়। রাষ্ট্র ধ্বংসের পর শ্রমিক সংঘগুলি শিল্পসমূহ পরিচালনা করিবে। সংঘসমূহের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

(৪) **সংঘমূলক সমাজতন্ত্র** (Guild Socialism): জি, ডি, এইচ্, কোল প্রভৃতি লেখক রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের মধ্যে মধ্যপন্থা স্বরূপ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। শিল্পসমূহের পরিচালনাভার থাকিবে শ্রমিক-সংঘের উপর। কিন্তু সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না। উৎপাদন অর্থাৎ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেমন শ্রমিক সংঘ, সেইরূপ ক্রেতাদের স্বার্থ দেখিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন শাসন পরিচালনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতির জন্যও রাষ্ট্রের প্রয়োজন। উৎপাদকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার জন্য চূড়ান্ত ক্ষমতা-

সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান থাকিবে। যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের ন্যায় সংঘ মূলক সমাজতন্ত্রীরা হিংসাত্মক পন্থায় বিশ্বাসী নহে। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইহাদের উদ্দেশ্য।

(৫) সাম্যবাদ বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র (Communism or Marxian Socialism): অতি প্রাচীন কালে প্লেটোর যুগ হইতে সমাজতন্ত্রের আলোচনা সুরু হইলেও ইহা প্রধানত কল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল মার্কসই প্রথম ইহার বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদান করেন। মার্কস ও তাঁহার সহকর্মী এঙ্গেলস 'ক্যাপিট্যাল', 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজতন্ত্রের একটি স্পষ্ট রূপ ও তাহা কার্যকরী করার জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করেন।

মার্কসের সমাজতন্ত্র তিনটি মূল সূত্রের ভিত্তিতে গঠিত—(ক) উদ্বৃত্ত-মূল্যের মতবাদ, (খ) ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ও (গ) শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রমিকের শ্রমের ফলেই সাধারণত উৎপাদন হইয়া থাকে। অথচ শ্রমিকের উৎপাদিত দ্রব্য যে দামে বাজারে বিক্রয় হয় শ্রমিককে তাহা অপেক্ষা কম মজুরী দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত-মূল্য শিল্পের মালিক 'আত্মসাৎ' করে, ইহার সাহায্যেই মূলধনের সৃষ্টি হয়।

ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়া মার্কস দেখাইয়াছেন, আদিম সাম্যবাদের যুগের পর হইতে মানব সভ্যতার ইতিহাস সর্বদাই এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণের ইতিহাস। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকার কার্যের ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক। এই মতানুসারে, রাষ্ট্র হইল শ্রেণী শাসনের হাতিয়ারস্বরূপ। সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শ্রেণীর বিলোপ ঘটিলে রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব শেষ হইবে। মার্কসের মতে, আদিম সাম্যবাদের পর হইতে আজ পর্যন্ত সমাজের ইতিহাস হইল একটানা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

পুঁজিবাদ হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার পন্থা সম্পর্কে এই মতবাদে বলা হইয়াছে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতি অনুসারে একদিকে সামান্য কয়েক ব্যক্তির হস্তে সকল মূলধন আসিয়া জমা হইবে এবং অপরদিকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ক্রমে এমন অবস্থা আসিবে যে শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদীদের নিকট হইতে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং সর্বপ্রকার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মালিকানা স্বহস্তে গ্রহণ করিবে। এইভাবে সমাজতন্ত্রের পত্তন হইবে।

বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণী 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করিয়া ধনিক শ্রেণীর সর্বপ্রকার অপচেষ্টাকে রোধ করিবে এবং সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করিবে। ইহার পরবর্তী স্তরে আদর্শ সাম্যবাদ, অর্থাৎ শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সাম্যবাদে প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজন মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাইবে। এই মতবাদের একটি রূপ রাশিয়ায় প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং আরেকটি রূপ যুগোশ্লাভিয়ায়।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism): সাম্প্রতিক পৃথিবীতে মার্কসীয় ধারার বিকল্প আরেকটি সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ এই তিনটি ধারার মিলিত প্রবাহে সমুন্নত আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের এই ধারা সমাজসাম্যের সহিত মানবিক গণতন্ত্রের মিলনের প্রয়াস পাইয়াছে। ইউরোপ ও এশিয়ায় জন আন্দোলনের ও রাষ্ট্রীয় দলের এক বড় অংশ এই আদর্শের অনুগামী। এবং এই আদর্শের রাষ্ট্রতত্ত্ব ই. এম. এফ. ডাবিন ও রিচার্ড ক্রশম্যানের পুস্তকে পাওয়া যায়।

উপসংহার—সমাজতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে নানা মতবাদের প্রচলন হইলেও বর্তমানকালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির প্রশ্নে ইহা মূলত দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—একদলের মতে, ইহা অহিংসভাবে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে সম্ভব; আর অপর দলের মতে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—ইহার জন্য প্রয়োজন বিপ্লব। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বিশ্বে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা শান্তিপূর্ণ পন্থায় হয় নাই, বিপ্লবের দ্বারা হইয়াছে। চীন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আবার বিপরীত দিকে গ্রেট বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পন্থায় নির্বাচনী উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতেও বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারাই সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টা চলিতেছে।

Q. 118. Discuss the theories of Individualism and socialism regarding the functions of government. What is the modern trend in the matter ? (C. U. 1963)

Or, "Socialism proposes to complete, rather than oppose the liberal democratic creed". Discuss the statement. (C. U. 1962)

সুস্থ, সবল জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উপলব্ধিই ব্যক্তির উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তিকে এই লক্ষ্যে পৌছাইতে সহায়তা করা। স্বভাবতই তখন প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আদর্শবাদীরা ঘোষণা করেন যে ব্যক্তি নিজেকে রাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করিয়াই চরম লক্ষে উন্নীত হইতে পারিবে। সরকারের কাজ (রাষ্ট্র একটি ধারণা মাত্র, ইহার কার্য বাস্তবে রূপান্তরিত হয় সরকারের মাধ্যমে) এইরূপ সর্বাত্মক হইলে ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই তর্ক টিকিল না। বহু তত্ত্ব তখন এই সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গজাইয়া উঠিল। তন্মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শবাদ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্রের পদতলে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে—ইহার প্রতিবাদ স্বরূপই জন্মলাভ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। উনবিংশ শতাব্দীতে বেন্থাম ও জেমস মিলের প্রচেষ্টায় ইহার উদ্ভব হয়। পরে হার্বাট স্পেন্সার ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হাতে ইহা পরিবর্ধিত হইয়া একটি পূর্ণ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

এই মতবাদ রাষ্ট্রকে সমাজের সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে। সুতরাং ইহার কার্য যতই কম হয় ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ নিজেই সার্বপেক্ষা ভাল বোঝে। অতএব তাহার কার্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিবার জন্য রাষ্ট্র নামক কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। নিজের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিজের জীবনকে রূপায়ীত করিবার স্বাধীনতা যদি ব্যক্তি পায় তবেই একমাত্র তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটিবে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইবে শুধুমাত্র দেশের মধ্যে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা এবং বিদেশীর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা। এই রাষ্ট্রকে পুলিশ রাষ্ট্র বলা যায়। ইহা ব্যক্তির স্বাধীনতায় এতটুকুও হস্তক্ষেপ করিবে না। ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে ব্যক্তিকে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

জীববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখাইয়া হার্বাট স্পেন্সার বলিলেন যে জীবন সংগ্রামে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার আছে। দুর্বলকে সরকারী সাহায্যে বাঁচাইয়া রাখিলে সবল ও কার্যক্ষম ব্যক্তির দ্বারা সমাজকে পূর্ণ করা যাইবে না; জাতির উন্নতিও সম্ভব হইবে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের একটি আর্থিক যুক্তিও আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিবে এবং যোগান এবং চাহিদায় নিয়ম আপনা আপনি কার্যকরী হইয়া সকল বস্তুর দাম নির্ধারণ করিবে। ইহাতে সমাজে সর্বাধিক উৎপাদন হইবে এবং সকলে সস্তায় সকল জিনিস পাইবে।

সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মিলিত যে ফল তাহা অবাধ নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতির (Laissez Faire) সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহার প্রধান বক্তব্য বিষয় হইতেছে ব্যক্তিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা।

কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্বক লক্ষ্য করিলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের যুক্তি-গুলির সারমর্ম বিশেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথমত, তাঁহারা বলিয়াছেন ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ নিজেই সর্বদা ভাল বুঝে। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে দুনিয়ার সকল ব্যক্তি মিল বা হার্বাট স্পেন্সার নয়। এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও একদিন খবরের কাগজ খুলিয়া আইন আদালতের খবরে চোখ বুলাইলেই বুঝা যায় যে সভ্যতার সহিত স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, কুটিলতা, পাশবিকতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলির সম্পর্ক কত নিবিড়। সভ্যতা যতই এগুকনা কেন এগুলিকে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার সম্পর্কিত যুক্তিটি এতই হাস্যকর যে বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয় ইহা হার্বাট স্পেন্সারের ন্যায় একজন মনীষী কর্তৃক আবিষ্কৃত। একজন যক্ষা রোগীকে কোনরূপ সাহায্য না দিয়া রাষ্ট্র তাহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিবে, এইরূপ একটি যুক্তি কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করিতে পারে না।

অর্থনৈতিক যুক্তিটিতেও সারবত্তার বিশেষ অভাব দেখা যায়। মালিক-দের স্বাধীনতা আছে অধিক মুনাফার জন্য মজুরকে কম মজুরী দিবার এবং মজুরদেরও স্বাধীনতা আছে কাজ না করিবার। কিন্তু মালিকদের না খাইয়া মরিবার ভয় নাই কিন্তু মজুরদের আছে। সুতরাং মজুরদের কাজ না করিবার স্বাধীনতা থাকিলেও উপবাস করিয়া মরার চাইতে কম মজুরীতে কাজ করা মন্দের ভাল বলিয়া মনে করে এবং করেও। এইরূপে শ্রমিক-শ্রেণী মালিক শ্রেণী কর্তৃক শোষিত হয় এবং সমাজে ধন-বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে।

কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও বলা যায় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি বাস্তব সত্য

উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে যে রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির স্বাধীনতায় খুব বেশী হস্তক্ষেপ করে তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সম্ভব নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ জন্ম হয় সমাজতন্ত্রবাদের। ব্যক্তির কর্তব্যের উপর কোনরূপ জোর না দিয়া অধিকারকে লইয়াই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বড় বেশী মাতামাতি করিয়াছে। কিন্তু সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য অধিকারের যত প্রয়োজন কর্তব্যের প্রয়োজন তদপেক্ষা একবিন্দুও কম নয়—ইহাই হইল সমাজতন্ত্রবাদের বক্তব্য। স্বাচ্ছন্দ্যপ্রীতির অধীনে অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে এবং ফলতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনাচার দেখা দেয়। সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করে যে অবাধ প্রতিযোগিতা শ্রমিকের বর্তমান দুর্দশার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী, ইহা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিলাসিতার জন্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে উপোষ করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং মানব জাতিকে ধনী এবং দরিদ্র এই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদ তাই উৎপাদন ও ধনবণ্টনের উৎসগুলির উপর সার্বজনিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের বিলোপ সাধন করিবার রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থন করে। এই লক্ষ্যে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকরা রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি বিস্তার করিবার পক্ষপাতি। সমাজতন্ত্রবাদের উপরিউক্ত লক্ষ্য সম্পর্কে সকল সমাজতন্ত্রীরা মোটামুটি একমত হইলেও এই লক্ষ্যে পৌছাইবার উপায় সম্পর্কে কিন্তু মতভেদের পার্থক্য দেখা যায়। তাই সমাজতন্ত্র বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের মনে এক বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রকৃতি তাহাকে অনেক সম্পদ দিয়াছে। আবার মানব সমাজ নিজ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সেই সম্পদকে আরও বর্ধিত করিয়াছে। সুতরাং কোন একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই সম্পদ ভোগ করিবে এবং সমাজের বৃহৎ অংশকে বঞ্চিত করিবে—ইহা কখনই সহ্য করা যায় না। তাই সমাজতন্ত্রবাদ যে চিন্তার জন্ম দিল তা অভূতপূর্ব ও অভিনব। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণরূপে ত্রুটীহীন নয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি বিস্তারিত হওয়ার অর্থই হইতেছে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু আমলাদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ক্ষমতাবৃদ্ধি কোনটিকেই খুব বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা যায় না। পৃথিবীতে যদি সমাজতন্ত্রবাদ চিরকাল থাকিয়া যায় তবে এই সকল আমলারা যে খুবই প্রয়োজনীয় এ বিষয়েও আবার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ

আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি ইতিহাস না থমকিয়া দাঁড়াইয়া যায় তবে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন আসিবেই। তখন হয়ত সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে অন্যকোন মতবাদ মানুষকে আরও উন্নততর কোন ব্যবস্থার সন্ধান দিবে। এই আমলা-শ্রেণী তখন সকল পরিবর্তনের বিরোধিতা করিবে। ফলতঃ আমাদের কার্যের জন্য যে দাস আমরা নিযুক্ত করিয়াছি তাঁহাদের হাতেই আমরা দাস বনিয়া যাইব। উপরন্তু আমলারাও মানুষ, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, এবং লোভের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অন্যায় আচরণও করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করিবার থাকিবে না। কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যত শক্ত ছিল ইহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী শক্ত হইবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণদণ্ড ব্যক্তির সকল কার্যে পরিব্যাপ্ত হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হইবে। ব্যক্তির জীবন পরিচালিত হইবে রাষ্ট্রের নির্দেশে। কবিতা এবং গল্প লেখা হইবে ফরমায়েস মত। মানুষের ধীশক্তির এবং উদ্যম ইহাতে নষ্ট হইতে বাধ্য। সমালোচকের মতে ইহার ফলে সমাজে কাম্য উৎপাদন হওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত লাভের আশা যেখানে বিন্দুমাত্রও নাই সেখানে ব্যক্তি যন্ত্রের মত কাজ করিবে এবং বিচার বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজনবোধ করিবে না।

সুতরাং দেখা গেল যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি করিয়াছে এবং উৎকট ধনবৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে; অপর দিকে সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়াছে যে ইহাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লোপ পাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাই অনেকে বর্তমানে এই দুই বাড়াবাড়ির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনিয়া আপোষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন "A true theory of state must be socialistic and individualistic at once''-বলেন Kechine. Burns বলেন, "If we could imagine an ideal at once individualistic and socialistic, such would be the most effective ideal for most thinking men.'' ইহারা বলেন জল আর চিনির পরিমাণের অনুপাত যদি ঠিক হয় তবেই খুব সুন্দর সরবৎ তৈয়ারি করা যায়। যদি অধিক পরিমাণ জলে সামান্য চিনি দেওয়া হয় তবে চিনির মিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং চিনির মিষ্টতা

রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই এখানে চিনির মিষ্টতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যে পদ্ধতিতে মানুষকে তাহার গণতান্ত্রিক অধিকার দিবার কথা বলিয়াছিল সে পদ্ধতির ফল হইল ধনতন্ত্র ; কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা যে অর্থে বুঝিয়াছিলেন সেই অর্থেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর স্বাধীনতা ঠিকমত ভোগ করিতে গেলে সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। ঠিক এই-খানেই উদ্ভব হয় সমাজতন্ত্রবাদের। ব্যক্তি যদি খাইতেই না পাইল তাহা হইলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগ করিবে কিরূপে ? সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা হ্রাস করিয়া তাহাকে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলে। সমাজ-তন্ত্রবাদের এইটুকুকে গ্রহণ করিয়া এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দ্বারা সমর্থিত সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া বর্তমানে উদ্ভব হইয়াছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের, ইহাকে শুধু সমাজতন্ত্রবাদও বলা হয়। সুতরাং এই সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে তাহার গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করে না—বরং এতদিন যে ব্যক্তি প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিতে পারে নাই এইবার সে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারে ভোগের স্বাদ পাইবে। অতএব ইহা বলা খুবই সংগত যে "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed."

Q. 119. Discuss critically the Individualistic Theory of State.

[**ইংগিত**—১১৮ নং প্রশ্নের ২৪৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন পর্যন্ত]

Q. 120. Discuss critically the Socialistic Theory of State.

[**ইংগিত**—১১৮ নং প্রশ্নের ২৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন বাদ দিয়া ২৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত]

C. U. Degree Part I. 1962,

First Paper.

1. Describe the different methods of study in Politica Science. Which of them do you consider to be the mos desirable and why ? (See Page 11

2. Discuss the Idealistic Theory regarding the natur of the State. (See Page 44

3. Write an analytical note on the attacks upon th Monistic theory of Sovereignty. (See Page 74

4. Define Law, and point out the distinction and relatio between Law and Morality (See Page 78 & 82

5. Discuss the problem of Nationalism Vs, Interna ationalism. (See Page 61)

6. Distinguish Democracy from Dictatorship and point out the conditions essential to the success of Democracy. (See Page 146 & 136)

7. "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Discuss the Statement. (See Page 244)

8. What are the different methods by which the electorate can exercise control over their representatives in modern democracies ? (See Page 209)

9. Discuss the principles of organisation of the Judiciary in modern states. (See Page 207)

10. Discuss the nature and importance of Public opinion in Popular Government. (See Page 229)

C. U. Degree Part I. 1963.

First Paper

1. Define 'Political Science' and discuss the nature of its relation to History and Sociology. (See Page 1, 6 & 10)

2. Discuss the Evolution of theory of the origin of the State. (See Page 40)

3. Define 'Sovereignty' and distinguish between (a) Legal and Political Sovereignty, and (b) *Dejure* and *Defacto* Sovereignty. (See Page 64, 69 & 70)

4. What is the meaning of Liberty in Political Science ? What are safeguards of liberty in a modern State ? (See Page 106 & 110)

5. Point out the characteristics of Parliamentary form of Government. In what different ways does the Parliament exercises control over the cabinet in this form of Government ? (See Page 177)

6. Discuss the case for and against a Second Chamber in the organisation of a federal legislature. (See Page 195)

7. Discuss the theories of Individuatism and Socialism regarding the functions of Government. What is the modern trend in the matter ? (See Page 243)

8. Discuss the functions of Political Parties. Are parties indispensable in democracies ? (See Page 221)

9. Discuss the case for minority representation and write an analytical note on the different methods of minority representation in modern democracies. (See Page 217)

10. Distinguish between rigid and flexible constitutions. Are the constitutions of (a) the U. S. A. (b) Great Britain, and (c) India rigid or flexible ? Give reasons for your answer. (See Page 119)